বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী
১৯৪৭-১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে
এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401400

GIFT

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সোনিয়া নিশাত আমিন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401400

গবেষক
বীণা রানী রায়
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রোল নং-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা ও মা'কে

401400

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

বীণা রানী রায়, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী ১৯৪৭-১৯৭১" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

401400

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৬/১১/০৬

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ সোনিয়া নিশাত আমিন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সোনিয় নিশাত আমিন - এর আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে তাঁর সহযোগিতা না পেলে গবেষণা কর্ম শেষ করা অসম্ভব ছিল যদি না তিনি আমার পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক ড. রতন লাল চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে না নিতেন। তিনি অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে এর ভুল সংশোধনসহ পরিবর্তন এবং পরিমার্জন বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করণে সহায়তা করেছেন। এ কারণে গবেষক তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজের প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন আমার পূর্বের তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অভিমত ও ব্যক্তিগত গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। গবেষক তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

কাজের নেপথ্যে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কে. এম. মোহসীন, অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ এবং সহযোগী অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। গবেষক তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ তৎকালীন ছাত্রনেত্রী কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকার প্রতি। যিনি আমার গবেষণা কর্মের ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা পাবলিক গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও পত্রিকা অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারী এবং

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং এ এম. ফিল. বিভাগের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মাচরীদের প্রতি গবেষক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছে। এ ছাড়াও কম্পিউটারস কম্পোজের ক্ষেত্রে শ্রম দিয়েছেন **তাপশ, শাকিল ও নাসির**। গবেষক তাদের ধন্যবাদ জানায়। ধন্যবাদ জানায় গবেষকের রুমমেটদের প্রতি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছে মিসেস মমতা ঘোষাল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী নির্মল চন্দ্র ঘোষাল এবং ডা. পংকজ রায়ের প্রতি। যাঁদের প্রেরণায় গবেষকের পক্ষে এতদুর আসা সম্ভব হয়েছে। সতত বাস্তব সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে মূলবান দায়িত্ব পালন করেছেন ডা. মৃন্ময় বিশ্বাস। অনুজ শ্যামল, কমল, স্নেহাস্পদ শর্মিষ্ঠা, পান্থ বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা দিয়েছে। সকল শুভাকাঙ্খীদের নিকট গবেষক কৃতজ্ঞ।

সবশেষে গবেষণা কর্মটি বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদি এতটুকু অবদান রাখে তাহলেই গবেষকের পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে হবে।

বীণা রানী রায়

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা
	প্রত্যয়ন পত্র	
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
	সার সংক্ষেপ	A – B
	ভূমিকা	I – XV
প্রথম অধ্যায়ঃ	ভাষা আন্দোলনে নারী	১- ৫৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী	৫৫-৮৭
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	ছয়দফা ও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে নারী	৮৮-১২৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	মুক্তিযুদ্ধে নারী	১২৬-১৮৪
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	সমকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয় চেতনা বিকাশে নারী	১৮৫-২২২
	উপসংহার	২২৩-২২৫
	পরিচিতি	২২৬-২৩৯
	গ্রন্থপঞ্জী	২৪০-২৫১

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চব্বিশ বছরের বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস নির্মানে নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, সরকারী উদ্যোগে, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে, অনেক ইতিহাস নির্ভর গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং রচনার প্রয়াস চলছে। এ ইতিহাস রচনায় পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির নিয়মে নারীর ভূমিকা যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়নি বলে মনে হয়। এই উপলব্ধিই গবেষককে "বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী ১৯৪৭-১৯৭১" শিরোনাম বিষয় গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উক্ত সময়ের উপর আলোকপাত করে গবেষকের জানামতে তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন মহল থেকে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক ভাবে কিছু প্রচেষ্টায় জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকার চিত্র ও ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বশেষ একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বেশী গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। অথবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ইস্যু যেমনঃ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছয়দফা, ঊন সত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পৃথক পৃথক ইতিহাস রচিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এসব গ্রন্থে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে কথা বলা হয়নি। তবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নারীর কথা জানা যায় কয়েকটি আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ থেকে। যা নারীর ভূমিকার যথাযথ চিত্রায়ন নয়। যে কারণে গবেষক উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে প্রয়াসী হন।

এই গবেষণা কর্মে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে সরকারী দলিল পত্র (Public documents), গণ পরিষদ (Constituent Assembly) ও পার্লামেন্টের বিতর্ক (Debates) পার্লামেন্টের কার্যবাহের সারাংশ (Summary of Proceeding), বুলেটিন, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, নির্বাচনের ইস্তেহার, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সংবাদ পত্র ও বিভিন্ন বই পুস্তক ও প্রবন্ধ। গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ যেমন- নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া, নির্বাচনে নারীর বিজয়লাভ, শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন সহ সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ছয়দফা ও এগার দফার দাবীতে রাজনৈতিক নেত্রীদের সাথে ব্যাপক ভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে নারীর ব্যাপক ও বহুমূখী অংশগ্রহণ ও ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এতদিন আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল শহুরে শিক্ষিত নারী ও ছাত্রীদের মধ্যে। স্বাধীনতার আন্দোলন শহরের গন্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের মধ্যে। পঞ্চম অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী কিভাবে জাতীয় চেতনার বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকার মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাঙালী একটি ভাষা-জাতির নাম। এই জাতির জন্ম বিকাশের ক্ষেত্রে আছে তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভূ-খন্ডের পরিচয়, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, নানা ধরণের সংমিশ্রন, গ্রহণ-বর্জন, উত্থান-পতন, আর বিদ্রোহ বিপ্লব।[১]

দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতার চাপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। অবিভক্ত ভারত বর্ষের অধিকার আদায়, সামাজিক অবমুক্তি, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন তথা শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন নারীরা। নারী সমাজের শৃংখল মোচনের জন্য, দেশ মাতার শৃংখল মোচন প্রয়োজন। এটাই ছিল নারী আন্দোলনের সূচনা পর্বে নারী সমাজের শ্লোগান।[২]

নারী জাগরণমূলক আন্দোলনের সূচনা হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষে উদার নৈতিক তত্ত্বের নবজাগরণের ভিত্তিতে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এ জাগরণের মূলে কাজ করেছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে সর্বপ্রথম শ্রম বাজারে প্রবেশের সুযোগ ঘটে পাশ্চাত্যের মেয়েদের। সে সাথে এক নতুন শাসক, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। সে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ ঘটে নারী সমাজের। বাল্য বিবাহ, বর্ণভেদ, লৌকিক ধর্মাচারের নামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাগরণের সূচনা হয়। এ জাগরণে আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত নারীদের অধিকার প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন দানা বাঁধে মূলত দুটি ধারায়। এক সমাজ সংস্কারমূলক ধারা দুই উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ধারা। শৃংখল মোচন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদুটি ধারার মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। সে সাথে পাশ্চাত্যের সামাজিক আন্দোলন, নারী শিক্ষা আন্দোলন, ভোটাধিকার আন্দোলন ও দেশীয় নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। অবিভক্ত ভারত বর্ষের নারীরা অধিকার, সামাজিক অবরোধমুক্তি ও শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতি কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।

বৃটিশ রাজত্বকালে শিক্ষা দীক্ষায় ব্রাহ্মহিন্দু সমাজ ছিল উন্নত। সে জন্য দেখা গেছে ব্রাহ্মহিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে উত্তরণের সুযোগ মুসলমান নারীদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ব্রাহ্মহিন্দু নারীর অধিকার নিয়ে গোঁড়ার দিকে আন্দোলনকারী নেত্রীদের মধ্যে পন্ডিত রমাবাঈ ছিলেন অগ্রণী (১৮৫৬-

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২)। রমাবাঈকে এজন্য ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।[৩]

বৃটিশ ভারতে মুসলিম নারীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের পশ্চাদপদতার কারণ ও উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় তিনি উদ্ভাবন করেন।

একথা সত্য যে, প্রথম দিকের নারী জাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন পুরুষেরা। নারীরা স্বতঃ প্রনোদিত হয়ে তাদের সাথে নারী জাগরণের আন্দোলনকে বেগবান করেন। নারীকে অন্ধকারে রেখে পুরুষের প্রগতি খুব বেশীদুর এগুলো সম্ভব হবে না এবং নরের সাথে নারীর উন্নয়নের কাজ শুরু না হলে, গোটা সমাজ অন্ধকারের অতলে পড়ে থাকবে ভেবে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমূখেরা এ দেশের সামাজিক কু প্রথা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনের পর নারী সমাজের অবরোধ উন্মোচনের প্রয়াস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকে রা নারী শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন।

১৮৫৪ সালে 'উডস ডেসপ্যাচে' ইংরেজ সরকার নারী শিক্ষার বিষয়ে সরকারের কিছু দায়- দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে স্বামীর কাছে লেখা পড়া শিখে খ্যাতি লাভ করেন কৈলাশবাসিণী দেবী, স্বর্নময়ী দেবী, রামা সুন্দরী, কুমুদিনী, নিস্তারিনী দেবী, জ্ঞানদা নন্দিনী। ঠাকুর পরিবারের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতের প্রথম আই, সি, এস,) তাঁর স্ত্রীকে গড়ে তোলেন নিজের উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে। বাঙালী নারীদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করার ক্ষেত্রে ঠাকুর বাড়ির নারীদের প্রয়াস ছিল উল্লেখ করার মত।[৪]

১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন এবং তার আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সরকার সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন জারি করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্ঠায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহন তাঁর 'আত্মীয় সভার' খসড়া কর্মসূচীতে 'নারী অধিকার ও শিক্ষা' বিষয়টিকে যুক্ত করেন। এরপর ডিরোজিওর ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজ নারী স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করে। অন্যদিকে খৃষ্টানমিশনারীরা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। ১৮৪৮ সালে বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শুরু হয় বাঙালী নারীদের ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্ম সমাজ নারীর পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'বামা বোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। ১৮৭০ সালের দিকে ভারতবর্ষে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯০০ সালের মধ্যে সকল বাধা অতিক্রম করে ২৭ জন নারী স্নাতক হন। তবে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য নারীর বিকাশ ঘটানো হলেও অর্থনৈতিক ভাবে নারী স্বাধীন হোক, এটা কারো কাম্য ছিলনা।

স্বামী বিবেকান্দ প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের মধ্যে দাড়িয়ে স্বদেশের নারীদের উন্নয়ন ও উত্তরণের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে, নারী শুধু নারী নয়, সে মানুষ, তারও পুরুষের সমান্তরালে শিক্ষা দীক্ষায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন।

ঠাকুর বাড়ির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, নারীরা সার্বিক সামাজিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শিল্প, সাহিত্য, নাট্যকলা থেকে স্বদেশে সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা, লাঠ ভবনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ঠাকুর বাড়ীর স্বর্ণকুমারী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী, নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে আসেন। অন্তঃপুর বাসিনীদের সাথে বাইরের জগতের সংযোগ স্থাপনের জন্য স্বর্নকুমারীর নেতৃত্বে জন্ম নেয় 'লেডিস থিওসফিক্যাল সোসাইটি'।

পরে গড়ে ওঠে'সখী সমিতি'। এর কাজ ছিল সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের সংগঠিত করে দেশ ও জনহিতকর কাজে সংঘবদ্ধ হওয়া। বৃহত্তর জাতীয় চেতনা বিকাশের অংশ হিসেবে শিক্ষা, শিল্প ও স্বদেশ চেতনা বিস্তারে প্রয়াসী হন বাঙালী নারীরা। সমাজের অবরোধ প্রথা নারী শিক্ষার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করে শিক্ষার দিকে নারীদের ঝুঁকে পড়ার ফল ও হয়েছিল আশাব্যঞ্জক।[৬]

ইউরোপীয়দের মত দেশীয় সিভিলিয়ান কর্মচারীরাও ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবেন এই প্রস্তাব জানিয়ে ১৮৮৩ সালে রিপনের আইন পরিষদের সদস্য স্যার কোর্টনে ইলবার্ট একটি বিল উত্থাপন করলে ইউরোপীয়ানরা এর বিরোধিতা করলে ও বাংলার জনগণ তা সমর্থন করেন। এই ইলবার্ট বিল আন্দোলন কিশোরী থেকে তরুণী বয়সের ছাত্রীদের গভীর ভাবে আলোড়িত করে এবং যুক্ত করে। বেথুন কলেজের ছাত্রী কামিনী রায়(১৮৬৪-১৯৩৩) এবং অবলা বসু (১৮৬৬-১৯৫১) ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ছাত্রীদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই মহিলাদেরও সদস্য করতে থাকে। স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনীদেবী, পন্ডিত রমাবাঈ প্রমুখ ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সদস্য।[৮]

১৮৮৯ সালে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে যোগ দেন পন্ডিত রমাবাঈ, লেডি বিদ্যাগৌরী,
নীলকণ্ঠ রমাবাঈ রানাডে, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও স্বর্নকুমারী দেবী।[৯]

সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনের ফলে নারীর যতটুকু অধিকার লাভ করা সম্ভব হয়েছিল, বাস্তবে তা প্রয়োগ করা যাচ্ছিল না। সুতরাং পরাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫২-১৯৩২), কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ।[১০]

উনিশ শতকে নারী যখন জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে অংশ গ্রহণের কথা চিন্তা করে তখন তার সামনে শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও ধাত্রী বিদ্যার ন্যায় নারী সুলভ পেশা আদর্শ সুলভ পেশা হিসাবে খোলা ছিল।

১৮৬৬ সালে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার পেশায় আসেন রাজমনি দেবী। প্রথম বাঙালী নারী চন্দ্রমুখী বসু এম.এ. পাশ করেন ১৮৮৪ সালে এবং ৭৫ টাকা মাসিক বেতনে বেথুন বিদ্যালয়ের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হন। এভাবে ১৮৮৭ সালে শিক্ষকতায় আসেন বরিশালের মনোরমা মজুমদার। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ষাট টাকা।

১৯০১ সালে কলকাতায় সর্ব প্রথম ৭২৫ জন নারী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হন। এর মধ্যে শিক্ষকতায় ৫৮৭ জন, প্রশাসন ও পরিদর্শনে ৬ জন, চিকিৎসায় ১২৪ জন, চিত্রগ্রহণে ৪ জন, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় ৪ জন। পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নেন সর্বপ্রথম পাবনার রামা সুন্দরী দেবী। প্রথম নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ১৮৮৮ সালে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলেত যান এবং এডিনবরা, ডাবলিন, গ্লাসগো থেকে ডিগ্রী নিয়ে এক সময় দেশে ফিরেন। এল. এম. এফ. পাশ করা যামিনী সেন ১৮৯৯ সালে চাকুরী করতে নেপালে যান। তাঁরও বিদেশ ডিগ্রী ছিল। এসব পেশাজীবী নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিষোদগার ও হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৮৮০ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে দু'জন বঙ্গ নারী যোগ দেন। ১৮৯০ সালে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা। শ্লোগান ওঠে, 'গৃহই হোক নারীর স্থান'। এর বিপক্ষে অবস্থান নিতে কংগ্রেস নারীদের ব্যবহার করে।[১১]

স্বদেশী শিল্প মেলা ও স্বদেশী শিল্প প্রসারে নারীরা অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশী জিনিস উৎপাদনও ব্যবহারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়াবার উদ্দ্যোগ নেন সরলা দেবী। বিদেশী শিল্প বর্জন আন্দোলন শুরু হলে সরলাদেবী চৌধুরানী 'লক্ষ্মীভান্ডার' নামে একটি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান খোলেন এবং জনগণকে স্বদেশী দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। বয়কট আন্দোলন দেখতে দেখতে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এ আন্দোলনের সময় 'বীরাষ্টমী' মেলার মাধ্যমে শক্তিচর্চাব্রত, অরন্ধন ও রাখীবন্ধন পালন করেন নারীরা। স্বদেশী যুগে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা লাভের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সরলাদেবী ছিলেন তার অন্যতম প্রেরণার স্থল। তাঁর বিশেষ সহযোগিতায় বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও সংগঠণ গড়ে ওঠে। ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে অস্ত্রশস্ত্র, টাকা ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি। [১২]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত আন্দোলনে নারীরা অংশ নিয়েছিলেন। নবশশী দেবী, সুশীলাসেন, কমল কামিনী গুপ্তা প্রমুখ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে শিল্প, সাহিত্য ও কাব্য অঙ্গনে শুরু হয় নারীর দৃপ্ত পদচারণা। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরিন্দ্র মোহনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, প্রমিলা নাগ, বিনয় কুমারী বসু, নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী, কামিনী রায়, বিরাজ মোহনী দেবী, লজ্জাবতী বসু, পংকজিনী বসূ, নির্বারিনী দেবী, কৃষ্ণ প্রিয়া চৌধুরী প্রমুখ লেখনীর মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করেন। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে নিরলস ভাবে প্রথম প্রচার শুরু করেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। তিনি সামান্য সম্পদ এবং শক্তি নিয়ে ১৯১১ সালে ১১মার্চ কলকাতা ওয়ালিউল্লাহ লেইনে একটি ছোট্ট কক্ষে আট জন মেয়েকে নিয়ে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম মুসলমান ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন বাঙালী মুসলিম নারী জোবেদা খাতুন চৌধুরী। জোবেদা খাতুনের সাথে পড়তে আসেন মাহমুদা খাতুন, করিমুন্নেসা,ডলি বেগম রেকেফুন্নেসা ও সিদ্দিকুন্নেসা। এছাড়া রয়েছেন আফসারুন্নেসা, সিতারা বেগম, জামসেদুন্নেসা লুৎফুন্নেসা জোহা, জোবায়দা খাতুন,লুলু বিলকিসবানু, নুরজাহান বেগম,লায়লা আরজুমান্দ বানু । এরা সকলেই পরবর্তী কালে লেখক শিক্ষাবিধ, সম্পাদক,

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী হিসাবে খ্যাত হন। ১৯১২ সালের পর ভর্তি হন ফজিলাতুন্নেসা। কামরুন্নেসা স্কুলে ভর্তি হন আনোয়ারা বাহার চৌধুরী। এ সময় কালে রোকেয়ার নারী শিক্ষা আন্দোলন মূলক লেখা কলকাতায় ছাপা শুরু হয়। একই সাথে তিনি নারীদের সংগঠকের ও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন 'কন্যা গুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্ন-বস্ত্র উপার্জন করুক'।

১৯০৭ সালের দিকে তেজস্বী ভাষায় বেগম রোকেয়া নারী সমাজকে জাগানোর চেষ্টা করেন। রোকেয়া নারীকে আধুনিক ও প্রগতিশীল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে দেখতে চেয়েছেন। অবরোধের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে নারীদের প্রেরণা দিয়েছেন। রোকেয়ার কারণেই মুসলিম মেয়েরা সামনে আসার সুযোগ পায়।[১৩]

ক্রমশঃ নারীর আইনগত অধিকার ও নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু-চেমর্সফোর্ড মিশনের কাছে ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটি স্মারক লিপি পেশ করেন সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে। সে দলে মুসলিম নারীদের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন বেগম হযরত সোহানী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ১৪ জন মহিলা প্রতিনিধির এই দল দাবী তুলেছিলেন যে, নারী সমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরুষের সমান ভোটাধিকার দিতে হবে। এই ভোটাধিকারের দাবীটি গৃহীত হয় এবং আইন পরিষদে মহিলা নির্বাচনের দাবী ও তাই অগ্রাহ্য থেকে যায়।[১৪]

১৯১৭ সালে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী মার্গারেট কাজিনসের উদ্দ্যোগে অ্যানি বেসান্তকে সভানেত্রী করে গড়ে উঠেছিল উইমেনস ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ভোটাধিকারের দাবীতে সংগ্রামরত এই সংগঠনে প্রথম থেকেই সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী চট্টপাধ্যায়, রেনুকা রায়, রাজকুমারী অমৃতকাউর, রামেশ্বরী নেহেরু, বেগম হামিদা আলী, ড. মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী প্রমুখ প্রখ্যাত মহিলারা জড়িত ছিলেন।[১৫]

১৯১৯ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নারী সমাজ। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এ সময়ে মেয়েরা চরকা দিয়ে সূতো কাটা শুরু করেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে যুক্ত নারীদের মধ্যে ছিলেন নেলী সেনগুপ্তা। ১৯২২ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় সর্বপ্রথম নারীদের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ব্যাপক নারী সমাগম ঘটে।

১৯২৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে চট্টগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন নিরুপমা দস্তিদার। অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি খেলাফত আন্দোলনেও মুসলিম নারীরা যোগ দেন। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর নারী সমাবেশে ভাষণ দেন বি- আম্মা আবাদি বেগম। বি- আম্মা ছিলেন শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী। বি- আম্মার সাথে সে সময় মুসলিম অভিজাত ঘরের নারীরা ও অংশ গ্রহণ করেন সভা সমিতি ও আন্দোলনে। মুসলিম নারীরা সভা সমিতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ এবং পুরুষদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় কংগ্রেসের আমন্ত্রণে খেলাফত আন্দোলনের নেতা আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের জননী বি-আম্মা যোগ দেন। সে সভায় সভানেত্রীত্ব করেনা এ্যানি বেসান্ত। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সরোজিনী নাইডু।[১৬]

১৯২০ সালে জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে নারীরা সাহস ও যোগ্যতার সাথে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাবাহিনীর কাজ করেন। ১৯১৭ সালে ভোটাধিকারের দাবীতে চেমর্সফোর্ডের সাথে সাক্ষাতের পর ১৯১৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নারীদের এ দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। ১৯১৯ সালে সরোজিনী নাইডু, এ্যানি বেসান্ত, হীরাবাঈ টাটা ও নির্বান টাটা নারীদের ভোটদানের স্বপক্ষে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দানের জন্য লন্ডন যান।

দেওয়ান বাহাদুর কৃষাণ নায়ারের সভানেতৃত্বে মাদ্রাজ কাউন্সিল সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীতে কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর সহ কয়েকটি দেশীরাজ্যে নারীদের ভোটদানের বাঁধা নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। পুনরায় বম্বে প্রেসিডেন্সি লেজিস লেটিভ কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ বিতর্ক শোনার জন্য শতাধিক নারী উপস্থিত ছিলেন। ১৯২১ সালে নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি আলোচিত হয় বিহার কাউন্সিলে। ১০ ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। তবে ১৯২২ সালে ব্রহ্মদেশ ও মহিশুরে বিপুল ভোটাধিক্যে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। প্রদেশ গুলোর মধ্যে মাদ্রাজই সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকারকে

Dhaka University Institutional Repository

মেনে নেয় এবং বিধান পরিষদে ড. মুথুলক্ষ্মীকে নারী বিধায়কের পদ প্রদান করে। ড. মুথুলক্ষ্মী হচ্ছেন বৃটিশ ভারতের প্রথম নারী বিধায়ক।[১৭]

বাংলায় বঙ্গীয় নারী সমাজ কুমুদিনী বসু, কামিনী রায়, মৃনালিনী সেন এবং জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন চালাতে থাকেন। একই সাথে তাঁরা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় উত্থাপিত নারীদের ভোটের অনুমোদন প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌর নির্বাচনে নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়। [১৮]

যশোরে পৌর নির্বাচনে পুরুষের বিরুদ্ধে অংশ নিয়ে জয়ী হন আমিনা খাতুন।[১৯] ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলার নারীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার পান। [২০]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যখন মুসলিম নারী জাগরণ ও আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন তখন মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের উদ্দ্যোগে মুসলিম নারী জাগরণের কাজ পরিচালিত হয় 'সওগাত' গোষ্ঠীর মাধ্যমে। 'সওগাত' ও 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে নাসিরুদ্দিন নারী জাগরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। একই সময় ঢাকায় অধ্যাপক আবুল হুসেন, আব্দুল কাদির সহ কয়েকজন মিলে ১৯২৬ সালের ১১ জানুয়ারী মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা 'শিখা গোষ্ঠীর' মাধ্যমে নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করেন।[২১]

১৯২৬ সালে গড়ে ওঠে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন। ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম নারী সম্মেলনে মহারাণী চিমনভাই সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এ নিখিল ভারত নারী সম্মেলনই সর্বভারতীয় নারী সম্মেলন। এ সংগঠনের সাথে বেগম হামিদা আলী যুক্ত হন। নারীর আইনগত অধিকার, নারীর ভোটাধিকার ও নারী শিক্ষা বিস্তারে সংগঠন ভূমিকা রাখে।[২২]

১৯২৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় লীলা নাগের (রায়) নেতৃত্বে জন্ম নেয়, 'দিপালী সংঘ' নামে বিপ্লবী দলের একটি শাখা সংগঠন। এ সংঘের কাজ ছিল গোপনে বিপ্লবী নারী কর্মী তৈরী করা। ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশের পথ সুগম করেন। ১৯৩৫ সালে ইতিহাস বিভাগে করুণা কণা গুপ্ত প্রথম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন যা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল আর একটি মাইল ফলক। এসব ঘটনা মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। দিপালী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ তার সহযোগীদের নিয়ে ১৯২০-২৮ সালের মধ্যে ঢাকায় ৪টি মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩]

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কল্যাণ কুটির আশ্রম। একই সালের অক্টোবর মাসে মাষ্টারদা সূর্যসেনের গোপন বিপ্লবী দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সাথে জড়িয়ে যান প্রীতিলতা, কল্পনাদত্ত, সরোজিনী পাল, কুমুদিনী রক্ষিত, ডাঃ সুহাসিনী মুখার্জী, চারুবালা দত্তগুপ্তা সহ বেশ কিছু সামাজিক পদ মর্যাদা সম্পন্ন নারী। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন চারুবালা দত্ত ও ডাঃ সুহাসিনী মুখার্জী।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত প্রথম নারী হচ্ছেন ইন্দুমতি জৈন। নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নিজ নামে বেআইনী ইশতেহার ছাপিয়ে পুলিশ কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানানোর কারণে তিনি কারাবরণ করেন। তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে সারা দেশে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। গান্ধীর আহবানে ও প্রভাবে সিলেটের সরলাবালা দেব, দিনাজপুরের বালুর ঘাটের প্রভা চ্যাটার্জী, ভোলার সরযুবালা সেন, বরিশালের ইন্দুমতি গুহ ঠাকুরতা, নোয়াখালীর সুশীলা মিত্র, খুলনার স্নেহশীলা চৌধুরী, বর্ধমানের সুরমা মুখার্জী, সিরাজগঞ্জের বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, বিক্রমপুরের সরযুবালা সেন, ময়মনসিংহের উষাগুহ, বরিশালের প্রফুল্ল কুমারী বসু প্রমুখ নারীরা স্ব-স্ব অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। তাঁরা নিজেদের এলাকাভূক্ত নারীদের সংগঠিত করেন। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে নারী সমাজকে সক্রিয় রাখেন। তাঁত, সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, লাঠি, ছোরা খেলা, শিশুমঙ্গল এসব কাজের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক ভাবে নারীরা ঘর ছেড়ে বাইরে আসেন।

১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন নারীদের সংগঠিত করাই ছিল এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। বিলেতী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করা, মদ বিক্রি করতে না দেওয়া, সভা সমাবেশ ও শোভাযাত্রা করা ছিল এ সমিতির কাজ। দেশের সব অঞ্চলের নারীরা এ সব আন্দোলনে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে অংশ নেন। রাজপথে পিকেটিং , খদ্দর ফেরী করা ছাড়াও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অনেকে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৩০ সালের ২২ জুন সত্যাগ্রহ সমিতি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দেন। লীলা রায়ের নেতৃত্বে এ কমিটির নারী সদস্যরা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল চট্টগ্রামে এক বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। এ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন নারীরা। সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে নারী সদস্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নারী কর্মীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নারীদের দলভূক্ত করা হয়।

'দিপালী সংঘের' প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত ও সাবিত্রী দেবী সূর্যসেনের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব অপারেশনে আহত অবস্থায় ধরা পড়েন প্রীতিলতা, এ গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। এর মধ্যদিয়ে প্রীতিলতা প্রমান করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশ গ্রহণের সমান অধিকার ও যোগ্যতা রয়েছে।[২৪]

প্রীতিলতা এ দেশের নারী সমাজের গৌবর। নারী আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি এই বিপ্লবী ধারাটি সৃষ্টি করে গেছেন যে, নারী সমাজের মুক্তির জন্য শুধু সমাজ সংস্কার আন্দোলন করলেই চলবেনা সাথে সাথে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির লড়াই এ যুক্ত হতে হবে। প্রীতিলতা ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বীরের মত আত্মত্যাগ করে পরবর্তী যুগের নারীদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে গেছেন। সারা বাংলার বহুনারী বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন এরই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে।

১৯২৮-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলায় কংগ্রেসের পক্ষে যে কয়টি আন্দোলন হয়, তার কয়টির সাথে যুক্ত ছিলেন নারীরা। "বিদ্যাশ্রমের" আহবানে সরলা দেব সিলেটে এসে মহিলাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। 'সিলেট মহিলা সংঘ' সংগঠিত হওয়ার সময় শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন । শহরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেফতার হন নারীরা। লবণ আইন আন্দোলনে বরিশালের মনোরমা বসুও অংশ নেন। মনোরমা বসু কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ১৯৩০-১৯৩১ সালে কারাদন্ড ভোগ করেন। শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের উদ্দোগে এ সময় সুরমা উপত্যকায় এক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নেতাজী সুভাষ বসুর সাথে জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী, উর্মিলাদেবী ও শান্তি দাশ উপস্থিত ছিলেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩১ সালে আশালতা সেন বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় 'মহিলা সংঘ' গঠন করেন। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে বিক্রমপুরের বহুনারী এ সংগঠনের মাধ্যমে অংশ নেয় ও কারাবরণ করে।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন নীনা গুপ্তা, বীণা দাস, কমলাদাশ গুপ্ত, উজ্জলা মজুমদার, বনলতা সেন, জ্যোতিকনা দত্ত, পারুল মুখার্জী, উষা মুখার্জী, সাবিত্রী দেবী, লীলা নাগ (রায়), ইন্দুমতি সিংহ, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত।

১৯৩০ সালে শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধূরানী লবণ আইন অমান্য করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ৬০ জন হিন্দু নারীর সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু মুসলিম নারীদের গ্রেফতার করার কোন নির্দেশ না থাকাতে তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়নি। গাইবান্ধার মহামায়া ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে এসে বগুড়ার দৌলতুন্নিসা স্বদেশী আন্দোলনে নিজের নাম লেখান। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বেলা দশটায় যুগান্তর দলের কিশোরী সদস্য শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী উৎপীড়ক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ষ্টিফেন্সকে তাঁর কুমিল্লার বাংলোয় প্রবেশ করে হত্যা করেন। এর জন্য শান্তি সুনীতিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।[২৬]

১৯৩২ সালে স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা ময়দানে শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব নেন কবি হোসন আরা বেগম। ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন ময়মনসিংহের দুই মুসলিম সহোদরা রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সাথে এদের যোগাযোগ ছিল। ১৯৩২ সালে গভর্ণর ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে বীণা দাসের ৯ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হয়। গভর্নর এন্ডারসনকে হত্যা পরিকল্পনায় সহায়তা করার অপরাধে ১৯৩৪ সালে ১৪ বছরের সশ্রম দন্ড পান উজ্জলা মজুমদার।

১৯৩২ সালে বৃটিশ ভারতে স্বাধীন ভারতের তিনরঙা পতাকা উত্তোলন করেন মাতঙ্গিনী হাজরা। এ অপরাধে তাঁর কারাবাস ঘটে। কারা মুক্তির পর ১৯৪২ সালে তমলুক থানা ও আদালতের সামনে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন।[২৭]

১৯৩৯ সালে গঠিত হয় ছাত্রীসংঘ। এ সংগঠনটি ছিল বাংলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের। ছাত্রীসংঘ গঠিত হবার পর ছাত্র ফেডারেশন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্রীদের সংগঠিত করার কথা চিন্তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে বাংলার ছাত্রী কণক দাশগুপ্ত, বোম্বের বাটলিওয়ালা ও পাঞ্জাবের গৌরণ ভারুচা যোগ দেন। ১৯৪০ সালে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্দ্যোগে একটি সর্ব ভারতীয় ছাত্রী সম্মেলন লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। এ সম্মেলনে নারী পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ ও নারীর আইনী অধিকারের বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায় এবং এ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। [২৮]

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় ফ্যাসীবাদ বিরোধী লড়াই সংগঠিত করা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা এবং সৈন্যদের দ্বারা নারীদের অত্যাচার প্রভৃতি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল কলকাতার কমিউনিষ্ট পার্টির নারী কর্মীদের উদ্দ্যোগে দল মত নির্বিশেষে সব নারীদের নিয়ে গঠিত হয় 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' এ সংগঠনের আহবায়িকা হন মিসেস এলারীড। সমিতির কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সাকিনা বেগম, রেনু চক্রবর্তী, সুধারায়, মনিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমেদ, বিয়াট্রিস তেরান, অর্পনা সেন, ফুলরেনু দত্ত। [২৯]

বাংলার বিভিন্ন জেলায় যথাঃ- ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি স্থানে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' শাখা গড়ে ওঠে। [৩০]

এ সময় যুদ্ধ পরিস্থিতির পটভূমিতে দেখা যায় তীব্র খাদ্য সংকট। আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা ভুখা মিছিল বের করে খাদ্য আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতার মুসলিম আত্মরক্ষা লীগের নেত্রী নাজিমুন্নেসা আহমেদের নেতৃত্বে ৫০০ মুসলিম নারীশ্রমিক ভূখা মিছিল, রাজবন্দী মুক্তি ও খাদ্য আন্দোলনে যোগ দেয়। এ আন্দোলনে আরো ছিলেন শাহজাদী বেগম, শবেদা খাতুন, নেলী সেনগুপ্তা, মনোরমা বসু, নিবেদিতা নাগ, মনিকুন্তলা সেন, রেনু চক্রবর্তী, যুঁইফুল রায়, কল্পনাদত্ত, কনক মুখার্জী ও বানী দাশ গুপ্ত। আত্মরক্ষা সমিতিরি উদ্দ্যোগে পরিচালিত নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র সমূহের মধ্যে বরিশালের 'মাতৃমন্দির' উল্লেখযোগ্য। বাংলার নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মনোরমা বসু প্রতিকূল অবস্থার মাঝে ও দীর্ঘদিন এ পুনর্বাসন কেন্দ্র চালূ রাখেন।

বৃটিশ শাসনামলের শেষদিকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে তেভাগা, নানকার, টংক প্রভৃতি আন্দোলনের সাথে সমাজের এক বিরাট

Dhaka University Institutional Repository

অংশের সম্পৃক্ততা ছিল। এর আগে প্রধানত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীকে সক্রিয় দেখা গেছে। এতে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানত মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল পরিবারের নারীরা। কিন্তু কৃষক আন্দোলনে গ্রামীন নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কৃষক আন্দোলনে দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষানী জয়মণি, সরলা, রংপুরের লালবিবি, মাতঙ্গিনী হাজরা,নড়াইলের বগলাসুন্দরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। [৩১]

তেভাগা ও টংক আন্দোলনের পাশাপাশি চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাচোল এলাকার তেভাগা আন্দোলন ও (১৯৪৮-৪৯) পাকিস্তান আমলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে সাঁওতাল মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যময়। এই আন্দোলনের নেত্রী ইলামিত্র জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হন। তাঁর উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের পরেও ইলামিত্র নতি স্বীকার করেননি। [৩২]

অবিভক্ত ভারতবর্ষের সংগ্রামী নারীদের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণে পূর্ববাংলার নারী সমাজ অংশ নিয়েছিলেন বাংলার জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার আন্দোলনে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আয়শা খানম (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০১), পৃ.অ.-৫ ।

২. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,১৯৮৯) পৃ. ৬৮ ।

৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, (ঢাকাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯), পৃ. ১৪ ।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫ ।

৫. প্রাগুক্ত ।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬ ।

৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৬৮-৬৯ ।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০ ।

৯. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ১৭ ।

১০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৭১ ।

১১. নিবেদিতা *দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ১৮ ।

১২. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৭২ ।

১৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ.১১৬-১১৭;১২৩; নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ১৮ ।

১৪. কনক মুখপাধ্যায়, *ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা*, (পশ্চিম বঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন রোড, কলকাতা-৭০০০১৬, ১৯৮৫), পৃ. ২৪-২৫ ।

১৫. প্রাগুক্ত ।

১৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ১৯ ।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১ ।

১৮. প্রাগুক্ত ।

১৯. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৮৬ ।

২০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ২১ ।

২১. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ৮৬ ।

২২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ২০০২), পৃ.১২৪-১২৫ ।

২৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ.২২-২৪ ।

২৫. প্রাগুক্ত ।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩ ।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫ ।

২৮. প্রাগুক্ত, ২৫ ।

২৯. প্রাগুক্ত, ২৬ ।

৩০. মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৯০ ।

৩১. মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, পৃ. ৯০; সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১মখন্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮), পৃ. ১৪; কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকার সাক্ষাৎকার, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা ।

সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, পৃ. ১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনে নারী

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ভারত উপমহাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। এ দ্বিধা বিভক্তি পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বারোশত মাইল দুরে অবস্থিত পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করে পাকিস্তান নামের এক অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়।

ধর্মীয় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায় পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমলীগ নেতৃত্ব কোন বাস্তব ও কার্যকরী অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রদানে ব্যর্থ হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে পাস কাটিয়ে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের আশংকা এবং ধর্মীয় শ্লোগান দিয়ে পরিবেশকে মুখর করে তোলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত পূর্ব বাংলা শিল্প বানিজ্যে বরাবরই অনগ্রসর ছিল। দেশ বিভাগের পরিণতিতে পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদার, মধ্যবিত্ত শ্রেনী এবং অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর শ্রেনীর এক বিরাট অংশের দেশ ত্যাগের প্রভাবে কৃষি উৎপাদনে এক নৈরাজ্যবাদী অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সর্বোপরি সামরিক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পূর্ণ ভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। আমদানী-রপ্তানী, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীন বানিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা প্রচন্ড শোষণের ফলে পূর্ববাংলার কৃষি প্রধান অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়।

বস্তুত পক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানীদের চরম শোষণ, অত্যাচার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থবিরতা, ধর্মান্ধতা, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্যাতনের ফলে পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক মহলে হতাশা বিরাজ করতে থাকে এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি বাঙালীদের মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়। এই অঞ্চলের মানুষ অচিরেই বুঝতে পারে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পূর্ববাংলাকে শাসন শোষণের জন্য একটি ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের অন্তঃস্থিত দুর্বলতা ও তার অনিবার্য ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা না নিয়ে প্রথম থেকেই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র ও অনৈক্য দুর করে এক সুসংহত পাকিস্তান গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ববাংলার জনগণের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিলোপ করে সেখানে তারা যাকে পাকিস্তানের সংহতির অনুকূল বলে ভেবেছিল, সেই উর্দূভাষা, সাহিত্য ও পাকিস্তানী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ নেয়। মোট কথা, পাকিস্তানী শাসক চক্রের সঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের বিরোধের প্রথম বহিঃ প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী। তৎকালীন পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাষাগত অবস্থানটি লক্ষ্য করলে পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনগণের ভাষাগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপঃ

ভাষা	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
বেলুচী	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪
সিন্ধি	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮
পাঞ্জাবী	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
ইংরেজী	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
উর্দু	৫৪,১৯,১৩১	৭.২
বাংলা	৪,১২,৯১,৮৮৯	৫৪.৬

[উৎসঃ সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ৩৬।]

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সারা পাকিস্তানের ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী এবং মাত্র ৭.২ শতাংশ মানুষ উর্দূভাষী। পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলের মোট সাতটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অর্ধেকের ও বেশী মানুষের মাতৃভাষা এবং অন্য ছয়টি ভাষায় অর্ধেকের ও কম মানুষ কথা বলে, সাহিত্য রচনা করে। সুতরাং যে কোন বিচারে এবং বাস্তব পরিস্তিতিতে একমাত্র বাংলাভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অধিকার রাখতো। কিন্তু সমাজ , সংস্কৃতি ও রাজনীতির

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির উপর নগ্নভাবে আক্রমণ শুরু করে।

বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ ছিল মূলত বাঙালী জাতির আবহমান ঐতিহ্য, হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত। এই আক্রমণ পাকিস্তানীদের পূর্ববাংলার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে শাসন,শোষণ ও লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতারই অংশ। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর এই আঘাত প্রতিহত করতে গিয়ে বাঙালী জাতি সৃষ্টি করে এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের। এই ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রাম থেকে রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের লড়াই নতুন মাত্রা অর্জন করে। এখান থেকে শুরু হয় বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।[১]

ভাষা আন্দোলন বাঙালীর জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়েছিল এই ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনার আলোকে। জাতির সেই ক্রান্তি লগ্নে বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন বাংলার সচেতন নারী। নেপথ্যচারিনী নারী সে দিন পুরুষের পাশাপাশি অংশ নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে।

১৯৪৮ সালের ২০মে 'সম্বাদ প্রভাকর' সম্পাদক ইংরেজীর স্থলে বাংলা ভাষাকে অফিস আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একই সাথে বৃটিশ সরকারের বাংলা ভাষাকে হেয় জ্ঞান ও ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসারতার পক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। অবশ্য ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে হিন্দি ভাষাও যুক্ত হয়। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা হিন্দি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোর প্রচেষ্টা চালান। এর পাল্টা দাবী হিসেবে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উর্দু ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীও উত্থাপিত হয়। এই পরিস্থিতে বাংলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠে । দৈনিক আজাদ পত্রিকার ১৯৩৭ সালের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় ঃ

এই বিস্তৃত ভূখন্ডে (বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল) প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। হিন্দি ভাষীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী নয়। তাছাড়া আসামী, উড়িয়া, এবং মৈথিলি ও বাংলারই শাখা ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যের দিক দিয়া বাংলা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশী । অতএব বাংলা সবদিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রভাষার আসনের উপর বাংলা ভাষার দাবী সম্বন্ধে আর একটি কথা ও বিশেষ ভাবে জোর দিয়া বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রভাষার নির্বাচন লইয়া হিন্দিও উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে আজ যে তুমুল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে হয়ত উর্দু ও হিন্দির মধ্যে কোনটারই রাষ্ট্রভাষার আসন অধিকার করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা হইলে এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষের আশঙ্কা বহু পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে।[২]

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগের অবাঙালী ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উর্দুর প্রতি পক্ষপাত ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের প্রাক্কালে ভারত বিভাগ যখন প্রায় নিশ্চিত তখন আবার ভাষা বির্তক নতুন রূপ নেয়। মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এ ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল। এ বদ্ধমূল ধারণাকে কেন্দ্র করে বাঙালী শিল্পী সাহিত্যিক কবি ও সাংবাদিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারপর থেকেই বুদ্ধিজীবীরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষ্যে ব্যাপক লেখালেখি শুরু করেন। লেখক সম্প্রদায় রাষ্ট্রভাষার তত্ত্বগত দিকটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছিলেন। কেউ একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে, কেউ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। এ সময়ে যাঁরা বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন কবি ফররুখ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৬ সালে শেষের দিকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার একশ্রেনীর শিক্ষিত ব্যক্তির রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিপক্ষে বক্তব্য রাখার কঠোর সমালোচনা করে কবি ফররুখ আহমদ 'পূর্ব পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

পাকিস্তানের অন্তত ঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হইবে একথা সর্ব(জন) সম্মত হইলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করিয়াছেন যাহা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষায় রূপান্তরিত করিলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হইবে এই তাহাদের অভিমত। কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করিয়াছে একথা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।[৩]

বাংলা ভাষার পক্ষে এ পর্যায়ে লেখালেখি অবশ্য জোরালো ছিলনা। কারণ বাংলাদেশের বেশ কিছু রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী ও উর্দুর পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

ওকালতি করেন। তবে ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রথম সারির প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের হায়দরাবাদে দেয়া বক্তৃতায় উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে (আজাদ, ১৯মে ১৯৪৭) এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ এর উর্দুর পক্ষে দেয়া বক্তৃতা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সচেতন করে তোলে। এ সময় তাদের একটি অংশ বাংলা ভাষার পক্ষে লেখনী শানিত করেন এবং জুন মাসেই তাদের কেউ কেউ মুসলিম প্রধান বাঙালী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন বক্তব্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। প্রাবন্ধিক আব্দুল হক দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায় দু' কিস্তিতে (২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭) ' বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'; দৈনিক 'আজাদে' (৩০ জুন ১৯৪৭) ' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'; ১৯৪৭ সালের ২৭ জুলাই পুনরায় 'ইত্তেহাদে' 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' এবং মিসেস এম.এ. হক ছদ্ম নামে সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে চতুর্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৪]

ড.জিয়াউদ্দীন আহমদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। এ প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ

কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষে ও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমোনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন যেমন-পশতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।[৫]

ড.জিয়াউদ্দীন আহমেদের প্রদেশ সমূহের বিদ্যালয় গুলোতে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার না করে একমাত্র উর্দুকে শিক্ষার বাহন হিসেবে চালু করার দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করেন ড, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর মতে 'এটা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরুদ্ধই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ণাধিকার ও বিরোধী'। এই প্রবন্ধটির পর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ১৭ পৌষ, ১৩৫৪ 'তকবীর' পত্রিকায় ' পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি উল্লেখ করেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

" হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষনীয় ভাষা অবশ্যই বাঙলা হইবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারেনা। এই বাঙ্গালাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষা"।[৬]

ড. শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ ছাড়া ও ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আব্দুল মতিন ২১ জুলাই (১৯৪৭) 'আজাদ' পত্রিকায় লেখেন 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'; এবং এ, কে নুরুল হক লেখেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধ। এসব প্রবন্ধে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা নিরূপণ ও দাবীর যৌক্তিকতা বিচার সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে।[৭]

১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগ সম্পর্কিত রোয়েদাদ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্প সংখ্যক বামপন্থী কর্মীদের উদ্দ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণ আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন গঠিত হয়। আদর্শ ভিত্তিক এই সংগঠন ' আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ' নামে যে দলীয় ঘোষণা পত্র প্রকাশ করে তাতে স্পষ্টতই ঘোষণা করা হয় ঃ

'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে এবং বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।

গণ আজাদী লীগের ভাষা সর্ম্পকিত দাবী ছিল মূলত বাঙালীর প্রাণের দাবী। এর আহবায়ক ছিলেন কমরুদ্দীন আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমূখ বামপন্থী প্রগতিবাদী কর্মী।[৮]

এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট সৃষ্টি হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তখনও বাদানুবাদ অব্যাহত থাকে। এসময় ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক মোহাম্মদ আবুল কাশেম, নুরুল হক ভুঁইয়া. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) ও শামসুল আলম। তাঁদের প্রচেষ্টায় 'তমদ্দুন মজ্‌লিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন একটি সাংগঠনিক ভিত্তি অর্জন করে। ইতোপূর্বে ভাষা প্রসঙ্গটি পত্র পত্রিকায় আলোচনা ও বিবৃতি দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে ভাষা প্রশ্নটি পত্র প্রত্রিকায় আলোচনা ও অংশ গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। তমদ্দুন মজলিশ ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'? এই শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্দ্যোগে প্রকাশিত এ পুস্তিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক'ইত্তেহাদের' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদের লেখা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া এ পুস্তিকাটিতে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব সংযোজিত হয়। তমদ্দুন মজলিশের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাশেম কর্তৃক লিখিত ভাষা বিষয়ক এই প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

১। বাংলা ভাষাই হবে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি- বাংলা ও উর্দু।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। ইংরেজী হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা।

৪। শাসন কাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত ঃ কয়েক বছরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কাজ চলবে।

লাহোর প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দিয়ে তমদ্দুন মজলিশের উক্ত পুস্তিকায় বলা হয়,'লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক রাষ্ট্র ভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।'[৯]

এই পুস্তিকাটিতে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেমের রচিত প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলার পক্ষে জোরালো যৌক্তিক ব্যাখ্যা উত্থাপন করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের এই প্রয়াস বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

ফলপ্রসু হয়নি। কারণ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পশ্চিম পাকিস্তানী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকেই বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তা সত্বেও ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম ভাষা প্রশ্নটি আলোচনা ও বিবেচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পূর্ববাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কবি জসীমউদ্দিন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজল এবং আবুল কাশেম অন্যতম। আলোচনায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয় এবং এর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।[১০]

১৯৪৭ সালেই বাংলা ভাষার পক্ষে অন্য একটি উদ্দ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। দেশব্যাপী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের এক যুব সম্মেলনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গঠিত হয় 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে সংগঠনটি প্রকাশ করে 'আমরা গড়িব স্বাধীন সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান' নামে পুস্তিকা। এতে ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ

> পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।[১১]

১৯৪৭ সালেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানি অর্ডার ফর্ম, ডাকটিকিট এবং মুদ্রায় শুধুমাত্র ইংরেজী ও উর্দুর ব্যবহার এবং এতে বাংলার ব্যবহার পরিহার করার ফলে পূর্ববাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিশের উদ্দ্যোগে সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্রলীগের কয়েজন কর্মীর

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিতিতে তমদ্দুন মজলিশের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়া এর আহবায়ক নির্বাচিত হন। এই সংগ্রাম পরিষদ প্রথম দিকে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান,লেখালেখি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, সরকারী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার এবং কিছু সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত রাখে।[১২]

১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবীতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাছাড়া ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক বসে । এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' এ বৈঠক চলাকালে বহু সংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাকে অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।মওলানা আকরাম খানের মধ্যস্থতায় বিক্ষোভকারী দল সভাস্থান ত্যাগ করেন এই শর্তে যে, 'তাদের দাবী সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।' আকরাম খান বিক্ষোভ কারীদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে,'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আরোপের চেষ্টা করলে পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং তিনি নিজে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন। [১৩]

ঢাকায় যখন ভাষা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা চলছে তখন পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে প্রথম শিক্ষা সম্মেলন চলছিল। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর এ সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে পূর্ববাংলা হতে বেশ কয়েকজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে পূর্ব বাংলার শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার, শিক্ষা সচিব ফজলে করিম, জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক কুদরত-ই-খুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাহমুদ হাসান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সম্মেলনে উদ্বোধণী ভাষণে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেন।[১৪]

সম্মেলনে অংশ গ্রহণের পর পূর্ব বাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার এবং আব্দুল হামিদ ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যা বলেন তার বিবরণ ৬ ডিসেম্বর মর্নিং নিউজে প্রকাশিত হয়। মর্নিং নিউজে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত খবর এবং এ.পি.আই.পরিবেশিত তথ্যে দুটি বিষয় বের হয়ে আসে ১. শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২.সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে উর্দুকে পাকিস্তানের লিঙ্গুয়াফ্রাংকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বলা হয়, পাকিস্তান সংবিধান সভাই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের মীমাংসা করবে। যদিও মন্ত্রীদ্বয় মর্নিং নিউজ পত্রিকায় তাদের দেওয়া বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[১৫]

এই সম্মেলনের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং এই খবর ঢাকা পৌঁছলে শিক্ষিত সচেতন মহলে ক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে। শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই হলো সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্র সমাবেশ। এ সভায় বক্তব্য রাখেন মুনীর চৌধুরী, আব্দুর রহমান চৌধুরী (বিচারপতি) কল্যান দাশ গুপ্ত, এ.কে. এম. আহসান, এস.আহমদ। ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ নিম্ন লিখিত প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন এবং সেগুলো সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়ঃ

১। বাংলাকে পাকিস্তানের ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২। রাষ্ট্র ভাষা এবং লিঙ্গুয়াফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলাভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করা।

৩। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্য সভা তাঁদের আচরনের তীব্র নিন্দা করছে।

৪। সভা মর্নিং নিউজ এর বাঙালী বিরোধী প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে। [১৬]

Dhaka University Institutional Repository

সভাশেষে মিছিল সহকারে ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েট ভবনে উপস্থিত হয়। সেখানে কৃষিমন্ত্রী মুহাম্মদ আফজাল ছাত্রদের দাবী পূরণের আশ্বাস দেন। এর পর ছাত্ররা প্রাদেশিক মন্ত্রী নুরুল আমীনের বাসায় উপস্তিত হলে তিনি বাংলার জন্য সংগ্রাম করবেন বলে ছাত্রদের প্রতিশ্রুতি দেন। নুরুল আমীনের বাসভবন থেকে মিছিলটি হামিদুল হক চৌধুরীর বাসভবনে প্রবেশ করলে তিনি ও বাংলার দাবী সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেন। সবশেষে ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসায় যান। তিনি অসুস্থতার অজুহাতে ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রবল দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি তিনজনের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎদানে সম্মতি প্রদান করেন। এরপর ফরিদ আহমদ সহ তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর নাজিমুদ্দিন একটি লিখিত আশ্বাস দিয়ে বলেন, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করবেন"। প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন থেকে মিছিলটি পরে 'মর্নিং নিউজ' অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভাষা সম্পর্কে তাদের নীতি পরিহার করার দাবী জানান।[১৭]

ভাষার প্রশ্নে একদিকে আন্দোলন অন্যদিকে সরকারের একে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সরকার উর্দুর পৃষ্ঠপোষতা করতে থাকে। বাংলা ভাষার দাবীকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম রক্তাক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় ১৯৪৭ সালের ১২ ডিসেম্বর পলাশী ব্যারাকের ঘটনায়। এই ঘটনার উৎস ছিল উর্দু ভাষার পক্ষে প্রচার ও জনসভার আহবান। ঢাকার চকবাজারের উর্দু ভাষীগণ ১৯৪৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে এক জনসভার আয়োজন করে। 'মুকুল' নামের একখানা বাসে করে কতিপয় উর্দুভাষী মাইকযোগে জনসভার কথা ঘোষণা করে এবং আপত্তিকর বক্তব্য সম্বলিত প্রচার পত্র বিলি করে। গাড়ীটি সকাল (১২ ডিসেম্বর) দশটায় চক বাজার থেকে প্রচার কার্য শুরু করে দুপুর নাগাদ পলাশী ব্যারাকের সামনে পৌঁছে। পলাশী ব্যারাক তখন ঢাকাবাসীর সাথে সরকারী কর্মচারী ও ছাত্রদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ব্যারাকের পাশেই ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। গাড়ীটি পলাশী ব্যারাকের কাছে পৌঁছালে উর্দুভাষী প্রচারণাকারীদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাক বিতন্ডা শুরু হয় এবং শেষে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষে পলাশী ব্যারাকে বসবাসরত সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ জনগণ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উর্দুভাষী বাস আরোহীগণ পরাস্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে আধ ঘন্টা পরে অধিক সংখ্যক উর্দুভাষী লাঠি সোটা সহ পলাশী ব্যারাক আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ও জনতা আহত হয়। এই ঘটনার

Dhaka University Institutional Repository

পর ছাত্র এবং সরকারী কর্মচারীগণ পলাশী ব্যারাকের অভ্যন্তরে এক প্রতিবাদ সভা করে। সভাশেষে তারা মিছিল করে সচিবালয় অভিমুখে অগ্রসর হয়। মিছিলকারীরা তৎকলীন মন্ত্রী আব্দুল হামিদের বাসভবনে পৌঁছে এবং তাঁকে নিশ্চয়তা প্রদানে বাধ্য করে যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। মন্ত্রী আব্দুল হামিদকে সাথে নিয়ে মিছিলকারীরা সচিবালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে মিছিলকারী ছাত্র জনতার সাথে প্রহরারত পুলিশের সংঘর্ষ হয়।[১৮]

পলাশী ব্যারাকের এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই ঘটনা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করে। পলাশী ব্যারাকের ঘটনার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণের বিষয়টি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বছরের শুরুতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি সভা অনুষ্ঠান, লিফলেট প্রকাশ, প্রবন্ধ লেখা এবং গণ সংযোগের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী আবুল কাশেম সহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আরও কয়েকজন সদস্য মওলা সাহেবের (ফজলুল হক) নাজিরা বাজারের বাসায় ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় ফজলুর রহমানের সাথে সংগ্রাম পরিষদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা স্থান না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচানা করেন। আলোচনা শেষ পর্যন্ত তুমুল বির্তকে পরিণত হয়। এ সময় ফজলুর রহমান বলেন যে,উপরোক্ত কয়েক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাদ দেবার ব্যাপারটি একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়। নিতান্তই ভুল বশতঃই সেটা ঘটেছে। তিনি প্রতিনিধি দলকে সে ভুল সংশোধনের আশ্বাসও প্রদান করেন।[১৯]

ফজলুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর ফেব্রুয়ারী মাসেই সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষার দাবী জ্ঞাপক একটি স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে এবং কয়েক হাজার স্বাক্ষর সহ সেটি সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মাহমুদ হাসান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দেবার সময় ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে বলেন, 'একমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাই পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না'।[২০]

প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন কেবল মাত্র শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এর পর তা ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। জানুয়ারী মাসেই পাবনার স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি সমিতির এক সভায় বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়। এই দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গঠন করার জন্যে ও তাঁরা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২১] মোট কথা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রয়োজনে সরকারের উপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করতে হবে-এ সত্যটি তখন উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই।

বাংলাভাষা আন্দোলনের সাথে প্রথম থেকেই নারীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের প্রতিবাদ করেন যশোর মাইকেল মধুসূদণ কলেজের ছাত্র ফেডারেশনের নেত্রী হামিদা রহমান। প্রতিবাদ লিপিটি ছাপা হয় কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা'তে। হামিদা রহমান প্রতিবাদ লিপিতে বলেছিলেন, বাঙালী হিসেবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবী করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসেবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে দাবী করবোনা কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় পত্রিকা 'আজাদ' এর পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা । বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে, সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবেনা, এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার সাথে তাদের প্রাণের কোন যোগই থাকবেনা, এও কি সত্য হবে?[২২]

বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর কাছে এক স্মারক লিপি প্রেরণ করা হয় ১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর। এই স্মারক লিপিতে দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ছাত্র, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জয়শ্রীর সম্পাদিকা মিসেস লীলা রায় এবং মিসেস আনওয়ারা চৌধুরী।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের সূচনাতেই ভাষার প্রশ্নে সিলেটের মহিলারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে তারা বাংলার পক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। এই তৎপরতা আবর্তিত হতে থাকে জেলার মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী, আজীবন সংগ্রামী জোবেদা খাতুন চৌধুরীকে কেন্দ্র করে। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের দাবী জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে এক স্মারক লিপি পেশ করা হয় সিলেট জেলার মহিলাদের পক্ষ থেকে। এতে স্বাক্ষর করেন মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধূরী, সহকারী সভানেত্রী সৈয়দা শাহের বানু, সম্পাদিকা সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রাবেয়া খাতুন,[২৪] জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসী কাইসার রশীদ, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন, এবং শামসুন্নেসা খাতুন প্রমুখ।[২৫]

এর প্রতিক্রিয়া হয় খুবই অপ্রত্যাশিত ভাবে। সিলেটের 'ইস্টার্ন হেরাল্ড' নামের সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকায় এর উপর একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে অন্যমত স্বাক্ষর কারিনী জোবেদা খাতুন এবং স্মারকলিপিটি সম্পর্কে কতকগুলো অশোভন ও বিরূপ মন্তব্যে ভরা 'ইস্টার্ন হেরাল্ড' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন অন্যতম স্বাক্ষরদাত্রী সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন। সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকায় সেটা প্রকাশিত হয়। তাতে নজিবুন্নেসা উল্লেখ করেন যে, সিলেটের মহিলারা বাঙালী জাতির ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে একটি স্মারক লিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন । একাজ করার পূর্ণ অধিকার তাঁদের রয়েছে। তিনি প্রতিবাদ লিপিতে আরও উল্লেখ করেন ঃ

> "যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন। তাহাদের তত দোষ দেওয়া যায়না । কিন্তু যাহারা ধর্মের দোহাই দেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করি যে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষা সিলেটের উর্দু অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের অনুশাসন পালনে কোন্ অংশে হীন? বরং এবিষয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সিলেটের মুসলমানদের তহজীব ও তমদ্দুন এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য ছিল যে উর্দু ভাষাভাষী অধিক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানসীন মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব ফলে অল্প দিনের মধ্যে অল্প শিক্ষিতা

Dhaka University Institutional Repository

নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন। এবং স্বামী পুত্রের সহযোগিতা করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলার পরিবর্তে উর্দু হয়, তবে আমাদের মত অল্প শিক্ষিতা নারীদের জন্য উর্দু শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা আমাদের ধারণাতীত।"[২৬]

সিলেটের মহিলাদের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম মহিলা লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুনের কাছে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেনঃ

"আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি। সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি তা আপনারা করেছেন। উর্দুর সমর্থনে সিলেটের কোন কোন পত্রিকা যে জঘন্য প্রচার করছে আর সিলেটের কোন পুরুষরা স্মারক লিপি দিয়ে যে কলংকজনক অভিনয় করেছেন তা সত্যিই বেদনাদায়ক। কিন্তু আপনাদের প্রচেষ্টা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনাদের প্রেরিত স্মারক লিপি আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। নিশতার সাহেবের সাথে দেখা করেও আপনারা মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। 'তমদ্দুন মজলিশ' আজ আপনাদের অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আপনাদের নিঃস্বার্থ কর্মচাঞ্চল্যে বাংলাভাষা আন্দোলন আরো সক্রিয় আরো প্রবল হয়ে উঠবে।"[২৭]

মাতৃ ভাষা বাংলার সম্মান রক্ষা করা, তাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সিলেট অঞ্চলের নারীদের এ অবদান অসামান্য । তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটা ছিল সত্যি সত্যিই দুঃসাহসী কাজ।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রয়ারী করাচীতে পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটির উপর গণ পরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে লিয়াকত আলী খান বলেনঃ

এখানে প্রশ্নটি তোলাই ভুল হয়েছে। এটি আমাদের জন্য একটি জীবন-মরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।[২৮]

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে"। গণ পরিষদের সহ সভাপতি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি তমিজুদ্দিন খান ও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন।[২৯]

মোট কথা মুসলিম লীগ দলভূক্ত সদস্যরা বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে সমস্বরে প্রস্তাবটির নিন্দা এবং বিরোধিতা করেন। বাংলাকে গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবী অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তার তীব্র বিরোধিতার খবর ঢাকায় পৌছানো মাত্র ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উর্দুকে পূর্ববাংলার অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী, খাজা নাজিমউদ্দীনের এই উক্তিকে তাঁরা সকলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বর্ণনা করেন। গণ পরিষদে বাংলাভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করেন। ঐদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জনের পর মিছিল করে বাংলা ভাষার সমর্থনে শ্লোগান দিতে দিতে রমনা এলাকা প্রদক্ষিণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয় এবং বিকেলের দিকে সেখানে একটা সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাসেম। তিনি গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং সেই প্রসঙ্গে গণ পরিষদের মুসলিম লীগ দলভুক্ত বাঙালী সদস্যদের আচরণ ও উক্তিসমূহের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দেন। এই ছাত্র সভায় নাজিমউদ্দীনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ, বাংলা ভাষাকে গণ পরিষদের অন্যতম সরকারী ভাষা করার উদ্দেশ্যে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এ সম্পর্কে মুসলমান সদস্যদের মনোভাব ও ঢাকা বেতারের মিথ্যা ও পক্ষপাত মূলক সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। "পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ দিবস" পালন করতে ছাত্র সমাজকে আহবান জানানোর জন্যে তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা সাব কমিটিকে অনুরোধ জানিয়ে এই সভায় পৃথক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৩০]

গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গঠন করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস এবং

Dhaka University Institutional Repository

তমদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্দ্যোগে ১৯৪৮ এর ২ মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহবান করা হয় । এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন তাদের মধ্যে কমরুদ্দীন আহমদ, রনেশ দাশগুপ্ত, আবুল কাসেম, শামসুদ্দিন আহমদ, অজিতগুহ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, শহীদুল্লাহ কায়সার, তাজউদ্দীন আহমদ, আনোয়ারা খাতুন ও লিলি খান অন্যতম। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরুদ্দীন আহমদ।[৩১]

ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃতি লাভ,তমদ্দুন মজলিশ প্রভাবিত পূর্ববর্তী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বহুমুখী সীমাবদ্ধতা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী ভাষা সংগ্রাম কমিটি বিলুপ্ত করে ভাষা আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক রূপ দেয়া এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হলের এই সভায় একটি ব্যাপক ভিত্তিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

> "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" নামে এই সর্বদলীয় পরিষদে গণ আজাদীলীগ গণতান্ত্রিক যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার পর এই সভা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই সাথে পাকিস্তান গণ পরিষদে সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলাভাষাকে বাদ দেবার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ববাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৩২]

১৯৪৮সালে গণ পরিষদের ঘটনার পর এবং ১১ মার্চের আগেও মফস্বলে বিক্ষোভ সংঘঠিত হয়েছিল ভাষা প্রশ্নে। অনেক জেলাতে ঢাকায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার পূর্বেই সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। যেমন- পাবনায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ১ মার্চ। অথচ পাবনায় রাষ্ট্রভাষার জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক লুৎফর রহমানের বাসায় সর্বপ্রথম একটি বৈঠক হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী পাবনা শহরে ভাষার প্রশ্নে হরতাল আহবান করা হয়। হরতাল পালন কালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করে। [৩৩] ১১ মার্চ এর হরতাল পালন সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে ভুমিকা রাখেন সেলিনা বানু ও সাবেরা মুর্শেদ।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ঢাকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুন্সীগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। মেয়েদের মধ্যে এ ভাষা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন হরগঙ্গা কলেজের ছাত্রী স্মৃতিকনা গুহ।[৩৫]

বগুড়াতে কবি আতাউর রহমানকে আহবায়ক করে ' বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটি ' গঠিত হয়। এই কমিটিতে অন্যান্যের সাথে ছিলেন রহিমা খাতুন ও সালেহা খাতুন।[৩৬]

যশোরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় ২৮ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮)।[৩৭] যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী এবং হামিদা রহমান।[৩৮]

বাংলা ভাষার দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে। ঢাকাসহ সারাদেশে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এ ধর্মঘট সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়। ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ধর্মঘটী ছাত্রদের অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ছাত্রনেতা (মরহুম) খালেক নেওয়াজ খান ও মোহাম্মদ তোয়াহা পুলিশ কর্তৃক নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হন। গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী প্রমুখ। গ্রেফতারের পর তাদের সকলকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।[৩৯]

১১ মার্চ শুধু ঢাকাতেই নয় ঢাকার বাইরে ও অনেক জায়গায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ঐ দিন ছাত্র/ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করেন। প্রায় সকল স্থানেই শান্তি পূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হলেও যশোর ছিল সে দিনের আর একটি ব্যতিক্রম। ১১ মার্চ যশোরে মোমিন গার্লস স্কুল ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। মুসলিম একাডেমী সম্মিলনী, জেলা স্কুল ইত্যাদিতে ধর্মঘটের পর হামিদা সেলিম ও আলমগীর সিদ্দিকীর যৌথ নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। এই সময় মোমিন গালর্স স্কুলে ধর্মঘট না হওয়ার সংবাদ পৌঁছালে সমগ্র মিছিলটি সেখানে উপস্থিত হয়ে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসার জন্য ছাত্রীদেরকে আহবান করতে থাকে এবং এর ফলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ হরতালের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রী ও সেই দলে ছিলো। তৎকালীন জেলা মেজিষ্ট্রেট (নোমানী) এর মেয়ে ও ছিল ঐ দলভূক্ত এবং সে সক্রিয় ভাবে অন্য সকলকে ধর্মঘট করতে বাধা

Dhaka University Institutional Repository

দিতে থাকে। কিন্তু হামিদা রহমানের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত মোমিন গার্লস স্কুলের মেয়েরা ও ধর্মঘটে যোগদান করেন।

সমগ্র মিছিলটি জেলা কালেক্টরেটের সামনে উপস্থিত হলে জেলা কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী ছাত্র ছাত্রীদের উপর পুলিশের মাধ্যমে হামলা চালায়। এই হামলার প্রতিবাদে সেদিন যশোরে দারুণ সরকার বিরোধী উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকেলে সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে যায় এবং সংগ্রাম পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪০]

এ ঘটনায় সরকারের রুদ্ররোষে পড়েন হামিদা রহমান। তাঁর নামে হুলিয়া জারী হয়।[৪১]

হামিদা রহমানের সাথে সেদিন মিছিলে যোগ দেন সুফিয়া খাতুন। মিছিলে অংশ গ্রহণের কারণে পরের দিন সকালে বাড়ী থেকে পুলিশ সুফিয়া খাতুনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয় হয় এবং নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।[৪২]

খুলনায় প্রথম আন্দোলন দানা বাঁধে দৌলতপুর বি.এল.কলেজে। ২৮ ফেব্রুয়ারী সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। ১১মার্চ (১৯৪৮) ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস (ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থিত) যুক্তভাবে ধর্মঘট ডাকলে খুলনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। শহরে বিশাল মিছিলও বের হয় এবং সেটি গান্ধী পার্কে (হাদিস পার্ক) গিয়ে শেষ হয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে। আব্দুল হামিদ, আমজাদ হোসেন, ধনয়দাশ, মনসুর আলী, জগদীশ বসু, আব্দুর রউফ সহ অন্যান্যের সাথে এ আন্দোলনে অংশ নেন আনোয়ারা খাতুন, লুৎফুন্নাহার, ফাতেমা চৌধুরী, সাজেদা হেলেন, কৃষ্ণাদাস প্রমুখ।[৪৩]

১১ মার্চে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১৩ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, প্রভৃতি শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে এবং সংগ্রাম পরিষদ ঐ ধর্মঘট ১৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কারন ঐ দিনটি ছিল পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪মার্চ তারিখে ও পূর্ব বাংলার সর্বত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। সেদিন অর্থাৎ ১৪ তারিখে সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলে সংগ্রাম কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পরের দিন সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৪৪]

১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হওয়ার কথা। পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদ ঐদিন ধর্মঘট আহবান করে। উত্তেজনাকে স্তিমিত করার লক্ষে খাজা নাজিমউদ্দীন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের সাথে আলোচনার জন্য পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থামত 'বর্ধমান হাউসে' বেলা সাড়ে এগারটার সময় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আলোচনা কালে সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের মধ্যে তুমুল বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে নাজিমউদ্দীন শেষ পর্যন্ত তাদের সবকটি দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ৮ দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি কিছু রদবদল করে নাজিমউদ্দীন স্বহস্তে সেটি নতুন ভাবে লিখে দেন। সর্বসম্মত চুক্তিটির বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া একমাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাঙলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তানের গণ পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণ ভাবে স্কুল কলেজ গুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সংবাদ পত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।[৪৫]

সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ চুক্তি পত্রটিতে স্বাক্ষর দেন।[৪৬]

১৫মার্চ (১৯৪৮) দুপুর ১ টায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলছিল। অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বেই পরিষদ ভবনের সামনে ছাত্ররা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। সভার শুরুতেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাইরে ছাত্রদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে চান। একে একে প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, মনোরঞ্জন ধর প্রভৃতি বাইরে ছাত্রদের উপর কোন পুলিশী অত্যাচার হচ্ছে কিনা সেটা দেখে আসার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং তার ফলে পরিষদের ভেতরে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী বাইরে কি হচ্ছে তা স্বচক্ষে না দেখায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মসিউদ্দীন আহমদ বলেন যে, পুলিশ অফিসার গফুরের জন্যে সংগ্রাম কমিটির সাথে প্রধানমন্ত্রীর চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। গফুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকে সেখানে ছাত্রীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়েছে। কাজেই যে চুক্তি হয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেছে এবং তার ফলেই বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।[৪৭]

পরিষদের মধ্যে ফজলুল হক, আনোয়ারা খাতুন এবং অন্যান্যেরা বাইরের পরিস্থিতি দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ক্রমাগত দাবী জানাতে থাকেন। এই সময় একবার অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে আনোয়ারা খাতুন বলেন ঃ

> "গত ১১ মার্চ তারিখে যা হয়েছে, তা হয়েছে। আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে, গলা টিপে মেরেছে, তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামী এখানে চলবেনা। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুন।"[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ারা খাতুনের এই বলিষ্ঠ দাবীকে সমর্থন করে শামসুদ্দিন আহমদ বলেন যে, পুলিশ যখন মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে তখন এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিৎ।[৪৯]

পরিষদের বাইরে বিক্ষোভ চলাকালে মাঝে মাঝে ফজলুল হক, মুহম্মদ আলী, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সাথে পরিষদ সদস্য নেলী সেন গুপ্তা বাইরে এসে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সাথে কথা বলেন এবং বাংলা ভাষার দাবীর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[৫০]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে তাড়াহুড়ো করে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদের সবগুলি দাবী মেনে নেবার আসল কারণ ছিল পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর। এই সফরের সময় জনগণ কর্তৃক বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই নাজিমউদ্দীন ও তার সরকার যথেষ্ট নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেন।

জিন্নাহর আসন্ন সংবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ মনে করেছিল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রখ্যাত আইনজীবী জিন্নাহর কাছ থেকে তাঁরা সুবিচার পাবেন। তাদের এ চিন্তা অমূলক ছিলনা । রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রের অখন্ডতায় বিশ্বাসী হন। ব্রতী হন কল্যাণ সাধনায়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকেন। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকায় এলেন। প্রবল বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে হাজার হাজার জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য তেজগাঁও বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বিমানবন্দরে জিন্নাহকে স্বাগত জানালেন, কিন্তু তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো ২১ মার্চ ঘোড়দৌড় (রেসকোর্স) ময়দানের বিশাল জনসভায় জিন্নাহর বক্তৃতায়। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয় '।[৫১]

২৪ মার্চ (১৯৪৮) সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন্নাহর সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করেন। রেসকোর্সের বক্তৃতার মতোই এখানে ও তিনি ভারতের শত্রুতা পূর্ববাংলায় মুসলিম পঞ্চম বাহিনীর বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় মুসলিম লীগের অপরিহার্যতা প্রভৃতি বিষয়ে বলার পর ভাষা প্রসঙ্গে তিনি যখন বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

'Urdu and only Urdu Shall be the State language of Pakistan' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে ছাত্র সমাজ। বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হল 'No, never' ছাত্ররা না'না'চিৎকার দিয়ে জিন্নাহর বক্তৃতার বাঁধা সৃষ্টি করেন। কিন্তু জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রদানে বিরত না হয়ে আবার সেই একই বক্তব্য প্রদান করে।[৫২]

২৪ মার্চ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎকার দেন জিন্নাহ। সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, অলি আহাদ তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যের সাথে কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলি খান।[৫৩] আলোচনার প্রথমেই তিনি বলেন যে নাজিমউদ্দীনের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছে তা তিনি মানেন না কেননা নাজিমউদ্দীনের কাছ থেকে জোড়পূর্বক সেই সই আদায় করা হয়েছে। তখন ও জিন্নাহ দৃঢ়ভাবে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের পক্ষে জোড়ালো যুক্তি প্রদর্শন করা সত্বেও মিঃ জিন্নাহ অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।[৫৪] সাক্ষাৎকারের সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষথেকে জিন্নাহর কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে একটি স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।[৫৫]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্রদের কর্মতৎপরতা কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু স্বৈরশাসনের মোকাবিলায় ছাত্রদের অন্যান্য আন্দোলন, সাধারণ মানুষের দুর্ভিক্ষ ও দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী, এমনকি সরকারী-আধাসরকারী থেকে শুরু করে পুলিশ কনষ্টবলদের অর্থনৈতিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং তাদের দাবী আদায়ের জন্য তারা ধর্মঘটের আশ্রয় নেয়।[৫৬]

ভাষা আন্দোলনের মত ব্যাপক কোন বিক্ষোভ না ঘটলে ও এই পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ঢাকাতে সর্ব প্রথম সংঘটিত হয় ব্যাপক ছাত্রী ধর্মঘট। ইডেন ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল একত্রীভূত করার প্রতিবাদে এই দুই স্কুল ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা ১৫ নভেম্বর ধর্মঘট পালনের পর প্রাদেশিক সচিবালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারী ঢাকাসহ প্রদেশের অনত্র বহু ছাত্রের উপর নির্যাতন মূলক ব্যবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে 'জুলূম প্রতিরোধ দিবস' উদযাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ ধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের আহবায়ক নইমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ছাত্রী নাদেরা বেগম। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। নাদেরা বেগম কামরুন্নেসা স্কুল, বাংলা বাজার স্কুল, ইডেন কলেজ সহ মেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে সভা ও সমাবেশ করতেন। ধর্মঘট ও মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুবক্তা নাদেরা বেগম। নারীরা উদ্দীপিত হয়েছেন নাদেরা বেগমের বক্তৃতার মাধ্যমে।[৫৮]

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন আইন বিভাগের ছাত্রী লুলু বিলকিস বানু ও নাদেরা বেগম।[৫৯]

১৯৫০ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে। অন্যদিকে এ সময় বাংলা ভাষা বিরোধী সরকারী ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। পূর্ব বাংলা সরকার ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পঠিত হওয়া উচিত, যাতে দুই অঞ্চলের মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হয়। এছাড়া আরবী হরফে বাংলা লেখায় আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রয়াস ১৯৪৯ সালে শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান তত্ত্বগতভাবে আরবী লিপি গ্রহণের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । তবে ১৯৪৯ সালের লিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে 'ইসলামী আদর্শের খাতিরে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবাহী ও বিজ্ঞানসম্মত লিখন প্রণালী পরিবর্তন করে আরবী হরফ' প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৯) কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ' পাকিস্তানের সব ভাষার লিখন প্রণালী আরবী হরফ করার' জোর সুপারিশ করে। কারো বুঝাতে বাকী থাকলনা যে এর মূল লক্ষ্য ছিল, বাংলা লিপির ধ্বংস করা। এ ঘটনার বিরুদ্ধে ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ সচেতন হয়ে উঠে। আরবী লিপি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহাভিযান, প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ পুনরায় শুরু হয়। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার এ ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

কোন উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন প্রয়াস। পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে। এভাবে ১৯৫০ সাল অতিবাহিত হয়।[৬০]

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর প্রতি বৎসরের মত ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে রাষ্ট্রভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। দুপুর ১২ টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খালেক নেওয়াজ খানের সভাপতিত্বে ধর্মঘটী ছাত্র ছাত্রীদের এক সভা শুরু হয়। এই সভায় ১৯৪৮ সালের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার জন্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রাদেশিক সরকারের নিন্দা করা হয়। সংবিধান সভায় পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের কাছে সভায় দাবী জানানো হয় যাতে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আওয়াজ তোলেন। এ সভায় বক্তৃতা কালে আব্দুল মতিন বলেন যে, তাদের কর্তব্য ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের প্রতি ও দৃষ্টি দেয়া দরকার। সে জন্যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি নতুন ভাবে উত্থাপন করে সংগঠিত ভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এরপর নাদিরা বেগম আব্দুল মতিনকে নির্দিষ্ট ভাবে তাঁর প্রস্তাব সভায় উত্থাপনের জন্য বলেন। তারপর মতিন প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ (সংগ্রাম পরিষদ) নতুন ভাবে গঠন করা এবং সেই কমিটির উপর আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করা দরকার। এই প্রস্তাবের পর সেদিনকার সেই বিশ্ববিদ্যালয় সভাতেই ছাত্রদের উপস্থিতিতে আব্দুল মতিনকে আহবায়ক করে " বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।[৬১]

এ কমিটির নেতৃত্বে নারীরাও ছিলেন। তাদের মধ্যে নাদেরা চৌধুরী ও লিলি খানের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার কয়েকদিন পর তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'পতাকা দিবস' উদযাপন করা হয় এবং সংবিধান সভার সদস্যদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত একটি স্মারক লিপি পাঠানো হয় এবং পাকিস্তানের সব পত্রিকাতে ও তার কপি পাঠানো হয়।[৬২]

এরপর ১৯৫১ সালের ১৫ এপ্রিল করাচীর উর্দু সম্মেলনে মওলানা মহম্মদ আকরাম খান সভাপতির ভাষণে বলেনঃ "যে একদল লোক পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষার বিরোধিতা করে তারা যেই মহল থেকে প্রেরণা ও সমর্থন লাভ করে যারা যা কিছু ইসলামী তারই বিরোধী ও তার প্রতি বৈরী

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবাপন্ন এবং যেহেতু তারা মনে করে যে উর্দু পাক ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে সে জন্য তারা উর্দুর প্রতি ও পোষণ করে বিরূপ মনোভাব।"

উর্দু সম্মেলনে মওলানা আকরাম খানের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের একটিতে তারা উল্লেখ করেনঃ

> "আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম এবং সেই দাবীর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করবো এই প্রতিশ্রুতিই আমরা জনসাধারণকে দিয়েছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সে কথা বেমালূম ভুলে গেছেন। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের উপর লোক বাংলা ভাষাভাষী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। উর্দুর সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র ভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবু আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন করতাম। কারণ পাকিস্তানের উন্নতি পূর্ণ বিকাশ ও একতার জন্য বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা কেবল বাঞ্চনীয়ই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।"[৬৩]

পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে জনগণের সংগ্রামী জীবন থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ক্রমশঃ এবং দ্রুত গতিতে দৃঢ় ভিত্তিক একটি আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উপরোক্ত ঘোষণা তারই একটি প্রমাণ।

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যাকান্ডের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিমউদ্দীন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে ঢাকা আসেন এবং ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণ দান কালে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রাদেশিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে তিনি বলেন যে, "কায়েদে আযম উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"

Dhaka University Institutional Repository

এরপর খাজা নাজিমউদ্দীন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করেন ঃ

> আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের জানাতে চাই যে, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে, একথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা এই প্রদেশের অধিবাসীরা চূড়ান্ত ভাবে স্থির করবেন আপনাদের প্রদেশের ভাষা কি হবে? কিন্তু একথা আপনাদের পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই এক সুত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।[৬৪]

খাজা নাজিমউদ্দীনের এই বক্তৃতায় ছাত্রদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হলে ও ২৯ জানুয়ারীর পূর্বে কোন প্রতিবাদ সংঘটিত করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৯ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে এই সংঘটিত বিক্ষোভের সূচনা করে।[৬৫]

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দেওয়ালে পোষ্টার লাগায় এবং ৩০ জানুয়ারী প্রতীক ধর্মঘট ও সভা আহবান করে।সে অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তারা খাজা নাজিমউদ্দীনকে তাঁর ১৯৪৮ সালে সংগ্রাম পরিষদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি রক্ষার দাবী জানায়। সভায় বক্তারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নতুন ভাবে সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে। সভায় ৪ ফেব্রুয়ারী ভাষায় দাবীতে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা শেষে ছাত্ররা মিছিল করে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।[৬৬]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কাজী গোলাম মাহবুব ৩১ জানুয়ারী ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে একটি সর্বদলীয় সভা আহবান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদসহ অপরাপর রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠন ও যোগদান করে। এ সভায় একটি প্রস্তাবে পল্টন ময়দানের বক্তৃতায় খাজা নাজিমউদ্দীনের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞাপন করা হয়। এবং অবিলম্বে তাঁর সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়। ৪ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে ধর্মঘট আহবান করে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বার লাইব্রেরীর এই সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে থাকেন মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম,আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ।[৬৭] কমিটিতে অন্যতম মহিলা সদস্য ছিলেন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন।[৬৮]

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ' ৫২' র ভাষা আন্দোলনে যে সব নারী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে নাদেরা বেগম, লুলু বিলকিস বানু জুইফুল রায়, রুনিয়া, আশালতা সেন, দৌলতুন্নেসা, সেলিনা বানু, রাইসা হারুন, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, সোফিয়া খান, রোকেয়া খাতুন, শামসুন্নাহার আহসান, হালিমা খাতুন, সুরাইয়া, নুরুন্নাহার, সারা তৈফুর, ফিরোজা বেগম, ফরিদা বারী, জহরত আরা, জোহরা তারা, লায়লা সামাদ, সুফিয়া কামাল, সালেহা খাতুন প্রমুখ ছিলেন অগ্রগণ্য। এ সময় স্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা পুরুষের পাশাপাশি সভা সমিতি, মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে।[৬৯]

৩১ জানুয়ারী (১৯৫২) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এর এই সভায় মওলানা ভাসানী, পূর্ব বঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখের সাথে একই মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন। তিনি বলেন, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকার করিয়ে নেয়ার জন্য আবশ্যক হলে মেয়েরা শেষ রক্ত বিন্দু অবধি বিসর্জন দেবে'। তাঁর এই বক্তব্য থেকেই ভাষা আন্দোলনের সপক্ষে নারীদের দৃঢ় অবস্থানের চিত্র ফুটে ওঠে।[৭০]

এই কর্মপরিষদের কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। তহবিল সংগ্রহের জন্য পোষ্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নারী কর্মীদের। নাদেরা বেগম, শাফিয়া খাতুন সহ অনেক নারী কর্মী পোষ্টার লেখার দায়িত্ব পালন করেন।[৭১] তবে হোষ্টেলের ছাত্রীদের মধ্যে নুরুন্নাহার কবীর সবচেয়ে বেশি পোষ্টার লেখেন।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে ছাত্রী শিক্ষার হার ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেক কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইডেন কলেজ এবং ৩/৪ টি স্কুলের হাতে গোনা ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রীদের মধ্যে যারা হোষ্টেলে থাকতেন তুলনামূলক ভাবে ভাষা আন্দোলনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মেয়েদের হোষ্টেল ছিল বর্তমান রোকেয়া হলের দোতলা 'চামেলী লজ'। তৎকালে সমাজ রক্ষণশীল থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে মেয়েরা আন্দোলনে অংশ নেন। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে ভাষা সৈনিক রওশন আরা বাচ্চু বলেন ঃ

> তখনকার সময়ে ছেলেদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। প্রক্টরের মাধ্যমে কথা বলতে হতো । নতুবা ১০ টাকা জরিমানার সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার সময় ছাত্রীদের কমনরুম থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ছাত্রীরা মাথায় কাপড় দিয়ে, অনেকে বোরখা পরে ক্লাশ করতেন। ক্লাশে মেয়েরা সামনের সারিতে বসত।[৭৩]

ভাষা আন্দোলন এ রক্ষণশীলতার মূলে সাময়িক ভাবে হলেও আঘাত হানে। কেননা ভাষার দাবীতে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনে অনেক ছাত্রীই গোপনে ছাত্রদের সঙ্গে মিটিং এ যোগ দেন সামাজিক বাধা বিপত্তি এবং কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে। সাধারণত ছাত্রদের মিটিং এর সিদ্ধান্ত গুলো দু'এক জন ছাত্রের মাধ্যমে ছাত্রীদের কাছে পৌছে দেয়া হত। ছাত্রীরা সেই মোতাবেক কাজ করতেন।[৭৪]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের লিফলেট বিলি, নারী জমায়েত, নারীদের মধ্যে সঠিক বক্তব্য পৌছানোর কাজ করেন হালিমা, হামিদা খাতুন, নূর জাহান মোর্শেদ, আফসারী খানম, নিবেদিতা নাগ, রানু মুখার্জী . প্রতিভা মুৎসুদ্দী সহ আরো অনেকে।[৭৫]

৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং ধর্মঘটের পর ছাত্ররা মিছিল সহকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এর পর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সেখানে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পল্টন ময়দানে নাজিমউদ্দীনের বক্তৃতার বিরোধিতা করে ১৯৪৮ এর চুক্তি বাস্তবায়নের দাবী জানানো হয়। ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ববাংলা গণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দেশব্যাপী সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা সমাপ্ত হবার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শ্লোগান সহকারে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন হয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর , পাটুয়াটুলী, আর্মানিটোলা নাজিমউদ্দীন রোড অতিক্রম করে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।[৭৬] এ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রী অংশ নেয়। মূল মিছিলটি সচিবালয়ের কাছে পৌছালে ছাত্রীরা বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে আসে।[৭৭]

৪ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা ও মিছিলে অংশ নেন ইডেন কলেজের আই.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী শরিফা খাতুন। তাঁর সাথে ছিলেন একই বর্ষের ছাত্রী হেনা, রহিমা এবং দ্বিতীয় বর্ষের লুৎফা ও আমির সহ অন্যরা।[৭৮]

কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরা সে দিন বিদ্যালয়ের সামনে পিকেটিং করেন। উচুঁ ক্লাসের ছাত্রীরা, নীচু ক্লাসের মেয়েদের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে স্কুলের সাধারণ কর্মকান্ড বন্ধ করে দেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জুলেখা হক। কামরুন্নেসা স্কুল ও মুসলিম গার্লস স্কুলের মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সভাতে উপস্থিত হন।[৭৯]

৪ ফেব্রুয়ারী কেবল ঢাকার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট আহবান করা হয়েছিল কিন্তু দেখা যায় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজের ছাত্ররা ঐ কর্মসূচী পালন করেন। যশোর, নোয়াখালী, রাজশাহীতেও সভা এবং শোভা যাত্রা হয়। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ফেনী, কুমিল্লাতে ঢাকার অনুরূপ বিভোক্ষ অনুষ্ঠিত হয়।[৮০]

৪ ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে পতাকা দিবস ও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে কাগজে ছাপানো ছোট ছোট পাকিস্তানী পতাকা তৈরী করে তাতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা হয়। ঐ দিন রাজশাহীর সমস্ত স্কুল কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রদের একটি মিছিল ভুবনমোহন পার্কে শেষ হয়। ছাত্র সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা করেন ছাত্রী মোহসেনা বেগম। তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন।[৮১]

রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। মিছিল,সভা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন বেগম জাহান আরা, (তিনি তখন রাজশাহী কলেজের ছাত্রী) ,বেগম মনোয়ারা , মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী মোহসোনা বেগম, কলেজ ছাত্রী শামসুন্নাহার ও হাসনা বেগম।[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

বেগম জাহানারা রাজশাহীর ভুবনমোহন পার্কে ' বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা' গান গেয়ে সকলকে আলোড়িত করেন। এ ছাড়া ফিরোজা বেগম, হাফিজা বেগম, টুকু, হাসিনা বেগম, রওশন আরা, খুরশীদা বানু, ফুলু, নুর মহল খাতুন, হাজেরা, আবেদা, মিনতি, স্নেহ, গীতা, হালিমা, মনসুরা, নিরুপমা, সারা খন্দকার, বীণাপানি বসাক, আরজু, জুলেখা বেগম, আখতার বানু ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।[৮৩]

৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে নীলফামারীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, ছাত্র মিছিল ও ছাত্র সভা পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। সে দিন ধর্মঘটী ছাত্রীদের নেত্রী ছিলেন হালিমা খাতুন, জাহেদা বেগম, জাকিয়া সুলতানা, সালমা বেগম, জেবুন্নেসা, রেজিনা বানূ প্রমূখ ছাত্রী বৃন্দ। ধর্মঘট শেষে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ শেষে টাউন ক্লাব প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে সভা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান।[৮৪]

৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) বিকেলেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি সভায় একুশে ফেব্রুয়ারী প্রদেশ ব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাতে গৃহীত হয় তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। এই সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম সহ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অনেক সদস্য উপস্থিত থাকেন এবং ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।[৮৫]

১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস পালন করা হয় অর্থ সংগ্রহের জন্য। ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা পতাকা বিক্রি করে চাঁদা সংগ্রহ করে।[৮৬] এ সময় নাদেরা বেগম এবং শাফিয়া খাতুনকে পোষ্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়।[৮৭]তাঁরা নুরুন্নাহার কবীর, সারা তৈফুর, কায়সার সিদ্দিকী সহ অন্যান্য ছাত্রীদের সহযোগিতায় এই দায়িত্ব পালন করেন । ব্যাজ বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা হোষ্টেলের ছাত্রীরা। ব্যাজ বিক্রির কাজ করেন কায়সার সিদ্দিকী ।[৮৮]

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী কর্মসূচী পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। নারীদের মধ্যে ও এ উপলক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করার কাজ করেন লায়লা সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

'ওমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের' ভাইস প্রেসিডেন্ট শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর (অনার্স, ইসঃ ইতিহাসের ছাত্রী) শামসুন্নাহার (অনার্স এর ছাত্রী, ইঃ ইতিহাস, ২য় বর্ষ), রওশন আরা বাচ্চু (অনার্স,দর্শন বিভাগ) ও সুফিয়া আহমদ (অনার্স , ২য় বর্ষ, ইসঃ ইতিহাস) প্রমূখ। ছাত্রীদের সংগঠিত করার ব্যাপারে শাফিয়া খাতুনই প্রধান ভূমিকা রেখেছেন।[৮৯]

২০ ফেব্রুয়ারী সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ২১ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটে যোগদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হওয়ার জন্য প্রচার কাজ চালান। মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ সম্পর্কে শাফিয়া খাতুন বলেন ঃ

> 'ওমেনস্ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের' ভিপি হিসেবে আমি শুধু ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্বই পালন করতাম। ছাত্রীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে মেয়েদের স্কুলে পাঠাই । তখন ছাত্রীদের মাঝে ও এমন উৎসাহ লক্ষ্য করেছি যে তা কোন দিন ভুলবার নয়। পায়ে হেঁটে মেয়েরা বাংলাবাজার গালর্স স্কুল ও কামরুন্নেসা গালর্স স্কুলে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারীর আমতলার সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করেছে। একুশের আন্দোলনকে সফল করার পেছনে এসব তৎপরতা অসীম অবদান রেখেছে।[৯০]

এ সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী শামসুন্নাহার আহসান বলেন ঃ

> একুশে ফেব্রুয়ারীকে সফল করে তোলার জন্য আমরা গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পরদিন আমতলার মিটিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করি। এসব তৎপরতার প্রতি উৎসাহ জনক সাড়া পাওয়া যায়।[৯১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ মত দায়িত্ব পালন করেন স্কুলের ছাত্রীরা ও। ২০ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেয়া লিফলেট কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীদের মাঝে বিলি করেন জুলেখা হক (ছাত্রী)। এ কাজ শেষ করার পর তাঁরা পরের দিনের কর্মসূচী নিয়ে একটা সভা করেন। [৯২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দেয়া প্রচার প্রত্র বিলি, পোষ্টার লাগানো এবং স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেন ইডেন কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীরাও। এ ক্ষেত্রে ইডেনের ছাত্র সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা রওশন আরা বেগম (বি.এ ক্লাসের ছাত্রী), মনু (বি.এ), দুলু (বি.এ), লুৎফুন্নেসা বেগম, আমিরুন্নেসা বেগম, সুফিয়া করিম, ফরিদা বারী , বানু, বীথি এবং আই.এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী শরিফা খাতুন সহ অনেকে ভূমিকা রাখেন।[৯৩]

২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫ টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক বসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে। বৈঠকের কাজ চলাকালীন সময়েই মাইক যোগে ঘোষণা করা হয় যে ২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৪৪ ধারা জারীর ফলে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে একটি আমুল পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সংগ্রাম কমিটির ঐদিনের বৈঠক ১৪৪ ধারার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে কি হবে না এই নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সদস্যই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাশিম (অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিমলীগ প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক), শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিমলীগ), মোহাম্মদ তোয়াহা (যুবলীগ) কাজী গোলাম মাহবুব প্রমূখ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে এদের মূল যুক্তি ছিল এই যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে দেশে বিশৃংঙ্খলা ও সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, ফলে সাধারণ নির্বাচন বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সরকার ১৯৪৭ সালের পর থেকে কোন সাধারণ নির্বাচন দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন যদি আরো পিছিয়ে যায় বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকে তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হবে। এ ছাড়া সারাদেশে কোন সু-সংগঠিত রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কোন সাংগঠনিক কাঠামো প্রদেশ ব্যাপী গড়ে না ওঠায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অসম্ভাব্যতার দিকটি ও তাঁরা যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অলি আহাদ (যুবলীগ)এবং আব্দুল মতিন (আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ) বলেন যে, ১৪৪ ধারা জারী করে সরকার যে, পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে সরকারী নিষেধাজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করলে ভাষা আন্দোলনের কোন অগ্রগতি তো হবে না, উপরন্তু তা ধ্বংস হবে।[৯৪]

তর্ক-বির্তকের পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার এবং পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারী কর্মসূচী বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। আব্দুল মতিন ও অলি আাহাদ প্রবল আপত্তি জানালে সেটা ভোটে প্রদান করা হয়।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক চলাকালে সলিমুল্লাহ হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদেরও একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের কথা সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তই জানিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র ও জন সাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্ম পরিষদের এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে স্বাভাবিক ভাবে এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হবে।[৯৬]

ঐদিন মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছাত্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী পুকুরের পূর্ব পাড়ের সিঁড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হন। এখানে উপস্থিত ছিলেন গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, মোহাম্মদ সুলতান, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মোমিন, এম আর আখতার মুকুল, কমরুদ্দীন শহুদ, এস.এ. বারী এটি, আনোয়ারুল হক খান প্রভৃতি। এ সভাতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। পরদিন সকালের ছাত্র সভায় গাজীউল হককে সভাপতি করার চেষ্টা করবেন এই মর্মে ও একটি সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেন।[৯৭]

২১ ফেব্রুয়ারী খুব ভোর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়, মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত করার এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খান, সারা তৈফুর, কায়সার সিদ্দিকী, হালিমা খাতুন প্রভৃতি।[৯৮]

ইডেন কলেজ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারীর মিছিলে অনেক ছাত্রী অংশ নেয়। শরীফা খাতুন, হেনা, রওশন জাহান হোসেন, সুফিয়া করিম, শরিফা খাতুন সহ অনেকে । কামরুন্নেসা স্কুল থেকে যেসব ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে

Dhaka University Institutional Repository

সমবেত হয় তাদের মধ্যে ছিলেন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী রওশন আহমদ দোলন, জুলেখা হক, কাজী খালেদা খাতুন। কাজী খালেদা খাতুন ও জুলেখা হকের নেতৃত্বেই ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। [৯৯]

ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন কামরুন্নেসা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী আমেনা আহমদ। আমেনা আহমদও ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে অংশ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব পালন করেন। [১০০]

বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয় এবং মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ মিছিলে অংশ নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২০/২৫ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়।[১০১]

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ৮টা থেকেই বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করেন। সকাল ১০ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং এরপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়। শামসুল হক ও গোলাম মাহবুব সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা জানালে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কেননা উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[১০২]

১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে কি হবে না তা নিয়ে সভায় বিতর্ক শুরু হয়। সভার সিদ্ধান্তহীনতার এক পর্যায়ে শাফিয়া খাতুন মেয়েদের নিয়ে কমনরুমে চলে যান এবং সেখানে একটা সভা হয়। সেখানে অনেকের মাঝে বক্তৃতা দেন ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদক বি. এ. এর ছাত্রী রওশন আরা দুলু। স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন কাজী খালেদা খাতুন।[১০৩]

পরে ছাত্রদের অনুরোধে আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে ছাত্রীরা সভাস্থলে ফিরে আসেন। এদিকে আব্দুল মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে,আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গেলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতেই হবে। সভা ঘন্টা খানেক চলার পর অবশেষে গাজীউল হক সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সভার পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হবার পর ছাত্র ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

শ্লোগান দিতে থাকে। এসময় আব্দুস সামাদ আজাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ১০ জন করে এক এক দল বের হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সভা শেষ হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে সমবেত হতে শুরু করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ছাত্রদের প্রথম দল বের হয়। ছাত্রদের দুটি দল গেটের বাইরে বের হবার সাথে সাথে সশস্ত্র পুলিশ তাদের ট্রাকে তুলে নেয়। তৃতীয় দলে ছিলেন ছাত্রীরা। তাদের ধারণা ছিল পুলিশ হয়ত ছাত্রীদের কোন বাধা দেবেনা। এ ধারণা নিয়েই ছাত্রীদের প্রথম দলটি রাস্তায় বের হয়। অর্থাৎ ছাত্রীদের ব্যাচই প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে যায়। ছাত্রীদের প্রথম দলে ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, সুফিয়া ইব্রাহীম (আহমদ), হালিমা খাতুন।[১০৪] স্কুল ছাত্রী পারুল, সেতারা, নুরী ও জুলেখা হক।[১০৫]

মেয়েদের দ্বিতীয় দলে ছিলেন সারা তৈফুর সহ অন্যরা। এদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু কিছুদুর যাবার পর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে ও লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জ করার জন্য পুলিশ মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের উপরও কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে ও লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররাও তখন পুলিশের দিকে ইট পাঠকেল ছুড়তে থাকে । কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠিচার্জ এর কারণে ছাত্র ছাত্রীরা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে। এতে অনেকে আহত হয়। ছেলেদের সাথে লাঠিচার্জে আহত হন রওশন আরা বাচ্চু। কাটাতার ডিঙোতে গিয়ে পায়ে আঘাত পান সারা তৈফুর, আহত হন সুফিয়া ইব্রাহিম ও বোরখা শামসুন।[১০৬]

ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ চলাকালে বেলা ৩ টার দিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আকস্মিকভাবে পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল গেটের সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার প্রমূখ নিহত হন। অনেকে আহত হন, অনেকে বন্দী হন।[১০৭] পুলিশ ছাত্রদের মত ট্রাকে করে ছাত্রীদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঐদিন গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা বারী, ফিরোজা বেগম, জহরত আরা রাহেলা, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, জোহরা তারা প্রমুখ।[১০৮]

সরকারী কর্মচারী হয়েও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন ইডেন কলেজের লাইব্রেরীর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা গুলে ফেরদৌস।[১০৯] এ ছাড়া ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন লায়লা সামাদ, সোফিয়া করিম, জাহানারা লাইজু প্রমুখ ছাত্রীবৃন্দ।[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে যে সব ছাত্রীদের মিছিলে নেয়া হয়নি তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ী চলে যাবার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও মিছিল চলে যাবার পর তারা নিজেরা আমতলায় সভা করে এবং রাষ্ট্রভাষা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথ নেয়। এদের মধ্যে ছিলেন কামরুন্নাহার স্কুলের ছাত্রী কাজী খালেদা, পুতুল, মন্তু।[১১১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারী ছিল পূর্ব বাংলা বিধান পরিষদের অধিবেশন। অধিবেশনের জন্য সভার সদস্যরা যখন পরিষদ ভবনে উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। গুলির আওয়াজ এবং ছাত্রদের চিৎকার শুনে মওলানা আব্দুর রশীদ তর্ক বাগীশ স্পীকারকে অধিবেশন স্থগিত রাখার আহবান জানান যাতে সবাই বাইরে যেতে পারেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমিনকে বলেন যে তাঁর উচিৎ তৎক্ষনাৎ মেডিকেল হাসপাতাল এবং পরিস্থিতি পরিদর্শন করে তা সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেওয়া। কিন্তু নুরুল আমিন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সে দিনের মত অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী করেন। নুরুল আমিন তাতেও সম্মত না হলে পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করে মওলানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদ ভবন পরিত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন। [১১২]

২২ ফেব্রুয়ারী মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মাইকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারীতে নিহত ছাত্রদের লাশ তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে না দিয়ে ঐ রাতেই পুলিশ লাশ ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশী তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।[১১৩]

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ববাংলায় সর্বত্র ছাত্রধর্মঘট, জনসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন স্থানে হরতাল পালিত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে হরতাল পালিত হয়। ঢাকার ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদ সেখানে পৌছালে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এবং ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটে বাস ও ট্যাক্সি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষার দাবীতে চট্টগ্রামে ও হরতাল পালিত হয়। লালদীঘি ময়দানে মিছিলসহ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় গুলি চালনার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মেয়েদের মিছিল সংগঠিত করেন হালিমা খাতুন।[১১৪] এই মিছিলে অংশ নেন খাস্তগীর স্কুলের ছাত্রী জওশন আরা রহমান। এছাড়া মিছিলে অংশ নেন চিত্রা বিশ্বাস সহ অনেক প্রগতিশীল নারী।[১১৫]

ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে শেরপুরে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল হয়। এতে অংশ নেন জাহানারা বেগম।[১১৬]

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' মহাকুমা শাখা টাঙ্গাইলে ও ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ পালনের প্রস্তুতি নেয়। মেয়েদের মধ্যে কে. এন. সাকেরের মেয়ে জ্যোৎস্না, ঝর্ণা এবং মাহেড়ার সৈয়দ ডাক্তারের মেয়ে ছালেহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারী মিছিলে অংশ নেন কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী ছালেহাখাতুন।[১১৭] কুমুদিনী কলেজের অপর এক ছাত্রী নাজমী আরা বিন্দুবাসিনী স্কুলের মেয়েদের নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। এজন্য শাস্তি স্বরূপ তাঁকে তিন টাকা জরিমানাও দিতে হয়।[১১৮]

২১ ফেব্রুয়ারী দিনাজপুরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বর্তমান দিনাজপুর মেডিকেল ভবন থেকে মিছিল শুরু হয়ে তৎকালীন হাই মাদ্রাসা মাঠে শেষ হয়। ছাত্রদের পাশাপাশি যে সব ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন হামিদা হক খুকুমনি, কচিমনি, আমিনা দানেশ, রওশন আরা ও জান্নাতুন আরা প্রমুখ।[১১৯]

পাবনায় রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সমাবেশ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের সংবাদে ছাত্রনেতারা এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। ছাত্রীরাও তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। যে সব ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ।[১২০]

২১ ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহে হরতাল পালিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল বন্ধ রেখে মিছিলে অংশ নেয়। অনেক মেয়ে মিছিলে অংশ নেন। কর্মসূচীতে নেতৃস্থানীয় ছিলেন স্নিগ্ধা (ভারত প্রবাসী), কাঞ্চন নগর গ্রামের দুই সহোদরা আনোয়ারা ও জাহানারা খাতুন, প্রধান শিক্ষক মুরারী মোহন ঘোষালের কন্যা পুতুল, ছন্দা প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[১২১]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ময়মনসিংহের ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হরতাল, সভা, সমাবেশের কর্মসূচী পালন করেন। ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের সংবাদে আবুল মনসুরের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী হালিমা খাতুন মেয়েদের সংগঠিত করে মেইন গেটের তালা ভেঙ্গে মিছিলে অংশ নেন। তাঁর হাতে কালো পতাকা থাকায় তাঁর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয় এবং তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম রাত দশটায় তাকে জোর করে হোস্টেল থেকে বের করে দেন।[১২২]

ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে জামালপুরে ও ছাত্রদের সভা হয়। সেই সভায় মুখস্থ করা বক্তৃতা দিয়ে প্রতিবাদে অংশ নেন দশ বছরের মতিয়া চৌধুরী (সাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী)।[১২৩]

২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) সকালে একুশের শহীদদের গায়েবী জানাজায় ছাত্রসহ ঢাকা শহরের হাজার হাজার মানুষ অংশ নেয়। জানাজা শেষে বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি গনি রোডের কাছে পৌছালে পুলিশ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়া সত্বেও মিছিল সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। শহরের দোকানপাট, যানবাহন সম্পুর্ণ বন্ধ থাকে। সর্বস্তরের জনতা সেদিন মিছিলে সামিল হয়।[১২৪]

২১ ফেব্রুয়ারী পুলিশের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন ২২ ফেব্রুয়ারী বিধান সভার অধিবেশনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি বলেন ঃ

"ঘটনা দেখে মনে হয় আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই নাই। তার প্রমাণ এই পুলিশী জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই- ছেলেদের কথা আর নাই বললাম। যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানেনা সে জাতির ধ্বংস অপরিহার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়..... মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে..... পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। আমি তাদের দুজনার নাম দিচ্ছি। একজন হল ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম। আর একজন হল মিস রওশন আরা ৩য় বর্ষ বি.এ। মেয়েদের মোট আহতের সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রিসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারছিনা। আমি Ministry কে সাবধান করে দিতে চাই যে যদি দেশের মঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

চান তাহলে এই পন্থা ত্যাগ করুন। পুলিশ এবং মিলিটারী দিয়ে দেশের জনগণের ন্যায্য দাবী দমিয়ে রাখা যায় না।... Wounded – এর সংখ্যার মধ্যে দেখা যায় যে ছাত্রদের চেয়ে Public Wounded হয়েছে বেশী। এটা শুধু ছাত্রদের দাবী নয়, এটা গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের অন্তরের কথা।[১২৫]

আনোয়ারা খাতুনের এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারী কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে মহিলাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ সভায় বেগম সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মুরশিদ (আইন পরিষদ সদস্য), দৌলতুন্নেসা খাতুন (আইন পরিষদ সদস্য), সাজেদা খাতুন প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাজেদা খাতুন (সন্‌জীদা খাতুনের মা)। সন্‌জীদা খাতুন ও (ইডেন কলেজ আই.এ'র ছাত্রী) এই প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় মহিলারা একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[১২৬]

২২ ফেব্রুয়ারী গায়েবী জানাজার পর ঢাকা শহরের পরিস্থিতির উপর কার ও কোন সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থাকেনি। জনতার উপর বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলি বর্ষণের ঘটনায় আট বছর বয়স্ক একটি বালক সহ পাঁচ জন নিহত হয়। আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশেরও অধিক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যাচার করার জন্য বিক্ষুব্ধ জনতা মর্নিং নিউজের ছাপাখানা জুবিলী প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয়।[১২৭]

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর গুলি বর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার মতো পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকার মিছিলে গুলি বর্ষণের সংবাদ খুলনার মানুষ জানতে পারে পরের দিন। এই খবরে খুলনার ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা অর্জন করে। খুলনার ছাত্রী সমাজ ও এর প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেন। এ সম্পর্কে খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের তৎকালীন ছাত্রী নেত্রী রোকেয়া মাহবুব শিরি বলেন, 'ঢাকার ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এ সময় মেয়েদের বিশাল মিছিল হয়, মিছিলে শ্লোগান দেন মাজেদা আলী (সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর স্ত্রী)। খুলনার

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে আরো যে সব নারী অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন, লুৎফুন্নাহার, ফাতেমা চৌধূরী, সাজেদা হেলেন, কৃষ্ণা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২৮]

২২ ফেব্রুয়ারী নড়াইলে একটি মিছিল বের হয় যা রূপগঞ্জ কলেজ থেকে শুরু হয়। এ মিছিলে অংশ নেন রিজিয়া বেগম, এবং স্কুল ছাত্রী বেবি, রুবি, শেফালী ও বুলবুল প্রমুখ মেয়েরা।[১২৯]

বরিশালে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে যারা সচল রেখেছিলেন জগদীশ সারস্বত বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রানী ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। এ সময় তিনি সকল সভা মিছিল, ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ সহ সব ধরণের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন। বরিশালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ মিছিলে ও তিনি অংশ নেন।[১৩০]

ঢাকার ছাত্র হত্যার সংবাদ বরিশালে পৌছালে ২২ ফেব্রুয়ারী অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে ভোর হতে জনতার স্রোত নামে। মিসেস হামিদউদ্দিনের (সাবেক আওয়ামীলীগ এম. পি. এ.) নেতৃত্বে প্রথম মহিলাদের শোভাযাত্রা বের হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন নারীরা পরে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। বরিশালের অন্যান্য ভাষা সৈনিক হলেন হোসনে আরা নিরু, মঞ্জুশ্রী, মাহেনুর বেগম, চারুবালা গাঙ্গুলী ও উষারাণী চক্রবর্তী প্রমুখ।[১৩১]

ঝালকাঠিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোতে সংগ্রামী চেতনার অগ্রবাহিনী। ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার ছাত্র হত্যার খবর শুনে ঝালকাঠি সরকারী বালক বিদ্যালয় থেকে মিছিল বের হয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে পৌছালে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী লাইলী বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেয়।[১৩২]

২৩ ফেব্রুয়ারী ও ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ২৩ তারিখের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ স্মৃতিসৌধ বা শহীদ মিনার নির্মাণ। যেখানে গুলির আঘাতে প্রথম ছাত্র শহীদ হন সেখানে শহীদ মিনার নির্মিত হয়। শহীদ শফিকুর রহমানের পিতা এটি উদ্বোধন করেন। পরে আনুষ্ঠানিকতার জন্য দৈনিক 'আজাদ', সম্পাদক আব্দুল কালাম শামসুদ্দিন শহীদ মিনার দ্বিতীয়বারের মত উদ্বোধন করেন।[১৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের একটি সভা হয়। এই সভায় শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচরের প্রতিবাদ ও নিন্দা এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়।[১৩৪]

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ছাত্রাবাস চামেলী হাউসের ছাত্রীরা এই সময় পার্শ্ববর্তী আজিমপুর কলোনী অঞ্চলে গিয়ে কিছু প্রচার কাজ করেন এবং সেই সঙ্গে তহবিল সংগ্রহ ও করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আজিমপুর কলোনীর মেয়েরা একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেন এবং কমলাপুর ও অন্যান্য দুর এলাকা থেকে এসে মেয়েরা তাতে যোগদান করেন। কয়েক হাজার মহিলা এই সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[১৩৫]

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ছাত্রাবাসের যে সব ছাত্রী ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তহবিল সংগ্রহের কাজ করেন তারা হলেন মোসলেমা খাতুন, সুফিয়া খান, সারা তৈফুর, শামসুন্নাহার, কায়সার সিদ্দিকী প্রমুখ ছাত্রীবৃন্দ। এরাঁ আজিমপুর, শান্তিনগর, মালিবাগ এবং আশে পাশের পাড়া মহল্লায়, অফিসে গিয়ে তহবিল সংগ্রহের কাজ করেছেন। আর কারাগারে অনশনরত ছাত্রদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন ইডেন কলেজের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক গুলে ফেরদৌস। তার সহযোগী ছিলেন মনু, দুলু, মতি, জেবা, মমতাজ।[১৩৬]

২৩ ফেব্রুয়ারী সিলেটে নারী সমাজের প্রতিবাদ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নাইয়ার উদ্দিন আহমদ। বক্তৃতা করেন যোবেদা খাতুন চৌধুরী সহ অন্য নেত্রীরা। বিকেলে মহিলাদের আর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় জিন্নাহ হলে।[১৩৭]

কুষ্টিয়ায় ২৩ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। ছাত্রীরা ও আন্দোলনে অংশ নেন। এক্ষেত্রে কুষ্টিয়া ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অগ্রণী ছিলেন। শাহিদা খাতুনের সভানেতৃত্বে এক শোক সভায় সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা এবং শহীদ ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।[১৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

২৩ ফেব্রুয়ারী ভি.জে. গার্লস স্কুলসহ চুয়াডাঙ্গার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ছাত্রীদের মধ্যে বেলা, পান্না, পাখী মিছিলের নেতৃত্ব দেন।[১৩৯]

ঢাকায় ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার পর রংপুরে স্থানীয় জেলা বোর্ডে মাসুদা চৌধুরী ও নিলুফার আহমেদ ডলি মহিলাদের এক শোকসভা আহ্বান করেন। তারা মিটিং মিছিল করেন। এসময় নিলুফার আহমেদ ডলিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই গণজমায়েত সংগঠনে নিলুফার আহমেদ ডলির মা আফতাবুন নাহার সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলনের সময় রংপুরে যে কজন নারী নেত্রী সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে মালেকা আশরাফ একজন।[১৪০]

সাতক্ষীরাতে ঢাকার ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সাতক্ষীরা স্কুলের ছাত্রী রসুল পুরের মাহবুবুর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা গুলারা বেগমের নেতৃত্বে স্কুল ছাত্রীরা কালো ব্যাচ ধারণ করে মিছিল বের করে। গুড়পুকুর বটতলায় বাংলাভাষার পক্ষে বক্তৃতা করেন গুলেরা বেগম।[১৪১]

১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পুরানা পল্টনে মহিলাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে। নূরজাহান মোর্শেদ ও লেখিকা সাংবাদিক লায়লা সামাদ ভাষা আন্দোলনে শহীদদের আরুব্ধ কাজ করে যাবার প্রতিজ্ঞা ও শোক জানিয়ে ভাষণ দেন। লায়লা সামাদ এ সময় দৈনিক 'সংবাদ' এর স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ১৪৪ ধারা বাতিলসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকার এর দাবী সভায় জানানো হয়, নুরুল আমিন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবী সহ আরও কিছু প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।[১৪২]

নারায়ণগঞ্জ ছিল ভাষা আন্দোলনের একটি শক্তিশালী এলাকা। এখানে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। মহিলাদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মর্গান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। ভাষা আন্দোলনের দিন গুলিতে প্রতিটি সভা সমাবেশ ও মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। যার কারণে ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) মিছিলে নেতৃত্ব দেবার জন্য গ্রেফতার হন মমতাজ বেগম। এর প্রতিবাদে মর্গানস্কুলের ছাত্রীরা ও ক্লাশ বর্জন করে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং মমতাজ বেগমের মুক্তি দাবী করে।[১৪৩]

এছাড়া যে সব নারী ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তারমধ্যে ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠা মহিলা সমিতির সম্পাদিকা নিবেদিতা নাগ অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' থাকা অবস্থায়ও ভাষা আন্দোলনের কাজ করেন। সিলেটে প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্থ, বদরুন্নেসা আহমদ, বরিশালে পুষ্পগুহ, ঢাকায় মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী নেপিশা বেগম, কুর্মিটোলা স্কুলের ছাত্রী সাহারা খাতুন সহ আরো অনেকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[১৪৪]

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সব নারীকে জীবনে বড় ধরণের মাশুল দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণগঞ্জের মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কারারুদ্ধ মমতাজ বেগমের কাছে সরকার বন্ড সই করে মুক্তির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সংগ্রামী চেতনায় ভাস্বর এই তেজোদীপ্ত নারী আপোসের হীন প্রস্তাবে রাজী না হবার কারণে তাঁর স্বামী তাকে তালাক দেন। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণের অপরাধে মমতাজ বেগম তাঁর সংসার হারান। গ্রেফতার হন নারায়ণগঞ্জের ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও বেলু। সিলেটের সালেহা বেগমকে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তখন সেখানকার ডি.সি ডি.কে. পাওয়ার এর আদেশক্রমে ৩ বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়। ফলে তাঁর জীবনে আর পড়ালেখা হয়নি। খুলনায় স্কুলছাত্রী হামিদা খাতুন নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টায় লাঞ্ছিত হয়েছেন।[১৪৫]

১৯৫১ সালে বরিশালে ভাষার দাবীতে মিছিলে অংশগ্রহণের অপরাধে গ্রেফতার হন চারুবালা গাঙ্গুলী। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দুইবছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হন নাদেরা বেগম।[১৪৬]

১৯৪৮ সালে ১১ মার্চের মিছিলে নেতৃত্ব দেবার কারণে সরকারের রুদ্ররোষে পড়েন যশোরের হামিদা রহমান। হুলিয়া মাথায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত কুচবিহারে আত্মগোপন করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে স্মারক লিপি পেশ করার অপরাধে সিলেট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া আলীকে অন্যত্র বদলী করা হয়।[১৪৭]

সরকারী নিপীড়নে ভিতু না হয়ে ভাষার দাবী অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নারীরা যুক্ত থেকেছেন ভাষা আন্দোলনের সাথে। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ইডেন কলেজের ছাত্রীরা শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্দ্যোগ নিলে কলেজের অধ্যক্ষা তাতে বাধা দেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীদের প্রথম প্রভাতফেরী বের হয়। এ প্রভাতফেরীর প্রধান সংগঠক ছিলেন লায়লা সামাদ। ছাত্রীরা ও এ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। ঢাকার বাইরে মফঃস্বল শহরগুলোতে একই রকম কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

নেন নারীরা।[১৪৮] একুশের প্রথম উদ্‌যাপন ১৯৫৩ থেকেই প্রভাতফেরীর স্বার্থক প্রবর্তন হয়।[১৪৯] এবং একে একটি স্থায়ী ও আবশ্যিক কার্য হিসেবে দাঁড় করাতে নারীদের অবদান সমধিক।

১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে এ আন্দোলন মূলত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ পর্যায়ে বাঙালীর দাবী ছিল প্রধানত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করা। কিন্তু ১৯৫২ সালে আবার মাতৃভাষার দাবীতে বাঙালী রাজপথে নামতে দ্বিধা করেনি। এ পর্যায়ে আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণী নয় বরং সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে প্রভাব ফেলে। শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতি যে শোষণ ও বৈষম্য তা এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ভাষা আন্দোলন কেবল ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। দেশের প্রতিটি জেলায় ও মহাকুমায় তা ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশ নিয়েছিলেন। সমাজের অনগ্রসরতা, কুসংস্কার প্রভৃতির কারণে তখন নারী শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তাছাড়া সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং রক্ষণশীলতাতো ছিলই, ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কঠোর বিধিনিষেধ। তা সত্বেও ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসহ বিভিন্ন শ্রেণীর পাশাপাশি ছাত্রী ও নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের একাংশ অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। পুরুষের পাশাপাশি তাঁরা মিছিল, প্রতিবাদ, সভা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা ও নানারকম সাংগঠনিক এবং দাপ্তরিক কাজে সমমাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। কোন কোন এলাকায় কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোন কোন স্থানে শিক্ষিকাদের অনেকে সরাসরি ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। কেউ কেউ ছাত্রীদের সংগঠিত করে মিছিল ও সভাতে অংশ নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কোন কোন অঞ্চলে নারীরা সংগ্রাম কমিটিতে যুক্ত থেকে আন্দোলন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন। বিধান পরিষদে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

এঁরা ছাড়া আরও বহু সংখ্যক নারী ছিলেন যারা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশ নিতে না পারলেও পরোক্ষ সহযোগিতার মাধ্যমে আন্দোলনকে সফল করতে সাহায্যে করেছেন। ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক নেতা

Dhaka University Institutional Repository

কর্মীদের নিজগৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। গোপন বৈঠক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা সহ পুলিশের দৃষ্টি থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল নারী আন্দোলনকারীদের উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ সাহায্য করতে নারীরা কখন ও কার্পণ্য করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাবাজার মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় সহ সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজের যে ছাত্রীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তাঁদের নাম হয়ত ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারেনি, কিন্তু এরাঁ প্রত্যেকেই ভাষা আন্দোলনের সেনানী, মহান ভাষা সৈনিক। বায়ান্নর একুশে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ক'জন হাতে গুনে বের করা যায়, তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে মেলা-মেশার তো কোন সুযোগ ছিলই না, সেখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ডাকে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ অগ্রণী করলেন সেই মেয়েদের। তৎকালীন সময়ের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। ভাষা আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২২-৩৮।

২. আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, (ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯০), পৃ. ৩৪-৩৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

৪. আব্দুল হক, "ভাষা আন্দোলনের পটভূমি" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, সপ্তদশ বর্ষ , চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ- চৈত্র, ১৩৭৯।

৫. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৯।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

৭. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ৪।

৮. বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৬৫।

৯. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬-২৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৪২৯।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

১৩. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০-৩১।

১৪. রতনলাল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১-২।

১৫. বদরুদ্দিন উমর, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Morning News, December 7, 1947.

১৭. বদরুদ্দিন উমর, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২।

১৮. রতনলাল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, পৃ. ২।

১৯. বদরুদ্দিন উমর, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, (ঢাকাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯), পৃ. ৩৪-৩৫।

২৩. দৈনিক 'জনকণ্ঠ', ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

২৪. তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, (ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৫।

২৫. 'জনকণ্ঠ', ১৬ ফেব্রুয়ারী,১৯৯৯।

২৬. তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, পৃ. ২৫-২৬।

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩।

২৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

৩০. বশীর আল্ হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ২১১-১২।

৩১. বদরুদ্দিন উমর, পৃ. ৬০।

৩২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫।

৩৩. 'জনকণ্ঠ,' ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

৩৪. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ১৯০-৯২।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. 'জনকণ্ঠ', ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।

৩৭. 'জনকণ্ঠ', ১৯-২-১৯৯৯।

৩৮. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭০।

৩৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৭।

৪০. বদরুদ্দিন উমর, পৃ. ৭০-৭১।

৪১. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৫।

৪২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯), পৃ. ৬১।

৪৩. 'জনকণ্ঠ', ১৯-০২-১৯৯৯।

৪৪. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৬।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

৪৮. East Bengal Assembly Proceedings, 15 March, 1948. Vol.1. No. 1.

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ৮০।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

৫২. বশীর আল্ হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ২৪৭-৫০।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।

৫৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৩।

৫৫. দৈনিক 'যুগান্তর', ২-৪-১৯৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. বশীর আল্ হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ২৫৮।

৫৭. বদরুদ্দিন উমর *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৯।

৫৮. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃঃ ৩৫।

৫৯. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৪৫-৪৬।

৬০. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ১৩-১৪।

৬১. বদরুদ্দিন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৩য় খন্ড, (ঢাকাঃ বইঘর, ১৯৮৫), পৃ. ১২৯-৩০।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩৯।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-৪২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-১৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২১।

৬৬. The Pakistan Observer, 30. 1. 1952; The Morning News, 31. 1.1952.

৬৭. দৈনিক আজাদ, ১.২.১৯৫২।

৬৮. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৮।

৬৯. 'জনকণ্ঠ' ১৬-২-১৯৯৯।

৭০. প্রাগুক্ত।

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩।

৭৩. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা* (ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭), পৃ. ৪।

৭৪. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৬-৩৭।

৭৬. দৈনিক আজাদ, ১-২-১৯৫২।

৭৭. বশীর আল্ হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ. ২৮২।

৭৮. তুষার আবদুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষা কন্যা*, পৃ. ২২।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৮০. বশীর আল হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-৮৬।

৮১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ১২৬।

৮২. মুহম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১০, ২৪ ও ৩১।

৮৩. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৮৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *একুশের ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), পৃ. ২২৩।

৮৬. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৯।

৮৭. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬৬।

৮৮. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ৪, ৩৩।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৯০. ঢাকা ডাইজেষ্ট, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১৮।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৯২. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ৫২।

৯৩. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২৩।

৯৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. বদরুদ্দিন উমর, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৭৬।

৯৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ২৩৩-৩৪।

৯৭. বদরুদ্দিন উমর, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৮০।

৯৮. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ১৬-১৭।

৯৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২৪।

১০০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৬।

১০১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, পৃ. ২৪।

১০২. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, (ঢাকাঃ বর্ণ প্রকাশ, গ্রন্থে প্রকাশ কাল নেই), পৃ. ১৫২-৫৩।

১০৩. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ৫৩।

১০৪. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ, ৩১৯।

১০৫. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১০৬. প্রাগুক্ত।

১০৭. সালাউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ৪৫।

১০৮. দৈনিক 'জনকণ্ঠ', ১৬-২-১৯৯৯।

১০৯. তুষার আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৩।

১১০. 'জনকণ্ঠ', ১৬-২-১৯৯৯।

১১১. তুষার আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১১২. বদরুদ্দিন উমর, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ২০৫-৮।

১১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ৮২।

১১৫. 'জনকণ্ঠ', ১৬-২-১৯৯৯।

১১৬. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ৬০।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

১১৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৬।

১১৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

১২২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩১।

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১২৪. বদরুদ্দিন উমর, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ২২০-৩১।

১২৫. 'জনকণ্ঠ' ১৬-২-১৯৯৯; *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ৪০।

১২৬. 'জনকণ্ঠ' ১৬-২-১৯৯৯; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫০।

১২৭. দৈনিক আজাদ, ২৩-২-১৯৫২।

১২৮. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-১৪; *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯।

১২৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

১৩০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৯।

১৩১. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২৫১।

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. মোহাম্মদ হান্নান, *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১।

১৩৪. বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৪৬।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

১৩৬. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষা কন্যা*, পৃ. ১০, ১৬, ১৮, ৩৭, ৩৪ ও ৪৪।

১৩৭. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

১৪০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮ ও ৭৫।

১৪১. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৬।

১৪২. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৩।

১৪৩. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, পৃ. ২৯-৩০।

১৪৪. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, ৬৪ ও ৬৫; ২য় খন্ড, ২০, ৬৩, ৯৪ ও ১১৯।

১৪৫. তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, পৃ. ১৩।

১৪৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ৪ ও ৫২।

১৪৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৫।

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৪৯. রতন লাল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারী

বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিমলীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ এবং পাকিস্তানী শাসকদের ছয় বছরের দমনপীড়ণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ব্যালট যুদ্ধ হল এই নির্বাচন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত সদস্যগণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে কাজ করেন। পাকিস্তান গণ পরিষদ শাসনতন্ত্র রচনার লক্ষ্যে একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে। এই মূলনীতি কমিটি লিয়াকত আলী খানের দিক নির্দেশনা মূলক প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু মূলনীতি রির্পোটে পূর্ব বাংলার মানুষের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটেনি। এই রির্পোটের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় প্রতিবাদ চলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন রির্পোট বাতিল করে দেয়। এবং পাকিস্তান গণ পরিষদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর এবং ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে। কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায়ে শাসনতন্ত্র রচনার প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার জনসংখ্যার আধিক্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি এবং ভাষা প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয়নি। মোটকথা শাসনতন্ত্র রচনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক ভাবে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করা।[১]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকেই পাকিস্তান সংবিধান পরিষদে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ (মুসলিম লীগ নেত্রী ও পাকিস্তান আইন সভার সদস্য) অভিযোগ করেন যে, পূর্ববাংলার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং একে পশ্চিম পাকিস্তানের 'উপনিবেশ' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।[২]

পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার ৫ বছরের মেয়াদ ১৯৫২ সালেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৪৯ এর মার্চে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের এলাকা টাঙ্গাইলের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূন্য আসনগুলির উপ-নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম লীগের জনসমর্থন নেই।[৩] তাছাড়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পরই নির্বাচন হলে মুসলিম লীগ সরকারের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এসব উপলব্ধি করে পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন এক বছর পিছিয়ে দেয়। অবশেষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচন্ড দাবীর মুখে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ ঐ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়।[৪]

পাকিস্তান পূর্ববাংলার জনমানসে যে আশার সঞ্চার করেছিল তা অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির কারণে। সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রণাধীন শাসক এলিট শ্রেণীর গৃহীত বিভিন্ন নীতির ফলে আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সাত বছরে সরকারের বিভিন্ন অফিস আদালতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কর্মকর্তা নিয়োগের তুলনামূলক চিত্রটি উপস্থাপন করলে বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
কেন্দ্রীয় সচিবালয়	৬৯২ জন	৪২ জন
পাকিস্তান শিল্পউন্নয়ন কর্পোরেশন	১৩২ জন	৩ জন
রেডিও পাকিস্তান	৯৮ জন	১৪ জন
সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগ	১৬৪ জন	১৫ জন
রেলওয়ে বিভাগ	১৬৮ জন	১৪ জন
ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ	২৭৯ জন	৫০ জন
কৃষি উন্নয়ন বিভাগ	৩৮ জন	১০ জন
জরিপ বিভাগ	৫৪ জন	২ জন
মেডিকেল কলেজ	০৬	০১
বিশ্ববিদ্যালয়	০৪	০২
মেটার্নিটি হাসপাতাল	১১৮	২২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬২৪৬	২১১৭
ডাক্তার	৮৫০০ জন	৩৩৯৩ জন

[উৎসঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট, শেখ হাফিজুর রহমান, ঢাকা-১৯৯৮, ফেব্রু. পৃ- ৩৪]

এসব অবিচার এবং বৈষম্যর উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে।[৫]

১৯৫৪ সালে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বহুমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগকে নির্বাচনে মোকাবেলা করার জন্য ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সমমনা দলের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং এই অধিবেশনেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেষ্টো অনুমোদিত হয়। যুক্তফ্রন্ট চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়। দল চারটি হল- আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), কৃষক প্রজাপার্টি (১৯৫৩ সালে বাংলার অপর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-এ-ইসলাম এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।[৬]

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তফ্রন্টের প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত ২১দফা কর্মসূচী ও নীতি ছিল নিম্নরূপঃ

নীতি ঃ কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির প্রতিকূল কোন আইন প্রনয়ণ করা হবেনা এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিক গণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চাহারে খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।
৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেংকারীর তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।
৫. পূর্ববঙ্গকে লবন শিল্পে স্বয়ংসম্পুর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবন তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের লবন কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগরী শ্রেণীর গরীব মোহাজনদের আশু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সব ধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবল মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভূক্ত করে সব বিদ্যালয় সমূহকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও সুবিধাজনক ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চবেতন ভোগীদের বেতন কমিয়ে নিম্ন বেতন ভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের মধ্যে একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদ পত্র ও সভা সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

১৬. বর্ধমান হাউসকে আপতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাঁরা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মান করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে একে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মান করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশন মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূণ্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।[৭]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচক মন্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩০৯ স্থির করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী ২৩৭ টি আসন মুসলমানদের জন্য, ৩১ টি সাধারণ আসন নিম্নবর্ণ বহির্ভূত সাধারণ হিন্দুদের জন্য, ২৬টি আসন তফসিলী হিন্দুদের জন্য, ১টি আসন পাকিস্তানী খৃষ্টানদের জন্য এবং ২টি আসন বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত হয়। মুসলমান, সাধারণ হিন্দু এবং তফসিলী হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য যথাক্রমে ৯,১ এবং ২টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৮]

১৯৩৫ সালের ভোটাধিকার সম্পর্কিত গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপরিষদে মহিলাদের ১০ শতাংশ সংরক্ষিত আসনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের দুই সদস্যা জাহানারা শাহনেয়াজ ও শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ গণপরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে ৩ শতাংশ সদস্যার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।[৯]

ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দীদের মুক্তি, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা ইত্যাদি দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের নারী সমাজ উৎসাহ ভরে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগ সরকার নারী সমাজের উপর ক্রমশঃই অবরোধ ও নানা পশ্চাদপদতামূলক আইন কানুন চাপিয়ে দিচ্ছিল। সেই অবস্থার অবসান এবং পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ থেকে পূর্ববাংলাকে মুক্ত করার জন্য নারী সমাজ যুক্তফ্রন্টের প্রচার কাজে সহায়তা করেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, পৌরসভার এলাকায় মহিলাদের ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল। এই ক্ষেত্রে আসন ছিল সংরক্ষিত। ১৯৫৪ সালের ৭ আগষ্ট ঢাকা গেজেটে নির্বাচনী আইন সংশোধন করে এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোন মহিলা যে কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন তাঁকে সেই স্থানের ভোটদাতা হতে হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে আকস্মিকভাবে এই ঘোষণা দেয়ার ফলে নারী সমাজ এই সংশোধিত আইনের প্রতিবাদ জানান। সকল স্তরের মহিলাদের সমস্যা নিয়ে মহিলাদের এক সম্মেলনে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডঃ হালিমা খাতুন, মিসেস সুফিয়া (লিপি) ইশতিয়াক, মরিয়ম খন্দকার, আমেনা বেগম, লায়লা সামাদ, লুৎফুন্নেছা প্রমুখ মহিলা ছিলেন এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা।[১০]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগ 'ইসলাম' কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যাও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। এমনকি তারা জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন নির্বাচনী কর্মসূচী উপস্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রচারে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাকেই জনগণের সামনে তুলে ধরে। এর প্রমান যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত 'জালেম শাহীর ছয় বছর' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রচার পুস্তিকা।[১১]

যুক্তফ্রন্ট এমন কিছু বিষয় জনগণের সামনে নিয়ে আসে যেগুলি পূর্ববাংলার জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। যুক্তফ্রন্টের জন্য এর বিভিন্ন শরীক দলের কর্মীরা ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। সাথে সাথে খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারা, যেমন- মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ জেলা ও মহাকুমা পর্যায়ে বহু জনসভায় বক্তৃতা দেন এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবীর পক্ষে বাঙালী জনমত সৃষ্টি করেন।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় নারীরা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হককে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারণা। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ভিত নড়বড়ে করে দেবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন নারীরা। এই নির্বাচনকে ঘিরে নারীদের মধ্যে স্বতস্ফুর্ততা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অনেক নারীর রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি ঘটে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে।

যুক্তফ্রন্টের সভা-সমিতি ও আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন লায়লা সামাদ। এ সময় মওলানা ভাসানী তাঁকে দিনাজপুরের নির্বাচনী এলাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেন। কিন্তু দিনাজপুর এলাকার ভোটারদের তালিকায় লায়লা সামাদের নাম না থাকায় তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি।[১৩]

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হালিমা খাতুন, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী নূরজাহান মোর্শেদ এর পক্ষে প্রচারের কাজ করেন। এবং তাঁর পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন।[১৪] নূরজাহান মোর্শেদের পক্ষে প্রচারণা চালান মরিয়ম বেগম। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন এবং নির্বাচনী প্রচারণাসহ দলের অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।[১৫]

যুক্তফ্রন্ট পদ প্রার্থী বেগম বদরুন্নেসার নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করেন খুলনায় ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রোকেয়া মাহবুব। প্রচারণার কাজে সরাসরি অংশ নেন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। তাঁর দৃঢ়তা, কর্মোদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বেগম বদরুন্নেসাকে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রার্থী মনোনয়ন করেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা কুষ্টিয়া-যশোরে তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচারণা চালান।[১৬]

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী তোফাতুন্নেসার পক্ষে কাজ করেন সালেহা খাতুন। সালেহা খাতুন ১৯৫৩ সালে গঠিত 'চট্টগ্রাম নারী সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে 'চট্টগ্রাম নারী সমিতি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদ' চট্টগ্রাম শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দুই সংগঠনের সদস্য জওশন আরা রহমান নির্বাচনে প্রচারণায় অংশ নেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নামে প্রচার চালানো ও পোষ্টার লাগানোর দায়িত্ব পালন করেন।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

আরতি দাশ (দত্ত) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রচারণা চালিয়েছেন স্বামী সুধাংশু দত্তের পক্ষে। সুধাংশু দত্ত তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে আরতি দত্তকে ও আত্মগোপন করতে হয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে তিনি আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসেন এবং দলের নির্বাচনী প্রচারণা ও অফিস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রচারণা দায়িত্ব পালন কালে প্রেফতার হন আরতি দত্ত। নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্ব পালন কালে গ্রেফতার হন প্রনতি দাশ (দস্তিদার)। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন-পুলিশের চোখে এই ছিল তাঁর অপরাধ। এ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থী সুধাংশু দত্ত ও পুর্নেন্দু দস্তিদার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনের সময় পুর্নেন্দু দস্তিদার কারাগারে ছিলেন। তাই তাঁর নির্বাচনী কাজে প্রণতি দস্তিদার বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।[১৮]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন রংপুর লিচু বাগান স্কুলের শিক্ষিকা নিলুফার আহমদ ডলি। তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালান এবং প্রার্থীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। আন্দোলনের প্রয়োজনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসংযোগের কারণে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে গিয়েছেন। তিনি রংপুরের বদরগঞ্জ, মাহিগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় কৃষক, শাওতালদের মাঝে প্রচারণা চালিয়েছেন।[১৯]

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন অনেক নারী। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ কংগ্রেস নেত্রী এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদপ্রার্থী নেলী সেনগুপ্তা (১৯৮৬-১৯৭৩) তাঁর পক্ষে এজেন্ট নিয়োগ করেন চিত্রা বিশ্বাসকে। ১৯৪৩ সালে চিত্রা বিশ্বাস রাজনীতির সাথে যুক্ত হলে নেলী সেনগুপ্তার সাথে তার পরিচয় এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়। যার সূত্র ধরেই তিনি নেলী সেনগুপ্তার পক্ষে কাজ করেন। এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জান্নাতুল ফেরদৌস। সেলিনা বানুর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৫৪'র নির্বাচনে রাজশাহী-পাবনা এলাকার প্রার্থী সেলিনা বানু জান্নাতুল ফেরদৌসকে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রের এজেন্ট নিয়োগ করেন। জান্নাতুল ফেরদৌস উৎসাহের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

এছাড়া ও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় বামপন্থীদের হয়ে কাজ করেন বরিশালে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মনোরমা বসুর অনুসারী উষারাণী চক্রবর্তী, আন্ডার গ্রাউন্ড কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত থেকে দলের নির্দেশমত যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী নেপিশা বেগম, এবং সাহারাখাতুন।[২১] যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কাজ করেন রওশন হাসিনা, হোসেন আরা ইসলাম বেবী (স্থপতি মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী), ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ফাতেমা চৌধুরী প্রমুখ।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আইন পরিষদে মোট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৮টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ : ১৪৩, কৃষক প্রজা পার্টি: ৪৮, নেজাম-এ-ইসলাম: ২২, গণতন্ত্রী দল: ১৩, খেলাফতে রাব্বানি পার্টি: ২। জাতীয় কংগ্রেস: ২৫, তফসিলি ফেডারেশন: ২৭, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট: ১৩, কমিউনিষ্ট পার্টি (স্বনামে): ৪টি। [২৩]

নির্বাচনে মুসলিম মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন ৩ জন।[২৪] যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে যে সব নারী আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন।[২৫]

১. দৌলতুন্নেসা খাতুন ঃ দিনাজপুর-রংপুর-বগুড়া (এম. ডব্লিউ)
২. বদরুন্নেসা আহমদ ঃ ফরিদপুর-কুষ্টিয়া-যশোর (এম. ডব্লিউ)
৩. সেলিনা বানু ঃ রাজশাহী-পাবনা (এম. ডব্লিউ)
৪. আমেনা বেগম ঃ ত্রিপুরা-সিলেট (এম. ডব্লিউ)
৫. নুরজাহান মোর্শেদ ঃ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ (এম. ডব্লিউ)
৬. রাজিয়া বানু ঃ বাকেরগঞ্জ (এম. ডব্লিউ)
৭. মেহেরুন্নেসা খাতুন ঃ ময়মনসিংহ (এম. ডব্লিউ)
৮. তোফতুন্নেসা বেগম ঃ চট্টগ্রাম-নোয়াখালী (এম. ডব্লিউ)
৯. নেলী সেনগুপ্তা ঃ (জি. ডব্লিউ)
১০. বিন্দুবাসিনী সরকার ঃ রাজশাহী বিভাগ (এস. ডব্লিউ)
১১. নিবেদিতা মন্ডল ঃ ঢাকা-চট্টগ্রাম বিভাগ (এস. ডব্লিউ)

এক কালের মুসলিম লীগ নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী এই সময় দল ত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। কিন্তু তিনি জয়ী হননি।[২৬] জোবেদা খাতুন সিলেটে মুসলিম লীগের মহিলা সাব-কমিটি গঠন করেন এবং পাক ভারতের সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের মহিলা সাব-কমিটির তিনি ছিলেন প্রথম সভাপতি।[২৭] নূরজাহান মোর্শেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন শামসুন্নাহার আহমেদ। তিনি ও পরাজিত হন।[২৮]

৩ এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করে, তা পাকিস্তান সরকার, মুসলিমলীগ গোষ্ঠী মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিজয় সাফল্যে কেন্দ্রীয় লীগ সরকার শংকিত হয়ে স্বৈরাচারী পন্থায় এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নাকচ করে দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে আদমজী পাটকলে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে এবং এই বিশৃংখলা দমনে সরকারী ব্যর্থতার অজুহাতে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে ৯২ (ক) ধারা [২৯] জারীর মাধ্যমে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়। গভর্ণরের শাসন জারী করার পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়।[৩০]

৯২ (ক) ধারা জারীর পর সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় এ.কে.ফজলুল হক নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ হন। হক মন্ত্রীসভা বাতিলের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকা সহ অন্যান্য স্থান থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রায় ১৬ শো নেতা, কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরাও ঢালাওভাবে গ্রেফতার হন।[৩১]

৯২ (ক) ধারা বলে নারীদের ও গ্রেফতার করা হয়। সরকারের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট নারীদের অধিকার হরণ করে। এ রিপোর্টে নারীদের চার দেয়ালে আটকে রাখার বক্তব্য ছিল। ওলেমা বোর্ড নারীদের অধিকার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় নারীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। গেন্ডারিয়া নারী সমিতি, ও পুরানা পল্টন নারী সমিতি যুক্ত বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয় যে, 'গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল আশা-আকাংখা ধূলিসাৎ হয়েছে। এর ফলে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নীতি উপেক্ষিত হবে।'[৩২] তারা আরো দাবী করেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারী হবে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষিত ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ৯২ (ক) ধারা দিয়ে বাতিল করা হয়। এর প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ছাত্রধর্মঘটে ছাত্রীরাও যোগ দেয় এবং নারী সমাজ তা জোড়ালো ভাবে সমর্থন করেন।[৩৩]

৯২ (ক) ধারায় গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মধ্যে ছিলেন যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যা দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭)। তিনি ১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারা বিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে এগার মাস কারাবরণ করেন ও তিন মাস গৃহবন্দী ছিলেন। [৩৪] ৯২ (ক) ধারায় কারাবরণ করেন বদরুন্নেসা আহমদ। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনের কিছুদিন পরেই দেশে সামরিক শাসন জারী করে সকল

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে ৯২ (ক) এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। এই ধারা ভঙ্গ করে বদরুন্নেসা আহমদ কুষ্টিয়ার বস্ত্রকল, মোহিনী মিলের শ্রমিকদের দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ও সমর্থন জানিয়ে শ্রমিকদের আহুত জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ধারা ৯২ (ক) এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার দায়ে তদানিন্তন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। তিনি এক মাস কারাবন্দী ছিলেন।[৩৫]

গ্রেফতার হন রাজশাহী-পাবনা আসন থেকে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী সেলিনা বানু। পার্লামেন্টে তিনি একজন যুক্তিবাদী বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ৯২ (ক) ধারায় গ্রেফতার করার পর তাঁকে পাবনা কারাগারে অবরুদ্ধ করা হয়। গ্রেফতারী পরওয়ানা জারীস হয় লায়লা সামাদের নামে। গোয়েন্দা পুলিশের (ওহঃবষযরমবহপব নৎধহপয সংক্ষেপে ও.ই.) খাতায় নাম ওঠে লায়লা সামাদের। ফলে তিনি তাঁর শিশু কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান। লায়লা সামাদের স্বামী মীর্জা সামাদকে আত্মগোপন করতে হয়।[৩৬]

৯২ (ক) ধারা চলাকালে পুলিশ গ্রেফতার করে ময়মনসিংহ জেলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ও কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য জ্যোৎস্না নিয়োগীকে। জ্যোৎস্না নিয়োগীর স্বামী প্রখ্যাত কমিউনিষ্ঠ নেতা রবি নিয়োগীর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হলে রবি নিয়োগী আত্মগোপন করেন। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশ আট মাসের শিশুপুত্রসহ জ্যোৎস্না নিয়োগীকে কারাগারে পাঠায়। রবি নিয়োগীর অস্থাবর সম্পত্তি সব পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। যতদিন পর্যন্ত ৯২ (ক) ধারা বলবৎ ছিল ততদিন পর্যন্ত জ্যোৎস্না নিয়োগীকে কারাগারে থাকতে হয়েছ।[৩৭]

নিরাপত্তা আইনে রংপুরের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয় নিলুফার আহমদ ডলিকে। তিনি রংপুর ও রাজশাহী কারাগারে এক বছর বন্দী ছিলেন।[৩৮]

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যাওয়া ও লীগ সরকারের প্রচন্ড দমননীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় এক বছর কোন রকম গণতান্ত্রিক পরিবেশই ছিলনা। ফলে কোন রকম রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনই করা সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়েও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দলের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি।[৩৯]

১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২ (ক) ধারা জারী হওয়ায় নতুন গভর্ণর ছাত্র আন্দোলন যাতে আর না বাড়তে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে। আসন্ন ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান ও যাতে ছাত্র জনতা না করতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ছাত্রনেতা ও সংস্কৃতিকর্মী জহির রায়হানের নেতৃত্বে ২১ ফেব্রুয়ারী পালনের প্রস্তুতি চলে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সমবেত হয় এবং মিছিল বের করে। একপর্যায়ে পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্য করতে থাকে এবং ব্যাপকহারে চলে গ্রেফতারী অভিযান। এ মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জহরত আরা, মিলি চৌধুরী এবং ফিরোজা বেগম প্রমুখকে।[৪০] শুধুমাত্র ছাত্রীই গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৫০ জন।[৪১] বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারী সমাজ ছাত্রীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

গণতান্ত্রিক অধিকার, নারীর সামাজিক অধিকার, ইত্যাদির দাবীতে নারী আন্দোল সরকারী দমননীতির ফলে প্রকাশ্যে করা সম্ভব না হলেও নারীরা ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯৫৪ সালের ৫ জুন ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করা হয় এবং গভর্ণরের শাসনের পরিবর্তে ৬ জুন কৃষকশ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পূর্ববাংলায় সরকার গঠন করেন। এরপর দমননীতি কমে আসে এবং রাজ বন্দীরা মুক্ত হতে থাকে। মহিলা সংগঠনগুলো ও কাজ শুরু করে।[৪২]

১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের সময়ে নুন ও তেলের দাম বাড়ানো হলে সরকারী সংগঠন অষষ চধশরংঃধহ ডড়সবহং অংংড়পরধঃরড়হ (অচডঅ) এর নারীরা ব্যতীত দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের ও সংগঠনের নারীরা সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে রাস্তায় ঘেরাও করেন মন্ত্রী আতাউর রহমানকে। তীব্র খাদ্য সংকটের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নারীরা রাজপথ ঘেরাও আন্দোলন করেন। চালের দাম এ সময় মণ প্রতি ত্রিশ টাকা থেকে বেড়ে পচাত্তর টাকা হয়। যার প্রতিবাদে এই প্রথম পূর্ববাংলার নারীরা রাজপথ ঘেরাও করেন।[৪৩]

১৯৫৫ সালে অক্টোবর মাসে গণপরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান চালু হয় ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ। এই সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান পাকিস্তানের দুইটি প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উভয় প্রদেশে ১৫০ করে মোট ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনসহ পার্লামেন্টারী শাসন প্রতিষ্ঠার বিধান দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে রচিত পাকিস্তানের সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য বিশেষ নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়। নারীদের ভোটে নারীদের নির্বাচনের আইন ঘোষিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে নারীরা সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

আসন ও নারীদের সংরক্ষিত আসনে সর্বসাকুল্যে দুটি ভোট দেবার অধিকার পায়।[৪৪]

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্দ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারী পালন করা সম্ভব না হলেও ঐদিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শহীদের মাজারে যান। ঐদিন বিকেলে কৃষক শ্রমিক পার্টির উদ্দ্যোগে পল্টন ময়দানের জনসভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে বক্তৃতা করেন নারী সমিতির শামসুন্নাহার। এই বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১২ নং শেডের কাছে বরকতের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থানে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শহীদ বরকতের মা।[৪৫]

এ সময় আবু হোসেন সরকারের প্রশাসন পরিচালনায় চরম অযোগ্যতা ও ভুল অর্থনৈতিক নীতির কারণে ১৯৫৬ সালের মে মাস নাগাদ সারা পূর্ববাংলায় খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের নির্দেশে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

এসময় নারী সমাজের কাজ করার মত পরিবেশ কিছুটা সৃষ্টি হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে গঠিত 'শিশুরক্ষা সমিতির' কাজ পুনরায় শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের উদ্দ্যোগে।[৪৬]

খাদ্য সংকট পরিস্থিতিতে নারী ও শিশুর জীবনহানির প্রেক্ষিতে সর্বদলীয় মহিলা কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। খাদ্য সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। কাগজের দামও বাড়ে এসময়। নারীরা এসবের প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও নারী সমাজ প্রতিবাদ সভা করেন। ১৯৫৬ সালে মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরাইলের আক্রমণের নিন্দা করে মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯৫৬ সালের ১০ নভেম্বর আজিমপুর মহিলা পার্কে মহিলা সংগঠন ও ছাত্রী সংসদের উদ্দ্যোগে এক সভা হয়। সামাজিক অধিকার আদায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন। গ্রাম বাংলায় অর্থনৈতিক সংকট চরম পর্যায়ে যাওয়ায় খাদ্যের দাবীতে ভূখা মিছিলে ও ব্যাপকভাবে নারীরা যোগ দেন। ১৯৫৭ সালের ১৫ এপ্রিল সিলেটের মৌলভী বাজারের নারীরা খাদ্যের দাবীতে ভূখা মিছিল বের করে তাঁরা স্থানীয় মিউনিসিপাল পার্কে সভার পর মহাকুমা হাকিমের বাসায় যান। কিন্তু মহাকুমা হাকিম তাদের সাথে দেখা করেননি। খাদ্যের দাবীতে সিলেটে নারীদের মিছিলে অংশ নেন উষাদাশ পুরকায়স্থ। একই বছর ১০ জুলাই পাবনা শহরে নারীদের ভূখা মিছিলে পর্দানশীল নারীরা ও যোগ দেন। এ ভাবে নিজস্ব দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সরকার বিরোধী বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনে নারীসমাজ সংগঠিত হতে থাকে।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে কাগমারীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ সম্মেলনের উদ্দ্যোক্তা ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। কাগমারী সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন পাবনার পরিষদ সদস্যা সেলিনা বানু।[৪৮] কাগমারী সম্মেলনে অংশ নেন কাজী আজিজা ইদ্রিস। এ সময় তিনি ভাসানী ন্যাপে যোগ দেন।[৪৯]

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার পর তা ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু ইস্কান্দার মির্জার কূট-কৌশলে তের মাস স্থায়ী সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভার পতন ঘটে। ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন। সাথে সাথে সংবিধান বাতিল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুবখানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট, জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর প্রধান বলে ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদও বিলুপ্ত করেন। সামরিক শাসনের মাধ্যমে তিনি দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পুর্ণ বন্ধ করে দেন।[৫০]

পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ৪৩ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজন প্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের বিরুদ্ধে উনফড় (এবডো) জারী করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন পরিষদ সদস্য বেগম আনোয়ারা খাতুন, রাজিয়া বানু (প্রাক্তন এম,পি,এ) এবং সেলিনা বানু (প্রাক্তন এম.পি.এ)। তবে শর্ত থাকে যে কেউ যদি বর্ণিত অপরাধ স্বীকার করে পত্রের লিখিত জবাব প্রদান করে তবে তার ক্ষেত্রে শাস্তি হবে এই যে, তিনি পরবর্তী পাঁচ বছর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আর যে সকল ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে পত্রের জবাব প্রদান করবেনা তাদেরকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে।[৫১]

দেখা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ভাবে নারী সমাজের মধ্যে যে প্রত্যাশা ও আলোড়ন জেগেছিল, নারীর অধিকার বাস্তবায়ন, কাজ, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভের যে আশাবাদ জেগেছিল, তা অস্থিতিশীল রাজনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। তথাপি নিরব না থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আবরণে নারী তথা বাঙালীর অধিকার আদায় ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে নারীরা তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে।

ইতিহাসে এ কথা স্বীকৃত যে সাংস্কৃতিক অঙ্গণে অধঃস্তনদের সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবার পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গণে প্রতিরোধের এগিয়ে যায়। সামরিক শাসনের পর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশ্য সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম যখন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় তখন পরোক্ষভাবে রাজনীতি চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আবরণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে 'সংস্কৃতি সংসদ' ছিল ছাত্র ইউনিয়নের, 'শিল্প সাহিত্যসংঘ' ছাত্রলীগের, 'সাংস্কৃতিক পরিষদ' ছিল খেলাফতে রাব্বানী পার্টির। এছাড়া ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) 'ময়ুখ' (ছাত্রইউনিয়ন), ঢাকা মেডিকেল কলেজ 'অগ্রগামী', চট্টগ্রামের ইউ.এস.পি.পি প্রভৃতি সংগঠন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নামে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত- এর সম্প্রসারিত রূপ।[৫২]

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুবখানের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর আবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয় রাজনৈতিক সচেতন সংস্কৃতি কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে। সামরিক সরকার সরাসরি এর বিরোধিতা না করলেও পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যসচিব ও বি.এন.আর. (ইঁৎবধঁ ড়ভ ঘধঃরড়হধষ জবপড়হংঃৎঁপঃরড়হ) এর প্রধান খাজা নাজিমউদ্দীনের জামাতা মুসা আহমেদ একশ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী সংগ্রহ করে এর বিরুদ্ধে অজস্র প্ররোচনা ও নিন্দাবাদ করতে শুরু করে। কিন্তু সরকারের ভ্রুকুটি ও সহযোগিদের প্রচারণা উপেক্ষা করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাকা শহরে তিনটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম. মুরশেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি, ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সমন্বয়ে 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্দ্যোগে গঠিত কমিটি।[৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের নেতা জাহানারা বেগম ও অমূল্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে কার্জন হলে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল।[৫৪] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে বেগম সুফিয়া কামাল, রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৫৫]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন (সরকারী চাকুরিজীবী)। সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরই 'ছায়ানট'র প্রতিষ্ঠা হয়। সুফিয়া কামালকে সভাপতি ও ফরিদা হাসানকে সম্পাদিকা করে একটি

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠন করা হয়। সরকারী চাকুরিজীবী বলে কমিটিতে সন্‌জীদা খাতুনের নাম রাখা সম্ভব হয়নি। রাজনীতির সাথে যুক্ত না থেকে সমাজ প্রগতির ধারাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সুস্থ বাঙালী সংস্কৃতি চর্চার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন সন্‌জীদা খাতুন।[৫৬]

রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে অনুষ্ঠান পন্ড করার চেষ্টা করে মোনায়েম খাঁর লোকেরা। ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জিদা খাতুনের নেতৃত্বে ময়মনসিংহে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী আলোকময় নাহা সেই আন্দোলনের হাল ধরেন। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িত হন সুমিতা নাহা। তিনি রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন।[৫৭]

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধকরণ বিরোধী যত অনুষ্ঠান হয়েছে টাঙ্গাইলে সকল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন খাদিজা সিদ্দিকী। প্রচন্ড চাপের মুখে তিনি রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেন। তখন খাদিজা সিদ্দিকীর সাথে ছিলেন নিবেদিতা মন্ডল, কমলা ঘোষ, শামসুন্নাহার খান, অঞ্জলী অধিকারী, তৃপ্তি, সুপ্তি ও নার্গিস প্রমুখ। এ ছাড়াও বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাঙালীর সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখে। এই নৃত্যানুষ্ঠানে অনেকে সাহসের সাথে অংশ নেন। রাফিয়া আক্তার ঝুনু, লায়লা হাসান এবং আরও অনেকে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্যে তৎকালীন সরকারী কর্মকর্তা চৌধুরী কুদরত গনির স্ত্রী জেন্নাতে গনি সরকারের নেতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও তিনি 'চিত্রাঙ্গদার' নাম ভূমিকায় অংশ নেন।[৫৮]

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা ও জনমত গড়ে তোলা সে সময় এক দুঃসাহসিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। করাচীতে সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের খবর পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছানোর সাথে সাথে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আইয়ুবের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম প্রকাশ্যে আন্দোলন এবং এর নেতৃত্ব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। এভাবেই শুরু হয় বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন যা পরিণামে আইয়ুব বিরোধী বৃহত্তর রাজনীতির পথ করে দেয়। ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পর পর কয়েক দিন বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় একমাসের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেন। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ ৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১ মার্চ আইয়ুব প্রণীত পাকিস্তানের নয়া সংবিধান ঘোষণা করা হলে আন্দোলন আরো তীব্র হয় এবং ১৫ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছিল ছাত্রসমাজ তা তুঙ্গে ওঠে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে। সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে ছাত্ররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরামের ব্যানারে এ আন্দোলন শুরু হয়। এ ফোরামের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল ইডেন মহিলা কলেজ।[৬০]

১৯৬২ সালের ১১ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় ছাত্রইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব এনায়েতুর রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৬০ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে দেশে সার্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানানো হয়। এ সভায় বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নেতাদের সাথে ইডেন কলেজের জনৈক ছাত্রী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন।[৬১]

দুই বছরের ডিগ্রীকোর্স পুনঃ প্রবর্তন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজী সিলেবাসের ৪টি বই বাদ দেওয়া, সিলেবাসের বিশৃংখলা দুরীকরণ; প্রতিবছর নবম শ্রেণী হতে ডিগ্রী ক্লাশ পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা বাতিলের দাবীতে ১৯৬২ সালের ১৬ আগষ্ট হতে প্রদেশ ব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার আহ্বান জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ইউনিয়নের দশ জন নেতা সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন ঃ

> পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ গত ফেব্রুয়ারী হতে যে সংগ্রাম করে আসছে তার একমাত্র প্রধান কারণ হচ্ছে, দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান মাধ্যম শিক্ষাকে ধ্বংস করা। শিক্ষা সংকোচন নীতি গ্রহণ ও দরিদ্র জনসাধারণের সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে এমন একটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা হচ্ছে যাতে নিশ্চিত ভাবে ছাত্র সমাজের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজ আজ শতঃস্ফুর্তভাবে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল দাবী করে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল সহ ছাত্র সমাজের ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১৬ আগষ্ট থেকে প্রদেশব্যাপী সকল

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি রফিকুল হক, সাধারণ সম্পাদক এনায়েতুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নাজমা বেগম এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস নাজমা আহমদ স্বাক্ষর করেন।[৬২]

ছাত্র সমাজের আহ্বানের প্রেক্ষিতে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে ১৬ আগষ্ট (১৯৬২) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিন ইডেন মহিলা কলেজ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, লালবাগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশী বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা এবং শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।[৬৩]

এদিন শুধু ঢাকাতে নয়, ধর্মঘট পালিত হয় নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের জন্য প্রদেশব্যাপী ক্রমাগত ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিবসে ঢাকার নটরডেম কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজে ধর্মঘট পালিত হয়।[৬৪]

ফরিদপুরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। যশোরে ধর্মঘট অব্যাহত থাকে এবং মোমিন গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা বের হয়। নওগাঁয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে এবং ১৫ দফার প্রতি সমর্থন জানায়। খুলনা ও দৌলতপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে ও শোভাযাত্রা বের করে।[৬৫]

চট্টগ্রামে ও শিক্ষা আন্দোলন দানা বেধে ওঠে এবং ধর্মঘট পালিত হয়। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে জে.এম.সেন. হলের ছাত্র সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন মেহেরুন্নেসা।[৬৬]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পূণর্বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংগতি বিধানের জন্য ঢাকার আটজন নেতৃস্থানীয় মহিলা সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেন। বিবৃতি দাতারা বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

> সার্বজনীন ভাবে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার পরিবর্তে শুধুমাত্র সংস্কারের ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার অঙ্গন আরও অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয়ে পড়বে। তারা বলেন যে, জাতির ভবিষ্যত অপরিহার্য ভাবে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা নব পর্যায়ে সমস্যার মূলানুসন্ধান এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি নয়া শিক্ষা কমিশন নিয়োগের দাবী জানান। বলা হয় যে, কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয় নাই এবং রিপোর্টে শিক্ষা ফি যেভাবে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের সুযোগ হতে জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে বঞ্চিত করা হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন জাতীয় পরিষদের সদস্য বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম হাজেরা মাহমুদ, বদরুনেসা আহমদ, বেগম নূরজাহান মোর্শেদ, মিসেস আমেনা বেগম ও বেগম রায়সা হারুন।[৬৭]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে পুণরায় প্রদেশব্যাপী ছাত্রধর্মঘট শুরু হয় ৫ সেপ্টেম্বর থেকে। বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায়। যশোরে তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এক মিছিল বের করেন। এ মিছিলে মোমেন বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা ও অংশ নেয়। ২ সেপ্টেম্বর হতে ঝিনাইদহে ধর্মঘট শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ ডাকবাংলোর সম্মুখে ঝিনাইদহ মহাকুমা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ কলেজের ছাত্রী মিস বদরুন্নেসা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।[৬৮]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে আহুত অব্যাহত ধর্মঘটের সপ্তম দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিপুল ছাত্র সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, ইতিমধ্যে ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করা না হলে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশ ব্যাপী সাধারণ হরতাল পালন করা হবে।[৬৯]

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মিলিত হন। এ প্রতিনিধিদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নাজমা বেগম।[৭০]

ইডেন কলেজ থেকে শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন আই.এস.সি. ক্লাশের ছাত্রী মাহফুজা খানম। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মাহফুজা খানম সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হন।[৭১] শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে ছাত্রলীগের কর্মী শেখ ফজলুল হক মনি ও এনায়েতুর রহমানের নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ইডেন কলেজ ছাত্রী মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিছিল মিটিং এ অংশ নিয়েছেন।[৭২]

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্র নেতা আব্দুর রাজ্জাকের উৎসাহে ছাত্রলীগে যোগ দেন ইডেন কলেজ ছাত্রী রওশন আরা বেগম। এসময় তিনি শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবে কলেজের ভিতরে মিছিল মিটিং আহ্বান করলে রওশন আরা তাতে অংশ নিতেন। শিক্ষা আন্দোলনের সময় তিনি মাহফুজা খানম, হোসনে আরা বেবী, লুৎফুন্নেসা সহ অনেকের সাথে কাজ করেন।[৭৩]

১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন নুরুন্নাহার বেলী, ইডেনকলেজ ছাত্রী কাজী মদিনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্রী মালেকা বেগম। শিক্ষা আন্দোলনের সকল মিছিল মিটিংয়ে যোগ দেন মালেকা বেগম।[৭৪]

এডলিন মালাকার (চারু ও কারুকলা ইনষ্টিটিউটের ছাত্রী) এবং ইডেন কলেজ ছাত্রী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা ও অংশ নিয়েছেন বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে। মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা কখনো মিছিল, মিটিংয়ে অংশ নিয়ে কখনো বা প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[৭৫]

ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলোতেও হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। বরিশালে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন উষারাণী চক্রবর্তী। ছাত্রদের সংগঠিত করার জন্য তিনি ছাত্রদের মধ্যে প্রচারণা চালান। ছাত্রদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন অঞ্জু গাঙ্গুলী। বরিশাল সদর গার্লস স্কুলে অধ্যয়ন কালীন তিনি বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। আন্দোলনে অর্থের যোগান দেবার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করে সভা সমাবেশে যোগ দিয়েছেন শিশিরকনা ভদ্র। বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং ছাত্রইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় উন্মুক্ত স্থানে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকায় রাস্তার পাশের ক্লাব বা বাড়ী বেছে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গণজাগরণী গান পরিবেশন সহ অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন। এ সময় তিনি কাজ করেছেন নূরজাহান, সুলতানা রেবু, দেবীশর্মা, সুফিয়া ইসলাম ও মনোরমা বসু (মাসিমা) প্রমুখদের সাথে।[৭৬]

টাঙ্গাইলে বাষট্টির শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রী শেফালী দাস। কুমুদিনী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হোষ্টেলের মেয়েদের সংগঠিত করে তিনি সে সময়কার সকল মিটিং, মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেন। দিনাজপুরে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এস. এন. কলেজের ছাত্রী আজাদী হাই। ছাত্র আন্দোলনে বন্দী সাথীদের সহায়তার জন্য ছদ্ম নাম দিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন।[৭৭]

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন নেত্রকোনা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন। তিনি পোষ্টার লাগানো, ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ সহ শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করেন। নেত্রকোনা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী আয়শা খানম হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। আয়শা খানম পোষ্টার লেখা ও ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন।[৭৮]

ষাটের দশকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক ছাত্রীদের অংশগ্রহণের পেছনে মতিয়া চৌধুরীর অবদান অসামান্য। তিনি কলেজের ছাত্রী সহ স্কুলের ছাত্রীদের ও সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেন। রাতের বেলা গোপন মিটিং করে,বক্তৃতা দিয়ে মেয়েদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করান। মতিয়া চৌধুরীর প্রভাবে অনেক ছাত্রী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে অংশ নেন । এভাবে বাষট্টির শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে অংশ নেন ইডেন কলেজ ছাত্রী কাজী তামান্না ।[৭৯]

সম্পুর্ণ আগষ্ট মাস এবং সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধ জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান দাবীটির সাথে স্থানীয় নানা রকম দাবী নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মঘট চলতে থাকে। তারপর ১৭ সেপ্টেম্বর "শিক্ষা দিবস" পালন উপলক্ষে ছাত্ররা সমগ্র প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করে । এ সময় বিক্ষোভ মিছিলে

Dhaka University Institutional Repository

অনেক ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। কার্জন হলে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে এসে আইয়ুব খান প্রচন্ড আপত্তি ও বৈরী শ্লোগানের মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এদিকে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে তিনজন নিহত ও প্রায় দু'শতাধিক আহত হয়।[৮০] পাকিস্তানী সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম শহীদ ওয়াজিউল্লাহ বাবুল ও মুস্তাফিজুর। এ সময় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।[৮১]

১৭ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারী এবং ছাত্র নির্যাতনের নিন্দা করে বিবৃতি দেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যা তোফাতুন্নেসা বেগম।[৮২] শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে ঢাকায় সংঘটিত ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে খুলনার ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ছাত্ররা খুলনা মহিলা কলেজের ছাত্রীদের ক্লাশ বর্জন করে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেবার আহ্বান জানালে আই.এ. ক্লাশের ছাত্রী কাজী মমতা হেনা তাতে সাড়া দেন এবং অধ্যক্ষের নিষেধ উপেক্ষা করে ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেন। শিক্ষা কমিশন বিরোধী এ আন্দোলনে অংশ নেন খুলনা পিটি আই স্কুলের ছাত্রী কৃষ্ণা দাশ।[৮৩] ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লেন গার্লস স্কুল থেকে ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার নেতৃত্ব দেন মেহেরুন্নেসা, আসমা খাতুন, রুনু, শিরিন প্রমুখ।[৮৪] হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে মিছিলে অংশ নেন চট্টগ্রাম নন্দন কানন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হান্নানা বেগম এবং সিরাজগঞ্জের স্কুল ছাত্রী আমিনা বেগম মীনা।[৮৫]

ইতিমধ্যে আইয়ুবের গণতান্ত্রিক রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। দেশে নতুন সংবিধান রচনা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক দল বিরোধী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে ও আইয়ুব শাহীর প্রতি বাঙালীদের কঠোর মনোভাবের যে পরিবর্তন হয়নি তা বোঝা গেল ১৭সেপ্টেম্বর ছাত্র জনতার বিক্ষোভের মাধ্যমে। আসলে এসব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিতে এক জাতীয়তাবাদী মূলধারা সৃষ্টি হয়ে যায়।

সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা শহরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদের যুক্ত বিবৃতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়। যা প্রচারপত্র আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী। এ প্রচারপত্রে বলা হয়ঃ

> 'চুয়াল্লিশ মাস ব্যাপী সামরিক শাসনের অবসানের পর দেশে গণতন্ত্রের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং ছাত্র-জনতার সর্বব্যাপী সমস্যা সমাধানের বাস্তব চেষ্টার সূত্রপাত হইবে বলিয়া যে আশার সৃষ্টি হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী হইতে এই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দলে দলে ছাত্র গ্রেফতার করা হইতেছে। জেলে পাঠানো হইতেছে, তাহাদের উপর পুলিশের লাঠি-বন্দুক বেয়নেট ব্যবহৃত হইতেছে, অনেককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিস্কার করা হইতেছে, অনেককে রাষ্টিকেট করা হইতেছে, অনেকের বৃত্তি বাতিল করা হইতেছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ও নির্বিচারে ছাত্র-দলন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নজিরবিহীন হামলায় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে।'

এ প্রচার পত্রে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন-সৈয়দ শমসে আরা সহ-সভানেত্রী মহিলা হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; রওশন আক্তার বানু-সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলাহল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মতিয়া চৌধুরী- সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ; জাহানারা বেগম-সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ; তাহমিদা খানম সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ, (ইন্টার মিডিয়েট সেকশন); মাজেদা খাতুন- সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ, (ইন্টার মিডিয়েট সেকশন)[৮৬]।

আইয়ুব বিরোধী মনোভাব যখন দেশবাসীর মধ্যে তুঙ্গে তখন সরকারের উস্কানিতে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমগ্র জনমানস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়রী থেকে ঢাকা, আদমজী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের পেশাদার গুন্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে এক বীভৎস হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-বিহারী দাঙ্গায় শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৫ জানুয়ারী দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাচাঁতে গিয়ে নবাবপুর রেলক্রসিং এর সামনে নিহত হন আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী। ১৬ জানুয়ারী বিহারীদের আক্রমণে জীবন দিতে হয় নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাককে। মোহাম্মদপুরে অবস্থানরত বিহারীরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীনিবাসে হামলা চালিয়ে মেয়েদের শ্লীলতা হানি করে। দেশের এমনি ভয়াবহ অবস্থায় ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে এবং একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৭ জানুয়ারী ইত্তেফাক, আজাদও সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও' শিরোনামে এই ইশতেহার প্রকাশিত হয়।[৮৭]

নারী সমাজ এই দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন সাহসিকতার সাথে। সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বেগম সুফিয়া কামাল, সন্‌জিদা খাতুন, রোকেয়া রহমান কবিরসহ অনেক মহিলা পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজ করেন।[৮৮] দাঙ্গা বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন মেডিকেল কলেজ ছাত্রী ফওজিয়া মোসলেম।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী খান এ সবুরের উস্কানিতে খুলনায় দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গায় অনেক লোক মারা যায়। এ সময় দাঙ্গা বিরোধী শান্তি মিছিল করেন কৃষ্ণা দাশ। গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করে রুটি তৈরী করে কৃষ্ণা দাশ দাঙ্গায় বিধ্বস্তদের মাঝে বিতরণ করেন।[৯০]

মোনায়েম খান গভর্ণর হয়ে পদাধিকার বলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সমাবর্তন উৎসবে যোগদানের আশা ব্যক্ত করেন। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ সমাবর্তন উৎসবের তারিখ স্থির হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মোনায়েম খানের হাত থেকে সনদ নিতে অস্বীকার করে। ছাত্র সংগঠন গুলো এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সমাবর্তন বর্জনের আন্দোলনে ছাত্রী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন মতিয়া চৌধুরী।

ডাকসূর সহ সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরী সহ বিভিন্ন হলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আচার্য নিয়োগের দাবী জানান। ২২ মার্চ সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের বিষয়ে ২১ মার্চ ডাকসু অফিসে সর্বদলীয় ছাত্র নেতাদের অনুষ্ঠিত সভায় National student Federation (NSF) এর বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সভা লন্ড ভন্ড করে দেয়। এ অবস্থায় ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'মোনেম খান ফিরে যাও' ধ্বনি দিয়ে ছাত্ররা তুমুল বিক্ষোভ শুরু করলে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে মোনায়েম খান সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পুলিশ বিভিন্ন ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে ও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী সহ অন্যান্য ছাত্র নেতা ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেন।[৯১]

সরকারী দমননীতিতে আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে আন্দোলন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পরে। উপায়ান্তর না দেখে সরকার ছাত্রদের নামে হুলিয়া জারী করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪ টি কলেজ, ১৪০০ টি উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। গ্রেফতার হয় ১২০০ ছাত্র।[৯২] বহিস্কৃত হয় ঢাকা কলেজ ও আর্ট কলেজের ৮ জন ছাত্র।[৯৩] ২জন ছাত্রের এম.এ.ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়।[৯৪] ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিস্কার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চাপের মুখে বহিস্কৃত ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষ ফিরিয়ে দেওয়া হলে ও ব্যতিক্রম ঘটে মতিয়া চৌধুরীর বেলায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাঁকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হননি।[৯৫]

আইয়ুব সরকারের দমন ও নির্যাতনের কারণে ছাত্র জনতার মাঝে আইয়ুব বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ছাত্র আন্দোলনকে আরো

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দিষ্ট বেগবান এবং সুসংবদ্ধ করার জন্য ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা নতুন করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ২২ দফা রচনা করে।

১৯৬২ সালের সংবিধানে তিন বছর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালের জুন মাসে 'সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৬৪' [Constitution (second Amendment) Act 1964] পাস করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কয়েকমাস এগিয়ে আনা হয় যাতে সংসদ ও পরিষদ সমূহের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ আইয়ুব পন্থীরা আইয়ুব খানের বিজয়ের ব্যাপারে প্রভাব খাটাতে পারেন।

ইতিপূর্বে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে শামসুন্নহার মাহমুদ পরিষদে নির্বাচক মন্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইন পরিষদে নির্বাচক মন্ডলীতে ২৫ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবী জানান পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যা বেগম রোকাইয়া আনোয়ার। পূর্ব পাকিস্তানের অপর সদস্যা সিরাজুন্নেসা চৌধুরী তাঁর প্রস্তাবটি সমর্থন করেন কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যা বেগম জি.এ.খান ও বেগম মমিনুন্নেসা আহাদ বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি বাতিল হযে যায়। এভাবে নারী অধিকার প্রশ্নে আইন পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হয়।[৯৬]

জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। নারীদের সংরক্ষিত আসনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচন বিষয়ে জাতীয় পরিষদের সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমঝোতামূলক মতামতের ভিত্তিতে সংশোধনী উত্থাপিত হয় যে, নারী সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনে কোন সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনা। এ বিধি বলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ অযোগ্য ঘোষিত হয়।[৯৭]

১৯৬৪ সালের ১৯ আগষ্ট কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ুব খানকে দলীয় প্রার্থী মনোনীত করে। অপর পক্ষে সম্মিলিত বিরোধী দল বা Combined Opposition Party বা সংক্ষেপে COP [৯৮] নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনীত করে। নির্বাচনে ভোটার ছিলেন 'মৌলিক গণতন্ত্রীরা'।[৯৯] ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা এই 'মৌলিক গণতন্ত্রের' সদস্য ছিলেন। যদিও সাধারণ মানুষ ভোটার ছিলনা তবু সারাদেশে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ ও উৎসাহে প্রচারণায় জোয়ার সৃষ্টি করে।[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের উদ্দ্যোগে সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু হলে নারী সমাজের মধ্যে ও সাড়া জাগে। নারী সমাজ ও এসময়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করা ছাড়া ও অনেক নারী ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচরণায় অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। ১৯৫৪ সালে তিনি চট্টগ্রামে চলে যান এবং ১৯৫৬ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী সফরকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু ফাতেমা জিন্নাহর সাথে চট্টগ্রামে আসেন এবং লালদীঘির ময়দানে সমাবেশ করেন। এ সময় সাজেদা চৌধুরী মহিলাদের সংগঠিত করে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করেন খুলনার রোকেয়া মাহবুব। রাজপথে আইয়ূব বিরোধী মিছিল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন মুকুল মজুমদার দীপা। মতলবগঞ্জ কলেজ ছাত্রী মুকুল মজুমদার দীপা ছাত্রইউনিয়নের হয়ে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন এবং ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেন।[১০১]

ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেন যশোর এম এম কলেজের ছাত্রী কাজী মমতা হেনা।[১০২] মতিয়া চৌধুরীর সাথে দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গণ জাগরণী গান গেয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেন শিশির কনা ভদ্র।[১০৩]

নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন। ফাতেমা জিন্নাহর প্রতি বিপুল গণসমর্থন থাকলে ও তাতে কোন ফল হয়নি এ কারণে যে ফাতেমা জিন্নাহ জয়লাভ করলে মৌলিক গণতন্ত্র বাতিল হয়ে যাবে এই আশংকায় অধিকাংশ মৌলিক গণতন্ত্রী নিজেদের অস্তিত্ব ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার তাগিদে তাদের স্রষ্টা আইয়ূব খানকে জয়ী করে।[১০৪]

নির্বাচনে আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে আসেনি কেননা নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আইয়ূব খান ও তাঁর অনুসারীদের কার্যক্রম আগের চেয়ে ও বেশি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। আইয়ূব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এবং বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক মহিলা রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গুলোতে ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ সোচ্চার ছিল। তাই তাদের কর্মসূচীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী স্থান পাচ্ছিল। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় সকল দায়িত্ব পরে ছাত্র সমাজের উপর। ছাত্র সমাজের সাথে ছাত্রীরাও সমান তালে ভূমিকা নেয়। শোষণ ও বৈষম্যের

Dhaka University Institutional Repository

হাত থেকে মুক্তি এবং বাঙালীর অধিকার আদায়ের তাগিদে নারী সমাজ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে নিজেরা যেমন সংগঠিত হতে থাকে তেমনি আইয়ুব শাহীর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করতে ও ভূমিকা রাখে। সভা, সমাবেশ, বক্তৃতা এবং জনসংযোগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের কাজ করেন। গ্রেফতার, নির্যাতন ও সরকারী বিভিন্ন দমন নীতি উপেক্ষা করে পুরুষের সাথে নারী সমাজ এগিয়ে যায় আইয়ুব বিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৪৬-৫৩ ।

২. Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol.2, No.1, (February 24, 1994), P.7.

৩. বশীর আল্ হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*,(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৯ ।

৪. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১১২ ।

৫. শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*,(ঢাকাঃ জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৪ ।

৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*,(ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,১৯৯৩),১ম খন্ড, পৃঃ৪৬৯ ।

৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃদলিল পত্র*, ১ম খন্ড,(ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ৩৭৩-৭৪ ।

৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস*,১ম খন্ড,পৃ. ৪৬৯-৭০ ।

৯. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds), *Women of Pakistan*, Zed books Ltd. London & New Jersey, U.S.A: 1987, P.55-56, Begum Nasim Jahan, Status of Women in Pakistan, P.80.

১০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯),পৃ. ২৯ ।

১১. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪)পৃ. ২৯ ।

১২. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, (Dacca, 1975), P.33.

১৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*,(ঢাকাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯), পৃ. ২৫৪-৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *শতবছরে বাংলাদেশের নারী*, (ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,১৯৯৯), পৃ. ১১৫।

১৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০ ও ৭২।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩ ও ৮৩।

১৮. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৪,১১৯ ও ১২০।

১৯. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮-৫৯।

২০. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৭-১৭১।

২১. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪,৯৪,ও ১১৯।

২২. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১১১,১২৫ ও ১২৬।

২৩. মোহাম্মদ হান্নান, *বাঙালীর ইতিহাস*,(ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৭।

২৪. Report of the Election to the East Bengal Legislative Assembly, 1954, P.18.

২৫. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধঃ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ২২৩-২৯।

২৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৬২।

২৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী* পৃ. ৯৯।

২৮. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৬২।

২৯. ৯২ (ক)ধারা ঃ ১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অংশ বিশেষ। এ ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গভর্নরের শাসন বলবৎ করতে পারে।

৩০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিল পত্র*, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৬।

৩১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) (সম্পাদিত), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১), পৃ. ৬১।

৩২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৭।

৩৩. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), শতবছরে বাংলাদেশের নারী, পৃ. ৬১-৬২।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৩৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫ ও ২৫৫।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৩৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮।

৩৯. Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, (Dhaka, 1975), P.33

৪০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৮।

৪১. ডি.এ রশীদ ও মহিউদ্দিন আহম্মদ (সম্পাদিত), *একুশের সংকলন*, (ঢাকাঃ ১৯৫৬) এবং গাজীউল হক, *একুশের সংকলন ১৯৮০ ঃ স্মৃতিচারণ*,(ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী)।

৪২. মহিলা সংগঠনঃ ১. 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' সভানেত্রীঃ ' সুফিয়া কামাল, যুগ্ম সম্পাদিকাঃ যুঁইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগ; ২. 'ওয়ারি মহিলা সমিতিঃ সভানেত্রী সুফিয়া কামাল, সম্পাদিকাঃ লায়লা সামাদ। ৩.'ঢাকাশহর শিশুরক্ষা সমিতি' সভানেত্রীঃ সুফিয়া কামাল।

৪৩. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৬৪; নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৮।

৪৪. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*,পৃ. ৩৮।

৪৫. সাপ্তাহিক *'নতুন খবর'*, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬।

৪৬. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক ১৯৩৮-১৯৬৮*,(ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৬০।

৪৭. *সাপ্তাহিক বেগম*,(ঢাকাঃ সওগাত প্রেস, ১৯৫৬-৫৭),।

৪৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৬।

৪৯. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *শতবছরে বাংলাদেশের নারী*, পৃ. ৭৯।

৫০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*,পৃ. ৩৮।

৫১. শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, (ঢাকাঃ জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৬১-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

৫৪. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*,(ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৮৩), পৃ. ৮১।

৫৫. দৈনিক *আজাদ*, ২৩ এপ্রিল,১৯৬১।

৫৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,১ম খন্ড,পৃ. ১৫০।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৫৮. প্রাগুক্ত,২য় খন্ড, পৃ. ১২৯; সাক্ষাৎকার: কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা, সেন্ট্রাল রোড, ঢাক, ১২-০৭-২০০৩।

৫৯. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*,পৃ. ৯৭-৯৮।

৬০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৯।

৬১. দৈনিক *'ইত্তেফাক'*, ১৩ আগষ্ট,১৯৬২।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত, ১৭ আগষ্ট,১৯৬২।

৬৪. প্রাগুক্ত,১৮ আগষ্ট,১৯৬২।

৬৫. প্রাগুক্ত,১৯-৮-১৯৬২।

৬৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*,পৃ. ৩৯।

৬৭. *ইত্তেফাক*,২৬-৮-১৯৬২।

৬৮. প্রাগুক্ত, ৬-৯-১৯৬২।

৬৯. প্রাগুক্ত, ১১-৯-১৯৬২।

৭০. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ,*মুক্তি মঞ্চে নারী*,পৃ. ৩৯।

৭১. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,১ম খন্ড, পৃ. ১৮৮।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৭৩. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৫।

৭৪. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৪-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড.পৃ. ১০০ ও ১৩২।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪.১২৩. ও ১৪৩।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১ ও ১৩৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড,পৃ. ২২১ ও ২১৫।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

৮০. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ১০১।

৮১. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পৃ. ৬৫।

৮২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৩৯-৪০।

৮৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯১, ২য় খন্ড,১৯০।

৮৪. নিবেদিতা দাশপুর কায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃ. ৪০।

৮৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮২ ও ১৯৭।

৮৬. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র*, (ঢাকাঃ গতিধারা, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৮৭. মোহাম্মদ হান্নান, *বাঙালীর ইতিহাস*, পৃ. ২০৭।

৮৮. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, পৃ. ১৭৯।

৮৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ২০১।

৯০. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০।

৯১. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ. ১১৬-১১৭।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৯৩. আজাদ, ২৬ মার্চ, ১৯৬৪।

৯৪. আজাদ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৪।

৯৫. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪০।

৯৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।

৯৮. Cop- Combined opposition Party বা সম্মিলিত বিরোধী দল। ১৯৬৪ সালের ২৪ জুলাই আওয়ামীলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিমলীগ, নেজাম-এ-ইসলাম পার্টি মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' বা কপ গঠিত হয়।

৯৯. মৌলিক গণতন্ত্রীঃ ১৯৬৪ সালের জুন মাসে 'সংবিধান(দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৬৪' [Constitution Second Amendment, Act 1964] পাসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভোটার ছিলেন 'মৌলিক গণতন্ত্রীরা'। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা এই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। এ নিবার্চনে সাধারণ মানুষ ভোটার ছিলেন না।

১০০. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৬।

১০১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৬, ৭২ ও ১৯৩।

১০২. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯২।

১০৩. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৩।

১০৪. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ছয়দফা ও ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে নারী

বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৬-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময় কালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয়দফা ঘোষণার পর পূর্ব বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় ছয়দফার প্রশ্নে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে ওঠে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় । ক্রমাগত ছয়দফার জনপ্রিয়তা বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করে । কিন্তু বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে । এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে উত্তাল গণআন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে । এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক, জাতিগত, প্রকৃতিগত, সংস্কৃতিগত এবং স্বাতন্ত্র সত্ত্বাগুলি ক্রমশ: প্রকাশ হতে থাকে । ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনা শুরু হয় । দুই অঞ্চলের মধ্যে অসমতা প্রতিফলিত হয় বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে । অর্থনৈতিক অসমতার পেছনে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ও জনসংখ্যাগত কিছু কারণ ছাড়া বাকী সবটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী আমলা, জমিদার ও মিলিটারী নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাকৃত অবিচার ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ সরিয়ে নিয়ে এবং তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয় এক উপনিবেশবাদ । পূর্বপাকিস্তান তার অস্তিত্বের চব্বিশটি বছরই কাটিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উপনিবেশ হিসেবে ।

পাকিস্তানের রাজধানী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি কেন্দ্রসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় প্রথম থেকেই ওই অঞ্চল ছিল সর্বেসর্বা । ফলে পূর্বপাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচার খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় । আইয়ুব আমলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বলতে গেলে সম্পূর্ণ ভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিশেষত পাঞ্জাবীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় বৈদেশিক সাহায্য যা আসত তার সিংহ ভাগেরও বেশী তাঁরা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিজ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতেন, নামমাত্র আসত পূর্ব পাকিস্তানে । নিম্নের সারণী থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে ।

সারণী-১

পাকিস্তানের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-১৯৭০ (মিলিয়ন ডলারে)

প্রকার	পূর্বপাকিস্তান	পশ্চিমপাকিস্তান	কেন্দ্র	মোট
প্রকল্প ঋণ	৪১৭	৬০৮	১০৮	১১৩৩
প্রকল্প বর্হিভূত ঋণ	৪০৮	৬৭৩	৫৩	১১৩৪
পি এল ৪৮০ খাদ্য	৪৪৫	৭৯১	৫	১২৪১
গ্যারানটি কৃত ঋণ	৩৫২	৬২৩	১১	৯৮৬
প্রকল্প অনুদান ও প্রযুক্তিগত সাহায্য	৫৬	১৪০	২০০	৩৯৬
পণ্যদ্রব্য অনুদান	২৬৩	৫৭৫	১৫	৭৯৩
সিন্ধু অববাহিকা তহবিল	০০	৭৫৬	০০	৭৫৬
মোট	১৯৪১	৪১৬৬	৩৯২	৬৪৩৯

[উৎসঃ এ. এম. এ. মুহিত, বাংলাদেশ ঃ একটা জাতির অভ্যুদয়, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১৯৭৮),পৃ. ১০৪ ।]

সারণী-২

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যয় ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮-৬৯ (মিলিয়ন রূপীতে)

বছর	মোটরাজস্ব	প্রতিরক্ষা	বছর	মোট রাজস্ব	প্রতিরক্ষা ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১৯৯	১৫৪	১৯৫৮-৫৯	১৯৪৯	৯৯৭
১৯৪৮-৪৯	৬৮৮	৪৬২	১৯৫৯-৬০	১৯৭৮	১০৪৪
১৯৪৯-৫০	৮৮৫	৬২৫	১৯৬০-৬১	২১২৩	১১১২
১৯৫০-৫১	১২৭৯	৬৫০	১৯৬১-৬২	২৩১৭	১১০৯
১৯৫১-৫২	১৪৪৮	৭৭৯	১৯৬২-৬৩	২০৬৪	৯৫৪
১৯৫২-৫৩	১৩৩৪	৭৮৩	১৯৬৩-৬৪	২৮৩০	১১৫৭
১৯৫৩-৫৪	১১১১	৬৫৩	১৯৬৪-৬৫	৩৩০১	১২৬২
১৯৫৪-৫৫	১১৭৩	৬৩৫	১৯৬৫-৬৬	৩৭৯৮	২৮৫৫
১৯৫৫-৫৬	১৪৩৬	৯১৭	১৯৬৬-৬৭	৪৪৭৫	২২৯৪
১৯৫৬-৫৭	১৩৪১	৮০১	১৯৬৭-৬৮	৪৭০৪	২১৮৭
১৯৫৭-৫৮	১৫২৫	৮৫৪	১৯৬৮-৬৯	৫৭৭৪	২৪২৭
			মোট	৪৭,৭০৪	২৪,৭১১

[উৎসঃ সালাউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, (ঢাকা,আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১১৯ ।]

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষনীয় যে, ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পাকিস্তানের মোট রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশী ব্যয় হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে । ১৯৬৫-৬৬'র যুদ্ধের বছরে এই ব্যয় তিন চতুর্থাংশ ছাড়িয়ে গেছে । আর এ ব্যয়ের সবটাই হত পশ্চিম পাকিস্তানে । পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান বিবেচনাতেই আসত না এবং ব্যয়ের অতি নগন্য অংশই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হত। উন্নয়ন ও অন্যান্য খাতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বৈষম্য করা হয়েছে তা নিম্নের সারণী থেকে স্পষ্ট হবে ।

সারণী-৩

পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয় এবং এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ১৯৫০-৭০ (মিলিয়ন ডলার)

সময়	সরকারী খাত								বেসরকারী খাত			
	পরিকল্পিত				অপরিকল্পিত							
	প:পাক	পু.পাক	মোট	পূঃপাকের %	প.পাক	পু.পাক	মোট	পূঃপাকের %	প.পাক	পু.পাক	মোট	পূ.পাক%
১৯৬০-৭০	২৪৪৪০	১৯৯৮০	৪৪৪২০	৪৫.০০	৫৯১০	৪৫০	৬৩৬০	৭.১০	৩১৬৩০	৯৫৩০	৪১১৬০	২৩.১৫
১৯৬৫-৭০	১০১০০	১১০৬০	২১১৬০	৫২.২৭	৩৬০০	- - -	৩৬০০	০.০০	১৬০০০	৫৫০০	২১৫০০	২২.১২
১৯৬০-৬৫	৭৭০০	৬২৫০	১৩৯৫০	৪৪.৮০	২৩১০	৪৫০	২৭৬০	১৬.৩০	১০৭০০	৩০০০	১৩৭০০	২১.৯০
১৯৫৫-৬০	৪৬৪০	১৯৭০	৬৬১০	২৯.৮০	- - -	- - -	- - -	- - -	২৯৩০	৭৩০	৩৬৬০	১৯.৯৫
১৯৫০-৫৫	২০০০	৭০০	২৭০০	২৫.৬০	---	- - -	- - -	- - -	২০০০	৩০০	২৩০০	১৩.০৪

[উৎসঃ সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, (ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১২১ ।]

উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুটি অংশে বৈষম্য অতি বিশাল। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত উভয় পর্যায়েই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগেরও কম । ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই বৈষম্যের হার একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক । ৬৫-এর পরে পরিকল্পিত সরকারী খাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

বাড়লেও অপরিকল্পিত খাত তথা বেসরকারী খাতের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।[১]

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অধিকাংশ সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানী আয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশী ছিল। অথচ পাকিস্তানের মোট আমদানীর বৃহত্তর অংশ পেত পশ্চিম পাকিস্তান এবং ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ আসত পূর্ব পাকিস্তানে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিকূলে অসমতা বিরাজ করছিল এবং আইয়ুব আমলের শেষের দিকে তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে ।

জনস্বাস্থ্যের দিকটাও একই রকম অবহেলার শিকার হয়েছিল । তবে বৈষম্যের সবচেয়ে দৃঃখজনক চিত্র পাওয়া যায় পাকিস্তানে শিক্ষার ক্ষেত্রে । শিক্ষা ছিল প্রাদেশিক বিষয় । দুই প্রদেশের বাজেটে যেমন বিশাল পার্থক্য ছিল; শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয়ের হার ও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক কম ছিল। নিম্নে শিক্ষাখাতে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণী-৪
উভয় পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের তুলনা (মিলিয়ন রূপীতে)

পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান	
বছর	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	প্রাদেশিক বাজেটের %	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	প্রাদেশিক বাজেটের %
১৯৫৫-৫৬	৮৪.৬	১৬.৫৭	২৬.৫	৯.১৯
১৯৫৬-৫৭	১০০,৬১৬.৪৯	২২.৫	৭.৪১	-
১৯৫৭-৫৮	১০২.৮	১৬.৮৩	৩৯.৯	১২.৭০
১৯৫৮-৫৯	১৩৬.৬	১৫.৫০	৩৪.৪	৬.৫৮
১৯৫৯-৬০	১১৫.৭	১৪.৩৭	২৫.২	৬.২৫
১৯৬০-৬১	১২১.৬	১৪.৩৫	৬১.৯	১২.৬৫
১৯৬১-৬২	১৫৫.৭	১৪.৩৭	৬৭.২	১০.৭৬
১৯৬২-৬৩	২০৩.৪	১৫.০৭	৭৬.৫	১০.২৭
১৯৬৩-৬৪	২২৯.১	১৪.৫৮	৮৮.৩	৮.৮৭
১৯৬৪-৬৫	২৬৪.৫	১৫.৩৯	৯৫.৪	৮.৩২
১৯৬৫-৬৬	২৮২.০	১৬.৮৭	১২১.৮	১০.৬৯
১৯৬৬-৬৭	২৮৮.০	১৬.১৫	১৩৮.০	১০.৮৫
মোট	২০৮৪.৬	১৫.৫০	৭৯৭.৬	৯.৬৫

উৎসঃ সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১২৫।

অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার প্রতি এই অবহেলার পরিণতিও হয়েছিল মারাত্মক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় স্বাক্ষরতার পর্যায়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তনের তূলনায় এগিয়ে ছিল অথচ আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের দুই বছরের মধ্যে এই আকাশ-পাতাল বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান সুনির্দিষ্ট রূপে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে পড়ে।[২]

উপরোক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের দ্রুত উন্নতি ও পূর্ব পাকিস্তানের অবনতি হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্যের কারণে ।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধ সংঘঠিত হয় । যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয় । পূর্ব বাংলার বাঙালী সৈন্যেরা যখন প্রাণ পণে লাহোর শহর রক্ষা করে অথচ তাদের নিজ জন্মভূমির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানী সরকার । অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শোষণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অত্যাচারে পূর্ব বাংলার জনগণ যখন অতিষ্ঠ তখন এর সাথে নতূন যুক্ত হয় নিরাপওার ব্যাপারে চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্যের অভিযোগ । এভাবে বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, বূদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, ছাত্রদের মধ্যে এবিষয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং পূর্ব বাংলার জনমনে পাকিস্তানী শাষকগোষ্ঠীর বৈষম্য মূলক আচরণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরোধী নেতারা লাহোরে 'তাসখন্দ' উত্তর রাজনীতির গতি ধারা নিরূপণের জন্য 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহ্বান করেন। বৈঠকে নেজাম-এ-ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম, আওয়ামী লীগ ও কাউন্সিল মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন । আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান । ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী সাবজেক্ট কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান আনূষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত "ছয়দফা" পেশ করেন ।[৩]

১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবূর রহমান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে "ছয়দফা" প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এ সময় শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন আহমদের দুটি ভূমিকা সহ ছয়দফা বিবৃত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ১৮ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের "আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী" শীর্ষক আর একটি পূস্তিকা প্রচার করা হয় । এই পূস্তিকায় ছয়দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল । ছয়দফায় বর্ণিত প্রস্তাব সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্যপরিষদ সমূহ সার্বভৌম হবে।

(২) ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে দু'টি বিষয়- প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্র গুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

(৩) মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে । তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(৪) সব রকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে । তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে।

401400

(৫) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমান ভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।

(৬) আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে ।[৪]

১৯ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা দাবীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন দান করে একে দলীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ৬ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দানের জন্য কাউন্সিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহবান জানায়, একই সাথে ৬ দফা দাবী আদায়ের জন্য সমগ্র পাকিস্তানে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি আহবান জানায়।[৫]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পটভূমিতে উদ্ভূত ছয়দফার তাৎপর্য পূর্ব পাকিস্তানের আগের সকল আন্দোলনের তুলনায় অত্যন্ত ভিন্ন ছিল। "ছয় দফা" এখন এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দেয় যার লক্ষ্য শুধুমাত্র আইয়ুবী স্বৈরাচারের অবসান ঘটানো নয়, বরং সাম্প্রদায়িক ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের অধীনতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে মুক্ত করা।

ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান পর্যন্ত সকল গণআন্দোলনে ছাত্রদের সাথে ছাত্রীগণও ব্যাপক ভাবে অংশ নেয়। সভা, সমাবেশ, মিছিল প্রতিরোধে ১৪৪ ধারা জারী করা ছিল সরকারের নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ হয়ে ওঠে অদম্য। তাদের কর্মসূচীতে শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী স্থান পায়। রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কারাগারে বন্দী থাকায় বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ে ছাত্র সমাজের উপর। জনগণের ভরসার প্রতীক হয়ে ওঠে ছাত্র সমাজ। ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও এতে ভূমিকা নেয় সমান তালে।

ষাটের দশকের আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ও জনগণের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে অনেক ছাত্রী। এদের মধ্যে রয়েছেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদিকা বেগম মতিয়া চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী মাহফুজা খানম, রোকেয়া হলের সহ-সভনেত্রী মালেকা বেগম ও আয়শা খানম, ছাত্রলীগ নেত্রী রাফিয়া আক্তার ডলি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান পরিচালনাকারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য দীপা দত্ত (সেন) প্রমুখ। এছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সহ-সভানেত্রী কাজী মমতা হেনা, রাশেদা খানম, (রীনা খান), ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভানেত্রী ও রোকেয়া হলের সাধারণ সম্পাদিকা (পরে সহ-সভাপতি), মেডিকেল কলেজের নাজমুন নাহার, কাজী তামান্না, ফওজিয়া মোসলেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনিরা আক্তার খান, হোসনে আরা, কাজী রোকে য়া সুলতানা, নাসিমুন আরা হক প্রমুখ ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রীরা প্রথম সারির সংগঠক হিসাবে বিপুল অবদান রাখেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ ও বকশী বাজার ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমানে বদরুন্নেসা কলেজ) ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরাও দলে দলে অংশ নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও ছিল রাজপথে। ষাটের দশকের আন্দোলনে ছাত্রীদের গৌরবময় ভূমিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের উজ্জ্বল অধ্যায় । ছাত্রনেত্রী ও কর্মীদের কর্মকান্ড শুধু ছাত্র সমাজের মধ্যে নয় জণগণের মধ্যেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তখনকার জনসভা ও সমাবেশে ছাত্রনেত্রীদের বক্তা হিসাবে রাখা অপরিহার্য বিষয় দাঁড়িয়েছিল। মতিয়া চৌধুরী তাঁর জ্বালাময়ী ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণের কারণে অগ্নিকন্যা উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৫২ থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বেগম সুফিয়া কামাল। এছাড়া আমেনা বেগম, বদরুন্নেসা আহমদ, সাজেদা চৌধুরী সহ অনেকে গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আবু মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় জয়লাভ করেন। এ কারণে ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এন এস এফ) গুন্ডারা তাঁকে নির্মম ভাবে প্রহার করলে তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তোলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ। এ সময় এ গুন্ডাদের গর্ভণর হাউসে আশ্রয় দেয়া হয় এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৭]

ডঃ আবু মাহমুদকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে উপাচার্যের পদত্যাগ এবং গুন্ডা ছাত্রদের বহিঃস্কার ও দোষী ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ শাস্তি দানের দাবী জানিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন এবং প্রদেশের সর্বত্র ছাত্রসমাজকে ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানিয়ে বিবৃতি দেন মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, মাযহারুল হক বাকী, আনিসুর রহমান, সুধাংশু শেখর হালদার (সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল) এবং অন্যান্যের সাথে রোকেয়া হলের সাধারণ সম্পাদিকা সুলতানা বেগম।[৮]

১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) সরকারী ইন্টারমিডিয়েট মহাবিদ্যালয় (ইডেন) এর ছাত্রীরা এক সভায় মিলিত হয়ে ডঃ মাহমুদের উপর হামলার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের দাবী জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানানো হয় ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মাহমুদের লাঞ্ছনার ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনাবলীর তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানানো হয়। এ সময় প্রাক্তন পরিষদ সদস্য এবং পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের সদস্য আমেনা বেগম এক বিবৃতিতে উপাচার্য ওসমান গনির পদত্যাগ এবং ডঃ আবু মাহমুদের লাঞ্ছনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দানের দাবী জানান।[১০]

শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট অচলাবস্থার অবসান এবং প্রদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে অবিলম্বে দন্ডিত উপাচার্য ডঃ ওসমান গনির অপসারণের দাবীতে এবং এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এর হস্তক্ষেপ কামনা করে মহিলা নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। নারী নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম রাইসা হারুন ও মহিলা সমিতির মিসেস কামরুন্নাহার লাইলী প্রেসিডেন্ট এর নিকট তারবার্তায় বলেন," বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা চলছে। পরিস্থিতি সংকটজনক। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। আমরা তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।"[১১]

ডঃ আবু মাহমুদকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ডাকসুসহ বিভিন্ন হল সংসদের নেত্রীবৃন্দের সাথে রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী রওশন আকতার বানু ও ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ডাঃ আবু মাহমুদকে নির্মম প্রহার, সাংবাদিকদের উপর হামলা, আবাসিক ছাত্রদের বই পুস্তক, বিছানাপত্র ভস্মিভূত প্রভৃতি কার্যকলাপ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করছে। তারা ডঃ ওসমান গনির অপসারণ, ছাত্রনামধারী গুন্ডাদলকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিঃস্কার ও যাবতীয় দূর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দূর্বার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার পক্ষে বিবৃতিতে অভিমত ব্যক্ত করেন। এতদূপলক্ষে পূর্ব ঘোষিত ৭ মার্চ প্রদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালনে ছাত্রসমাজকে প্রস্তুতি গ্রহণ সহ দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলসমূহকে ফ্যাসিস্ট সুলভ জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান।[১২]

৭ মার্চ (১৯৬৬) ডাকসুর আহবানে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এদিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত ছাত্র ছাত্রীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন মতিয়া চৌধূরী। মতিয়া চৌধূরী তার বক্তৃতায় বলেন," সকল প্রকার দমননীতি, ফ্যাসীবাদী হামলা ও নিপীড়নকে উপেক্ষা করে সংগ্রামী

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র সমাজ আপোষহীন ভাবে তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। যতদিন পর্যন্ত দন্ডিত উপাচার্য ডঃ ওসমান গনিকে অপসারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিন্ডিকেট গঠন, দূস্কৃতিকারীদের শাস্তিবিধান, বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা না হবে ততদিন ছাত্র সাধারণের দাবী আদায়ের আপোষহীন সংগ্রাম অব্যহত থাকবে।" সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাকসূর সহ- সভাপতি জনাব বোরহান উদ্দিন।[১৩]

এদিকে লাহোরে ছয়দফা প্রথম উপস্থাপনের সাথেই পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকায় তা বিকৃত রূপে প্রকাশ করে শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে আখ্যা দেয়। মার্চ মাসে স্বয়ং আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে এসে ছয় দফার বিরুদ্ধে প্রচারে নামেন। ২০ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবও জনগণকে তাদের ন্যায্য ছয়দফার দাবী আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জেলায় জনসভায় ভাষণ দেন। জনসভায় ছয়দফার অনুকূলে শেখ মুজিবের দেওয়া বক্তৃতায় উচ্চারিত বক্তব্যের উপর আইনের নানা প্যাঁচ খাটিয়ে তাঁকে গ্রেফতার শুরু করে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের উপর আইয়ুব খানের দমননীতি শুরু হয়। এপ্রিল মাস ধরে গ্রেফতারী ও হয়রানী চলার পর ১৯৬৬ সালের ৮মে রাতে শেখ মুজিবকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির (Defence of Pakistan Rules) ৩২ (১) ক ধারায় গ্রেফতার করা হয়। এই সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেফতার করে।[১৪]

এই গ্রেফতার ও দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৩মে (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তানে "প্রতিবাদ দিবস" পালিত হয়। ঢাকার পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ছয়দফা গণ অনুমোদন পায়।

২০মে আওয়ামী লীগ ৭জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রেফতারের হুমকির মুখেও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী ও নেতারা ৬ দফাসহ বন্দী নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে প্রচার চালাতে থাকেন।[১৫]

এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগম। দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ সহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ কারাগারে

Dhaka University Institutional Repository

আটক থাকাকালীন আমেনা বেগম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তার কঠোর পরিশ্রম ছয়দফাকে গণভিত্তিক রূপ দিতে সমর্থ হয়। এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ও আওয়ামী লীগের পতাকা সমুন্নত থাকে।[১৬]

১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে রাজপথে নামেন বদরুন্নেসা আহমেদ। ছয়দফা বাস্তবায়ন এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তিনি মহিলাদের সংগঠিত করে সভা সমাবেশে অংশ গ্রহণ করান। পাকিস্তানী সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য ১৯৬৮ সালে সমমনা বরেন্য শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে 'গণ সাংস্কৃতি পরিষদ' গঠন করেন।[১৭]

৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ডাকসুর ভিপি মাহফুজা খানম। (১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি ছাত্রইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন)। ছয়দফা আন্দোলন চলাকালীন আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের বেশীর ভাগই ছিলেন কারাগারে। ৬ দফাকে জনতার দাবীতে পরিণত করার জন্য দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে ডাকসুর উপর। এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভিপি মাহফুজা খানম। তিনি ৬ দফার প্রশ্নে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত জনসংযোগ করেন। সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার এই মহান দায়িত্ব পালনে তিনি দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।[১৮]

ছয়দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন কুমিল্লা মহিলা কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী মমতাজ বেগম। ছয়দফার প্রচারের জন্য তিনি কাজ করেন। মহিলা ও ছাত্রীদের মধ্যে ছয়দফার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে আমেনা বেগমের নেতৃত্বে মিটিং মিছিলে সক্রিয় অংশ নেন।[১৯]

এদিকে আওয়ামী লীগের ডাকে ছয়দফার প্রতি জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সাড়া দেয় এবং ৭ জুন হরতাল পালনের জন্য প্রস্তুত হয়। মোনেম খানের প্রাদেশিক সরকার জনগণের উদ্দীপনায় সন্ত্রস্ত হয়ে হরতাল ব্যর্থ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন নিবর্তনমূলক তৎপরতা সত্বেও ৭জুন গোটা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় ধর্মঘটী জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত ও বহু আহত হয়।[২০] ৭জুনের প্রতিবাদ দিবসের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ছয়দফার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। এরপর থেকে আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭ সালের মধ্যভাগে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের উপর এক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাবার প্রচেষ্টা নেয়। ছয় দফার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের নিকট গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত্বশাসনের যে দাবী তুলে ধরা হয় তারই প্রেক্ষিতে আরেক দফা নির্যাতন চালানোর পরিকল্পনা হিসেবে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার।

২০ জুন (১৯৬৭) রাওয়াল পিন্ডিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সরকারী দলের নেতা খান এ সবুর বলেন, "ইদানিং পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অশুভ তৎপরতা আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।"[২১]

২২ জুন সংসদে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন এ প্রসঙ্গে সাংসদ ডঃ আলীম-আলরাজীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,"রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর যে রচনা পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী বিবেচিত হবে, সেগুলোর প্রচার ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[২২]

তথ্যমন্ত্রীর এ বক্তব্য বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, বিভিন্ন হল ও কলেজ সংসদের প্রতিনিধিরা এর প্রতিবাদে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্যের নিন্দা করে ১৮ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সাক্ষর দান কারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম প্রমুখ।[২৩] এছাড়া ঢাকা প্রেসক্লাবে সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটেও প্রতিবাদ সভা হয়। এসব প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা করেন বেগম সুফিয়া কামাল ও বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[২৪] প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখ বাঙালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষিত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ বিরোধী আন্দোলন বাঙালী সংস্কৃতি সংরক্ষণ আন্দোলনে পরিণত হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে তার প্রতিবাদ স্বরূপ ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের উপর প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ " নাটক অভিনীত হয়। এতে অংশ নেন কাজী তামান্না। ঢাকায় ছাত্রসমাজ যখন সামরিক শাসন উচ্ছেদ,

Dhaka University Institutional Repository

সুস্থ সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, বাঙালী জাতীয়তাবাদ তথা বাংলা সংস্কৃতি রক্ষার উত্তাল আন্দোলনে রত তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্রী হিসাবে কাজী তামান্না সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মিছিল, মিটিং, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি বাংলা সংস্কৃতি রক্ষা ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।[২৫]

পূর্বে উল্লেখিত বাঙালী সংস্কৃতিকে হেয় করার বিরুদ্ধ আন্দোলনে ভুমিকা রাখেন সন্‌জীদা খাতুন এবং তার সহকর্মীগণ। ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের উদ্যোগে রমনার বটমূলে বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানের পিছনে সন্‌জীদা খাতুনের ভুমিকা প্রনিধানযোগ্য।[২৬] এখানে অপর সংগঠন বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা) র ভূমিকাও স্মরনীয়।

যে সব রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ষাটের কালো দশকে সাহসের সঙ্গে সংগ্রামের মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীত তথা বাঙালী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সন্‌জিদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, মালেকা আজিম, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, হামিদা আতিক, ইফফাত আরা, মিলিয়া গনি, সেলিনা মালেক চৌধরী ও ফ্লোরা আহমেদ প্রমূখ।[২৭]

সিলেটে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ। এ সময় সিলেটের সারদা হলে ঘটা করে রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।[২৮]

১৯৬৬ সালের ১১ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) ছয়দফাকে সমর্থন দেয়। এদিন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী মিসেস মতিয়া চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইফুদিন আহমেদ মানিক বলেন যে,"তাদের প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর বিরোধীতা করবে না। কারণ এতে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেন যে, অপরাপর বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে মতভেদ থাকলেও ৬ দফাকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে তারা ঘোষণা করেন।[২৯]

এরপর থেকে ছয়দফাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য মতিয়া চৌধুরী গোটা বাংলাদেশ সফর করেন। তার জ্বালাময়ী অথচ যুক্তিপূর্ণ ভাষণ লাখ-লাখ জনতাকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৬৭সালে তিনি এক মামলার প্রেক্ষিতে গ্রেফতার হন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ছয়দফার আন্দোলনে আরো অনেক নারী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে রয়েছেন মালেকা বেগম (ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আয়শা খানম (ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),মনিরা আক্তার, রাশেদা খানম (রীনা খান) (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), নাজমুন নাহার, ফরিদা আক্তার (নারায়ণগঞ্জ), আমিনা বেগম, মীনা (সিরাজগঞ্জ), রওশন জাহান সাথী (যশোর), রাশেদা আমিন (চট্টগ্রাম), মাখদুমা নার্গিস (মেডিকেল কলেজ) প্রমূখ নেতৃবৃন্দ।[৩১]

১৯৬৭ সালের ১৮ জানুয়ারী আইয়ুব-মোনেম খানের চক্র শেখ মুজিবর রহমানকে মূল অভিযুক্ত রূপে ঘোষণা করে "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত" নামক মামলা দায়ের করে । অভিযোগ করা হয় যে কয়েক বছর আগে থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ।

১৯ জুন (১৯৬৮) সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ৩৫ জন আসামীর বিচার শুরু হয়। ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বিচার শুরু হলেও এটা ছিল প্রকাশ্য বিচার। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভেবেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনামাত্র পূর্ব বাংলার জনসাধারণ শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

কিন্তু মামলার অভিযুক্ত আসামীদের বক্তব্য এবং মামলার কার্যবিবরণী,সাক্ষীদের জেরার বিবরণ প্রভৃতি যতই প্রকাশিত হতে থাকে ততই পূর্ব বাংলার মানুষ ধারণা করতে শুরু করে যে এটা একটা ষড়যন্ত্র । এ মামলার উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবসহ কয়েকজন সৎসাহসী বাঙালী অফিসারকে দেশের শত্রু রূপে প্রমাণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে পূর্ববাংলার স্বার্থ ও প্রগতিবাদী আন্দোলনকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেওয়া।[৩২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর থেকে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাংলার জনগণ বুঝতে পারে যে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দরুনই শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পূর্ববাংলায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরনের সৃষ্টি হয়। পূর্ববাংলার ছাত্রসামজ বিশেষত ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) এ গণআন্দোলন সৃষ্টির কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ছাত্ররা মুজিবের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন দমনে সরকারী দমননীতি অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে ১৯৬৮ সালের আগষ্টে মতিয়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে দায়েরকৃত মামলার রায় হয়। ১৯৬৬ সালে নেত্রকোনায় এক জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭-ধারা বলে আনীত মামলার রায়ে ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এম. শামীম মতিয়া চৌধুরীকে ২বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন। এই মামলা ছাড়াও দেশরক্ষা আইনের ৩২ ধারা বলে মতিয়া চৌধুরীকে আটক রাখা হয়।[৩৩]

দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী থাকায় মতিয়া চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারে অসুস্থ রাজবন্দী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে মানবিক কারণে মুক্তির আবেদন জানিয়ে ঢাকার ৪২ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন," বেগম মতিয়া চৌধুরী দীর্ঘ এক বছরের অধিক যাবৎকাল দেশরক্ষা আইনে ময়মনসিংহ কারাগারে আটক রয়েছেন। সম্প্রতি তাঁকে দুই বৎসরের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। নারী সমাজের ও জণসাধারণের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে বহুবার তার মুক্তির দাবী করা হয়েছে । প্রাদেশিক গভর্নর মহিলা প্রতিনিধিদের নিকট তাঁর মূক্তি দানের কথা বিবেচনারও আশ্বাস দিয়েছেন। বেগম মতিয়া চৌধুরী বর্তমানে নানাবিধ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে কারাগারে দূঃসহ জীবন যাপন করছেন। আমরা সম্পুর্ণ মানবিক কারণে বেগম মতিয়া চৌধুরীর মুক্তি দাবী করছি এবং অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।"

নিম্নোক্ত ৪২ জন নারী এই বিবৃতিতে সাক্ষর দান করেন- বেগম সুফিয়া কামাল, আমেনা বেগম, জোহরা তাজউদ্দিন, রাইসা হারুন, মিসেস ফরিদা হাসান, মিসেস খোদেজা চৌধুরী, কামরুন্নাহার লাইলী, রেবেকা মহিউদ্দিন, লুৎফুন্নেসা আলী, আজিজা ইদ্রিস, লায়লা কবির, খলিলা খানম, মিসেস শামসুন্নাহার করিম, হুরমাতুন্নেসা, হোসেন আরা চৌধুরী, আনোয়ারা হোসেন, রানী চৌধুরী, মিসেস নবী, মমতাজ আকসাদ, ডাঃ সাহিদা আখতারী বানু, ডাঃ রাশেদা আখতার, ডাঃ নুরুন্নাহার, ডাঃ রহিমা হাসান, ডাঃ লতিফা খাতুন, ডাঃ সুলতানা খানম, ডাঃ নাজমা আরা, ডাঃ ফরিদা বেগম, ডাঃ সিতারা মির্জা, ডাঃ মাখদুমা নার্গিস, মালেকা বেগম, (সহ-সভানেত্রী, রোকেয়া হল), আয়শা খানম (সাধারণ সম্পাদিকা, রোকেয়া হল), ফেরদৌস আরা মিনু (সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ), উম্মে সালমা (সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ), রওশন আরা (সহ-সভানেত্রী, সরকারী মহিলা মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়), মাহবুবা আহমদ (সাধারণ সম্পাদিকা, সরকারী মাধ্যমিক

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা মহাবিদ্যালয়), আনফিসা ওসমান (সহ-সভানেত্রী, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), রোকেয়া হায়দার (সাধারণ সম্পাদিকা, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ), মনোয়ারা বেগম (সহ-সভানেত্রী, নার্সিং স্কুল), সাজেদা খাতুন (সাধারণ সম্পাদিকা, নার্সিং স্কুল)।[৩৪]

পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রখ্যাতকর্মী বেগম মতিয়া চৌধুরীর মুক্তির আবেদন জানিয়ে সিলেট জেলার বানিয়াচং এলাকার ১২০ জন মহিলা একটি যুক্ত বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সাক্ষর করেন মজিলা বিবি, সালেহা খাতুন, রাফিয়া খাতুন, হালেমা খাতুন , শামসুন্নাহার, রেনুবালা দেবী, সাজেদা খানম প্রমুখ। এদের মধ্যে অধিকাংশই টিপসহি দেন।[৩৫]

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের দশ বৎসর পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, যা 'উন্নয়ন দশক' নামে খ্যাত। এক বছর ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরামহীন প্রচার চলে তাঁর অভাবনীয় সাফল্যের উপর। তথাকথিত 'উন্নয়ন দশক' পালনের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের বৈষম্যের চিত্র জনগণের নিকট আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। দুই অঞ্চলের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতা একে এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এক পৈশাচিক বিদ্রুপ বলেই গ্রহণ করে। ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক দল এই উন্নয়ন দশকের নতুন নামকরণ করেন 'স্বৈরাচারের কালো দশক।'[৩৬]

উন্নয়ন দশক পালনের মাধ্যমে প্রবঞ্চনার সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় জনগণ স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন ছেড়ে স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিস্থিতি আন্দোলনমুখী হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ২৪ নভেম্বর ন্যাপের (ওয়ালীশাখা) আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এদিন বায়তুল মোকরম প্রাঙ্গণে ন্যাপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ সহ অন্যান্যের সাথে বক্তৃতা করেন বেগম জোহরা তাজউদ্দিন (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিনের স্ত্রী)। সমাবেশে বক্তাগণ রাজবন্দী মুক্তি, হুলিয়া ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক, কৃষক-মধ্যবিত্তের রুটি-রুজির ও ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে ক্ষমতাসীন সরকারকে গণ আন্দোলনের শক্তিতে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে এবং সকল বিরোধী দলকে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।[৩৭]

১৯৬৮ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকার সাংবাদিকরা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে রাজপথে নেমে আসেন। ৬ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এদিন পল্টন ময়দানে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাসানী আইয়ুব সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ ১৩ ডিসেম্বর জুলুম বিরোধী দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে ৪ ডিসেম্বর (ওয়ালী) ন্যাপ তা সমর্থন করে। ৭ ডিসেম্বর বেবীস্কুটার ড্রাইভারদের পক্ষ থেকে হরতাল পালিত হয়। এদিন নীলক্ষেতে পুলিশের গুলিতে মোহাম্মদ ইসহাক (২৮) এবং আব্দুল মজিদ (৩০) নামে দুজন নিরীহ দোকান কর্মচারী নিহত হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণে এই দু'জনের মৃত্যু সারা প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।[৩৮]

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), পি.ডি.এম. ভূক্ত সকল দল ঐক্যবদ্ধভাবে ১৩ ডিসেম্বর হরতাল পালনের যে সিদ্ধান্ত নেয় তা সমর্থন করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সমর্থন ব্যক্ত করে।

সংযুক্ত বিরোধী দল আহুত ১৩ ডিসেম্বর (১৯৬৮) শুক্রবারের হরতালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঢাকার নারী সমাজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দেশে 'পুলিশীরাজ' কায়েমের অভিযোগ করা হয়। বিবৃতিতে সাক্ষরদানকারী মহিলা নেতৃবৃন্দ দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই দমন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার জন্য নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। নারী সমাজের পক্ষে বিবৃতিটি প্রদান করেন বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস খোদেজা চৌধুরী, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম হুরমতুন্নেসা, বেগম আজিজা ইদ্রিস, খলিলা খানম, বেগম জসিমউদ্দিন, ফরিদা হাসান, মিসেস শামসুন্নাহার, হোসনে আরা চৌধুরী, মমতাজ আকসাদ, সুলতানা চৌধুরী, মিসেস নবী, মিসেস এস টি এস মাহমুদ, মিসেস নিশাওয়াত নাহার চৌধুরী।[৩৯]

সমগ্র পূর্ব বাংলায় ১৩ ডিসেম্বর (১৯৬৮) সফল হরতাল পালিত হয়। সরকারও হরতাল প্রতিহত করার জন্য সারা শহরে পুলিশ বাহিনীর বৃহত্তম সমাবেশ ঘটায় এবং ঢাকাসহ প্রদেশের অধিকাংশ শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। অপরদিকে হরতালের প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে সমর্থন আসার প্রেক্ষিতে শেষপর্যন্ত মওলানা ভাসানী ও ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলের কর্মীরা হরতালে সহযোগিতা করবে। জনসাধারণ এদিন নিজ নিজ উদ্যোগেই হরতাল পালন করে। ফলে সরকারী সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে সর্বমোট ২৭ জন আহত হয়। এদের মধ্যে পরে একজন শহীদ হন। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এক হাজারের বেশী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।[৪০] সারা ডিসেম্বর মাস প্রদেশব্যাপী হরতাল, মিছিল, প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সমগ্র পূর্ববাংলায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এন. এস. এফ) একাংশ এবং ডাকসুর নেতাদের নিয়ে একটি 'সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। জনাব আব্দুর রউফ (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলী (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ) জনাব তোফায়েল আহমেদ (সহ-সভাপতি, ডাকসু), জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু), জনাব সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক [সভাপতি-ছাত্র ইউনিয়ন, (মতিয়া)] সামসুদ্দোহা (সাধারণ সম্পাদক, ঐ), মোস্তফা জামাল হায়দার (সভাপতি, চীনপন্থী ছাত্রইউনিয়ন) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ছয়দফা দাবীর পরিপূরক ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবী প্রনয়ণ করে।[৪১] এগার দফা কর্মসূচী জনসমক্ষে পেশ করার পূর্বে ৪ জানুয়ারী ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করে। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের জন্য সারাদেশের ছাত্র সমাজকে প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানিয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির প্রতি ও আহ্বান জানানো হয়। ৬ জানুয়ারী সংবাদ পত্রসমূহে ১১ দফা প্রকাশিত হয়।

এগার দফার রূপরেখা ঃ

১, (ক) সচ্ছল কলেজ গুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হয়েছে সেগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চক্লাশে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

কারিগরী, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষিছাত্রদের দাবী মানতে হবে।

ছাত্র বেতন কমাতে হবে।

নারী শিক্ষার প্রসার করতে হবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।

(গ) শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতি প্রামান্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মেনে নেবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল শাসন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্র গুলির ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবেনা। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যেমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলবে এবং ব্যবসা-বানিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী -রপ্তানী করবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যাস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মান ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু সহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬. কৃষকের উপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে। এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তন মূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করতে হবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।[৪২]

১১দফার দাবীগুলিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দাবী সন্নিবেশিত হয়েছিল বলে তা অল্প সময়ের মধ্যে জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। যে কারণে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যখন গণআন্দোলনের ডাক দেয় তখন সারাদেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সে আন্দোলনে অংশ নেয়। ১১ দফার প্রতি ছাত্রীরাও সমর্থন জানায় এবং তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারীর প্রথম থেকেই শ্রমিকদের সাথে ছাত্রদের যোগাযোগ হতে থাকে। ছাত্র নেতাদের আহ্বানে আদমজী, বাওয়ানী, টঙ্গী, তেজগাঁ প্রভৃতি শিল্প এলাকায় "সংগ্রাম পরিষদ" গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে মহিলাদের ও "সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে ছাত্রীরা উদ্যোগী ভূমিকা রাখেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

৮ জানুয়ারী (১৯৬৯) সারা পাকিস্তানের আটটি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা ডাক[৪৪] (উবসড়পৎধঃরপ অপঃরড়হ ঈড়সসরঃঃবব-উঅঈ) গঠন করে। 'ডাক' নেতৃবৃন্দ ৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ১৭ জানুয়ারী (১৯৬৯) সারাদেশে 'দাবী দিবস' পালন করার আহ্বান জানায়। ঐ একই দিনে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদও দাবী দিবস পালন করে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। হল-হোষ্টেল গুলোতে ই.পি.আর. বাহিনী ঢুকে তছনছ করে। ২৫ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা লংঘন ও ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৮ জানুয়ারী ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ১৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকার ছাত্র ধর্মঘট এদিন জঙ্গীরূপ ধারণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মঘটী ছাত্র ছাত্রীরা একটি মিছিল বের করে। এমিছিলের নেতৃত্ব দেন জনাব শামসুদ্দোহা, আব্দুল মান্নান, তোফয়েল আহমদ, আবদুর রউফ, ও মোস্তফা জামাল হায়দার।[৪৫]

১৮ জানুয়ারী ঢাকা শহরে সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে ধর্মঘট পালনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও বিভিন্ন হলে পুলিশের অনধিকার প্রবেশ, শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় বেপরোয়া লাঠিচার্জ, বিভিন্ন হলের ছাত্রদের মারপিট ও নির্বিচারে গ্রেফতারের এবং ১১ দফা দাবী আদায়ের জন্য ঢাকার ২৫ জন ছাত্রনেতা ২০ জানুয়ারী প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেন। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী ও ১১ দফার সমর্থনে আহুত ২০ জানুয়ারীর ধর্মঘট সফল করে তোলার জন্য নেতৃবৃন্দ ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সাক্ষরদানকারী অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন-মালেকা বেগম (সহ-সভাপতি, রোকেয়হল), আয়শা খানম (সাধারণ সম্পাদিকা, রোকেয়া হল), উম্মে সালমা (সহ-সভাপতি, ইডেন কলেজ), হোসেন আরা দিলু (সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ), মেহেরুন আলম চৌধুরী (সহ-সভাপতি, ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ), মাহমুদা খাতুন (সাধারণ সম্পাদিকা, ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ)।[৪৬]

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ২০ জানুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকাসহ সারা পূর্ব বাংলায় ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। ঐ দিন সকালে মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় উপস্থিত হয়। ধর্মঘটী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাজপথে মিছিল বের করে। ই.পি. আর পুলিশবাহিনী মিছিলটিতে বাধা প্রদান করলে

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলটি কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। এরূপ একটি মিছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে যাবার সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের ঢাকা হল শাখার সভাপতি আসাদুজ্জামান।[৪৭]

আসাদের মৃত্যু সংবাদ ঢাকা শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমবেত হয়। অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা তাৎক্ষনিক ভাবে এক শোক সভায় মিলিত হয়। এবং সভা শেষে একটি শোকমিছিল বের হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে সেদিন মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ছাত্রীরা। এবং মিছিলের অগ্রভাবে কালো পতাকা হাতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যান জনৈক ছাত্রী। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদ স্মরণে সারা দেশে তিনদিন ব্যাপী শোকদিবস পালনের কার্মসূচী ঘোষণা করে। ২১ জানুয়ারী ঢাকা শহরে হরতাল, ২২ জানুয়ারী শোক দিবস, ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মশাল মিছিল।[৪৮]

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় মহিলা থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ সহ বিভিন্ন জেলার নারীরা অংশগ্রহণ করেন। ২১ জানুয়ারী ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে হরতাল পালিত হয়। এদিন হরতাল সফল করার জন্য ছাত্রীরা ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করেন। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালোপতাকা উত্তোলন করা হয়। পল্টন ময়দানে আসাদের গায়েবানা জানাজা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার মানুষ শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করে। শোক মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ ইডেন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। কর্তৃপক্ষ মিছিলে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখার জন্য ছাত্রীনিবাসের গেট তালাবন্ধ করে দিলেও তাঁরা তা উপেক্ষা করে মিছিলে অংশ নেয় এবং পুলিশের নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয়। ঐদিন পুলিশ ও ই.পি.আর এর ব্যাটনচার্জ ও লাঠিচার্জের কারণে ১৫ জন ছাত্রী আহত হয়।[৪৯]

১১ দফার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের অন্যতম নেত্রী আয়শা খানম। আয়শা খানম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যু যেমন- ৬ দফা, ১১ দফা ও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১১ দফা আন্দোলনে ডাকসুর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দা মনিরা আক্তার খাতুন। ছাত্রীদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের মেয়েদের, কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীদের শিক্ষা, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, বন্দীমুক্তি ও গণতন্ত্রের দাবীতে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। গণঅভ্যুত্থানে তিনি সম্মুখ কাতারে থেকেছেন। ২০ জানুয়ারী (১৯৬৯) আসাদ যে মিছিলে শহীদ হন সেই মিছিলে মনিরা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।[৫০]

১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দীপদত্ত। গণঅভ্যুত্থানের সময়কালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ব্যাপক ছাত্র-গণসংযোগ করেন। এ সময় দীপাদত্ত তাঁর দলের অন্যদের নিয়ে উত্তরবঙ্গে কাজ করেন। মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সহ রাজপথে ছিল দীপাদত্তের সক্রিয় পদাচারণা। ২০ জানুয়ারী (১৯৬৯) আসাদের মৃত্যুর পর যে বিশাল শোক মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে তার সম্মুখভাগে ই.পি.আর ও পুলিশের বাধা অতিক্রম করে কালোপতাকা নিয়ে তেজোদীপ্ত পদে এগিয়ে গিয়েছেন দীপা দত্ত। এই গণঅভ্যুত্থানই শেষপর্যন্ত একনায়ক আইয়ুবখানের শাসনের অবসান ঘটায়।[৫১]

২০ জানুয়ারী মিছিলে অংশ নেন রাশেদা খানম। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্য তিনি বহু শ্রম ব্যয় করেন। আসাদের মৃত্যুর পরের আন্দোলনের দিনগুলোতেও তিনি অনেক দায়িত্ব পালন করেন। ২০ জানুয়ারী আসাদ শহীদ হবার দিনে মিছেলে ছিলেন বেবী মওদুদ। ছাত্র ইউনিয়ন রোকেয়া হল শাখার সদস্য ও হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদিকা বেবী মওদুদ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন।[৫২]

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন বেগম শামসুন্নাহার। ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে ডাকসু অফিসে নিয়মিত যাতায়াত এবং প্রতিদিনের কার্যক্রম নিয়ে নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। ২০ জানুয়ারী বেগম শামসুন্নাহার বোন মমতাজ শেফালীকে নিয়ে বদরুন্নেসা কলেজ থেকে কর্তৃপক্ষের নিষেধ উপেক্ষা করে মিছিলে অংশ নেন। এ সময় শুধু মিছিল মিটিংই নয়, বেগম শামসুন্নাহার ঢাকার সূত্রাপুর, বক্শি বাজার এলাকার বস্তিতে গিয়ে মহিলাদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেন। আসাদ হত্যার প্রতিবাদে আলম, আনোয়ারের নেতৃত্বে পুরানো নর্থব্রুক হল রোডে প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দেন হাসিনা পারভীন।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্রী ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা, মিছিল, মিটিং সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন রওশন আরা বেগম, শিশির কনাভদ্র, কাজী মমতা হেনা, মমতাজ বেগম, জিয়াউন্নাহর বেবী, কাজী রোকেয়া সুলতানা, সুমিতানাহা, শামসুন্নাহার ইকো, ফরিদা খানম সাকী, শেখ হাসিনা, নাসিমুন আরা হক মীনু এবং রোকেয়া কবীর প্রমুখ।[৫৪]

১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ইডেন কলেজের ছাত্রীরা। ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা হোসনে আরা ইসলাম বেবী সক্রিয় অংশ নিয়েছেন গণআন্দোলনে। উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে মিছিল মিটিং থেকে শুরু করে সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি ছাত্রীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলার মিটিং এ অংশ নেন। ইডেন কলেজের আরো অনেক ছাত্রী উনসত্তরের গণ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে এ.এন. রাশেদা, আফরোজা হক রীনা, মমতাজ শেফালী প্রমূখ ছাত্রীবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।[৫৫]

ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাখীদাশ পুরকায়স্থ। উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময়কালীন মিছিল, মিটিং এ অংশ গ্রহণ এবং মেয়েদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের বার্ষিক সম্পাদিকা রাখী দাশ। ১৯৬৯ সালের সকল গণ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন শিবানী দাশ। কঠোর পরিশ্রমী শিবানী দাস শ্লোগান দেওয়া ও পোষ্টার লেখার দায়িত্ব পালন করেন। ২০ জানুয়ারী আসাদের শহীদের দিনে শিবানী দাশ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলেন।[৫৬]

১১ দফার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন কাজী রোজী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী কাজী রোজী কবিতা লেখা নিয়ে ব্যাস্ত থাকলেও ছাত্রলীগের হয়ে মেয়েদের সংগঠিত করা, রাজনৈতিকভাবে সচতেন করার কাজ করেছেন। উনসত্তরের গণ আন্দোণনের প্রাক্কালে কাজী রোজী মিছিল, মিটিং এ অংশগ্রহণে করেন।[৫৭]

একজন গণসংগীত শিল্পী হিসেবে উনসত্তরের গণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সকল সভাসমিতি, সমাবেশ, মিছিল ও গণ সঙ্গীতের আসরে অংশগ্রহণ করেন সরকারী ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজের ছাত্রী বুলবুল মহলানবীশ। সে সময়কার প্রখ্যাত সুরকার সুখেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ট্রাকে

Dhaka University Institutional Repository

করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। আসাদের মৃত্যুর পর প্রতিটি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছেন বুলবুল। একবার মিছিলে লাঠিচার্জ হলে তিনি আহত হন। ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন উক্ত কলেজের ছাত্রী শিরীন আক্তার। এছাড়া সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাহার মিনু ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।[৫৮]

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশ নেন সরকারী ইন্টারমিডিয়েট স্কুলের ছাত্রী মিনারা বেগম ঝুনু। ছাত্রীনেত্রী ফোরকান বেগমের উৎসাহে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে তিনি গণআন্দোলনের মিছিল মিটিং এ অংশ গ্রহণ করেন।[৫৯]

মহিলাদের সংগঠিত করা থেকে শুরু করে সাক্ষর সংগ্রহ, সভা, সমাবেশে অংশগ্রহণ সহ চিকিৎসা সেবার কাজ করেছেন ডাঃ মাখদুমা নার্গিস। সে সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফওজিয়া মোসলেম, কাজী তামান্না, গুলশান আরা নিলু, নাজমুন্নাহার প্রমুখ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।[৬০]

২২ জানুয়ারী (১৯৬৯) আসাদ স্মরণে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতালা থেকে শুরু করে শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিশাল শোক মিছিলে নারী সমাজ অংশ গ্রহণ করেন। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আজিজা ইদ্রিস, আয়শা খানম, মালেকা বেগম, দীপাদত্ত সহ অন্যান্য ছাত্রীরা।[৬১]

২৩ জানুয়ারী মশাল মিছিলে ছাত্রীরাও অংশ নেয়। ইডেন কলেজের ছাত্রীনিবাসের প্রবেশদার তালাবদ্ধ থাকায় মিছিলে অংশ নিতে অসমর্থ ছাত্রীরা ছাত্রী নিবাসের মধ্যেই মশাল হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনতার মিছিলেও সেদিন অনেক মহিলা অংশ নেন। ১১ দফার প্রতিটি দিবসে রোকেয় হলের ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল কমপক্ষে শতকের বেশী। তাদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবস্থান দেশবাসীকে আন্দোলিত করে।[৬২]

২৪ জানুয়ারীর হরতাল ঢাকা শহরে অতি দ্রুত এক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ঢাকার রাজপথে ছাত্র শ্রমিক কর্মচারীদের মিছিলের ঢল নামে। পাকিস্তান সরকার দিশাহারা হয়ে মিছিলের উপর গুলি চালায়। এতে সচিবালয় ভবনের নিকট কিশোর মতিউর (নবকুমার ইনষ্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র) রহমান সহ কয়েকজন নাগরিক নিহত হন ও অনেকে আহত

Dhaka University Institutional Repository

হন। হরতালের সময় ছাত্রী তরু আহমেদ কালো পতাকা সামনে নিয়ে রাস্তায় পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করেন। এর পরেই জনতার ঢল নামে পল্টন ময়দানের দিকে।* ক্ষিপ্ত জনতা তখন পাকিস্তান সরকার নিয়ন্ত্রিত "দৈনিক পাকিস্তান" ও "মর্নিং নিউজ" অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহর সাময়িক ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[৬৩]

২৪ জানুয়ারী (১৯৬৯) বেগম সুফিয়া কামালের বাসভবনে নেতৃস্থানীয় মহিলাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ২৭ জানুয়ারী বেলা ১১ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকার নারীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয় এবং সভাশেষে একটি শোক মিছিলের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সে প্রস্তাব অনুযায়ী নারীরা সন্ধ্যে ৬ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে একটি মশাল মিছিল বের করেন। নারীদের এ মিছিল ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। উক্ত সভায় বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন, আজিজা ইদ্রিস, হুসনে আরা ইসলাম, ফরিদা হাসান, লায়লা কবির, বদরুন্নেসা আহমদ, কামরুন্নাহার লাইলী সহ ৪০ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজকে গণ সংগামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের আবেদন জানিয়ে বলেন যে, "সরকার সমগ্র দেশে আজ গণহত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির বর্বরনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। গত দুইমাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, হাতিরদিয়া, নড়াইল, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, করাচী ও লাহোরে গোলাগুলি, অসংখ্য ছাত্র জনতাকে আহত করা হয়েছে। ঢাকায় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের হত্যা এই নৃশংস বর্বরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুলিশ, ই.পি.আর. বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ থেকে ছাত্রীদেরকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই। আমরা সরকারের এই চন্ডনীতির তীব্র নিন্দা, গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহত শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানাচ্ছি। আমরা ইহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, কোন দেশের কোন মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবী পশুশক্তি বলে দাবীয়ে দেয়া যায় নাই। পাকিস্তানের মানুষের অধিকার সংগ্রামকে রক্তের গঙ্গা বইয়ে ভাসিয়ে দেয়া যাবেনা। আমরা ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং আগামীকাল সাধারণ হরতালকে সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজের প্রতি ও আমরা আজিকার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।"[৬৪]

জনগণের বিপ্লবী মনোভাব দেখে পাকিস্তান সরকার ঢাকা শহরে সেনাবাহিনী তলব করে রাত ৮টায় ২৪ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারী করে।

Dhaka University Institutional Repository

অপর পক্ষে সরকারের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৫ জানুয়ারী পূর্ণ হরতালের ডাক দেয়া হয়। ২৪ জানুয়ারী ঢাকায় গণ অভ্যুত্থানের পর আন্দোলন একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। এ আন্দোলন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভকারী জনগণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে বহুলোক হতাহত হয়।

খুলনায় গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন কৃষ্ণা রহমান। সে সময়ে কৃষ্ণা রহমান খুলনা জেলার ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে মিটিং, মিছিলে অংশ নেন। যার কারণে তাঁর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। তিনি তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে কাজকর্ম চালিয়ে যান। আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে অংশ নেন পাইওনিয়ার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অলোকানন্দা দাস। স্কুল শাখার সভানেত্রী ও ছাত্রলীগের ওয়ার্ড শাখার সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।[৬৫]

বরিশালে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন চারুবালা গাঙ্গুলী এবং উষা রানী চক্রবর্তী। উভয়েই এ সময় মহিলা পরিষদ গঠনে ভূমিকা রাখেন। গণআন্দোলনে অংশ নেন মহিলা পরিষদের বরিশাল জেলা শাখার সহ-সভানেত্রী জীবনপ্রভা বিশ্বাস। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রায় প্রতিটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন উম্মেহানী খানম। ঊনসত্তরের আন্দোলনে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন বরিশাল আলতাফ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুফিয়া ইসলাম। কিংবদন্তী নেত্রী চারুবালা গাঙ্গুলীর মেয়ে অঞ্জু গাঙ্গুলী গণআন্দোলনে অংশ নেন। তিনি অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন ছাত্রদের সংগঠিত করে এবং মিছিলে অংশ নিয়ে। যে কারণে এ সময় তিনি পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন। এছাড়া ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন পূর্ব জলাবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সবিতা চন্দ। সে সময় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের বাধা অতিক্রম করে ছাত্রীদের স্কুল থেকে বের করে মিছিলে নেতৃত্ব দেন সবিতা চন্দ।[৬৬]

ঊনসত্তরের ১১ দফার গণআন্দোলনে যশোরে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। যশোর জেলা ছাত্রলীগের অন্যতম নেত্রী রওশন জাহান সাথী গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১১ দফার আন্দোলনে অংশ নেন রওশন হাসিনা। ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি কাজ করেন।[৬৭] এছাড়া ছাত্রীনেত্রী সালেহাবেগম ও রওশন জাহান সাথীর প্রেরণায় গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন সেবাসংঘ গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শামসুন্নাহার। সে সময় তিনি স্কুলের ছাত্রীদের এবং পাড়ায় নারীদেরকে ৬ দফা ও ১১ দফা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সংগঠিত করে বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করাতেন। আসাদের শহীদ হবার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এতে অংশ নেন স্কুল ছাত্রী মমতাজ বেগম। এ সময় থেকে মমতাজ বেগমের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। এরপর থেকে তিনি প্রতিটি মিছিল, মিটিং এ অংশ নিয়ে স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাত্রাকে বেগবান করেন। এছাড়াও আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে অংশ নেন ফিরোজা খানম।[৬৮]

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন সোফিয়া করিম। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় ময়মনসিংহ শহরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আসাদ হত্যার খবর ময়মনসিংহের হালুয়া ঘাটে পৌছালে সেখানে ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। প্রধান শিক্ষকের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ছাত্রীদের ক্লাশের বাইরে নিয়ে মিছিলে ও জনসভায় যোগ দেন হালুয়া ঘাট গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী রেখা সাহা । মেয়েদের পক্ষ থেকে রেখা সাহা জনসভায় বক্তৃতা দেন ।[৬৯] ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে অংশ নেন টাঙ্গাইল সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজছাত্রী হাজেরা সুলতানা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় হাজেরা সুলতানা টাঙ্গাইল জেলাতে ছাত্র সংগঠিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১১দফা আন্দোলনের সময় শেরপুরের বিভিন্ন স্কুল কলেজ ছাত্র সমাবেশ ও জনসভায় যোগদেন মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা। এই সব সভা সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি ১১ দফার আন্দোলনকে বেগবান করতে সহযোগিতা করেন। 'গণ সংস্কৃতি' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । এই সংগঠন ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনে দিনাজপুরে স্হানীয়ভাবে অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন আজাদী হাই । ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনে অংশ নেন ছাত্রলীগ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার মহিলা সম্পাদিকা আমিনা বেগম মীনা। এ সময় পাকিস্তানী সরকারের অত্যাচারে তৎকালীন ছাত্র সংসদের (সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয়) ছাত্র নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকায় আমেনা বেগম নিজ দায়িত্বে ও নেতৃত্বে সহকর্মীদের সহায়তায় আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনে রিজার্ভ পুলিশ দ্বারা অনেক ছাত্রীসহ তিনি নির্যাতিত হন।[৭০]

২৫ জানুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকার নাখাল পাড়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন আনোয়ারা খাতুন ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু।[৭১] ২৬ জানুয়ারী ঢাকায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য আইন থাকাকালীন সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্ততঃ তিনজন নিহত হয় এবং বহুলোক আহত হয়। ২৪ জানুয়ারীর পরথেকে আন্দোলন পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে ও বিস্তার লাভ করে। ছাত্র সমাজ ছিল এ ক্ষেত্রে উদ্দ্যোক্তা। প্রতিদিন প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনতা পুলিশ সংঘর্ষের এবং পুলিশের গুলিতে নিহত হবার খবর আসতে থাকে।

২৭ জানুয়ারী চট্টগ্রামে সর্বদলীয় ছাত্র সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে বক্তব্য রাখেন খালেদা খানম, দীনা জাহেদ ও হামিদা চৌধুরী। ২৮ জানুয়ারী কৃষ্ণদিবস পালন উপলক্ষে চট্টগ্রামে ছাত্রীরা খালেদা খানমের নেতৃত্বে বিরাট মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে ছাত্রীরা জে.এম.সেন হলে একটি সভা করেন। এ সভায় বক্তব্য রাখেন তাসমিন আরা, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম, স্কুল ছাত্রী নিশাত পারভীন, সাবেরা শবনম, নাজনীন জাহান, আয়শা বেগম, শিরীন কামাল ও রাশেদা খানম। ১ ফেব্রুয়ারী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। ৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে ১১ দফা আদায়ের লক্ষ্যে শুরু হয় ছাত্র ধর্মঘট। চট্টগ্রামে নারীদের মধ্যে আরো অংশ গ্রহণ করেন স্বপ্নাদত্ত চৌধুরী, দিল আফরোজ ও বেগম মুশতারী শফি।[৭২]

মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা ফরিদা আক্তার নারায়ণগঞ্জে গণভ্যুত্থানের সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। খোলা জিপে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে শহরময় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। ১১ দফার আন্দোলনে অংশ নেন দীপা ইসলাম। তোলারাম কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে দীপা ইসলাম ১১ দফার দাবীতে প্রতিটি মিছিল, মিটিং এ অংশ নেন। ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনে অংশ নেন লক্ষ্মী চক্রবর্তী। গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলিতে নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় স্বেচ্চাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন লক্ষ্মীচক্রবর্তী।[৭৩]

২৮ জানুয়ারী পুলিশের গুলির প্রতিবাদে শোক মিছিলে কালো পতাকা হাতে মিছিলে অংশ নেন কিংবদন্তী নেত্রী মনোরমা বসু (মাসীমা)।[৭৪] ৩১ জানুয়ারী (১৯৬৯) 'ডাক' আয়োজিত শোক দিবস উপলক্ষে বার লাইব্রেরী হলে এক সভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেত্রী আমেনা বেগম।[৭৫]

রংপুরের ইতিহাসে এই প্রথম কালো ব্যাজ পরিহিত তিনশত নারী রংপুর শহরের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রর্দশন ও বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে সরকারের নির্যাতন ও দমন নীতির প্রতিবাদ জানায়। ২ ফেব্রুয়ারী সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সিলেটের নারী সমাজ একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সকল রাজবন্দী ও ছাত্রবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দানের দাবী জানান।[৭৬] সিলেটে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে মিছিল, মিটিং এবং জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। প্রীতি রানী দাশ পুরকায়স্থ, উষাদাশ পুরকায়স্থ, এবং দিপালী চৌধুরী।[৭৭]

১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খাঁন তাঁর বেতার ভাষণে বিরোধী দলের নেতাদের সাথে "গোলটেবিল বৈঠক" প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুবের ঢাকা আগমন উপলক্ষে "কৃষ্ণদিবস" হিসাবে পালন করা হয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ঢাকায় কারফিউ হবে জানতে পেরে সকাল ১০ টায় শহীদ মিনার থেকে নারী সমাজের উদ্যোগে গণহত্যা, ব্যাপক ধরপাকড় ও লোমহর্ষক দমননীতির প্রতিবাদে এক বিশাল মিছিল বের করা হয়। শহীদ মিনারে জমায়েতে তারা মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। মহিলাদের মিছিলটি হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর হয়ে বাহাদুরশাহ পার্কে এসে থামে। পর্দানশীল নারীরাও এ মিছিলে অংশ নেন।[৭৮] পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে খুলনার মহিলারা একটি শোভাযাত্রা বের করে এতে স্কুলের ছাত্রীরাও অংশ নেয়।[৭৯] 'কৃষ্ণদিবস' উপলক্ষে রাজশাহীতে ও মহিলারা এক মিছিল বের করেন।[৮০]

৯ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'শপথ দিবস' পালন উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ১১ দফার আন্দোলন আপোষহীন ভাবে চালিয়ে নেবার শপথ গ্রহণ করে। তাঁরা আরো জানায় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সহ সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার সহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে, গণ আন্দোলনে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এসব দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলের নেতাদের গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হতে দেয়া হবেনা। এ জনসভায় ছাত্রীরাও যোগ দেয়।

১০ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) গঠিত হয় নারী সংগ্রাম পরিষদ। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার, নানা স্তরের মানুষ নিজ নিজ দাবীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে স্বাধীকারের দাবী জানায়, তখন রাজনৈতিক দলমত ও আর্দশের উর্ধ্বে সকল শ্রেণী ও স্তরের মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান নারী সংগ্রাম পরিষদ'। এই সংগ্রাম কমিটির নেত্রী ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, আহ্বায়িকা মালেকা বেগম। বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ছাড়া নির্দলীয় সমাজসেবী ও গৃহবধুগণও ছিলেন সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। বদরুন্নেসা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দিন, আমেনা

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ, নূরজাহান মোর্শেদ, সেলিনা বানু, নূরজাহান কাদের, সারা আলী, রাজিয়া বানুর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আয়শা খানম, ফওজিয়া মোসলেম, মাখদুমা নার্গিস, কাজী মমতা হেনা, মুনিরা আক্তার প্রমুখ ছাত্রীনেত্রীদের ভূমিকা ছিল প্রধান।[৮১]

১৪ ফেব্রুয়ারী 'ডাক' এর আহবানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগম। আমেনা বেগম তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, "ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক-জনতার সংগ্রামের বলেই জনগণের ন্যায্য অধিকার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। মুজিবসহ সকল রাজবন্দী মুক্তি লাভ করবে।"[৮২]

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকা সেনানিবাসে ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। এ সংবাদে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পরে। ১৬ ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হকের জানাজা শেষে মিছিল হয়। সে মিছিলে মহিলা অংশের নেতৃত্বে দেন আমেনা বেগম। ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। এ সংবাদ ঢাকায় পৌছালে জনগণ সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাজশাহীর জনগণও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মিছিলে মহিলাদের নেতৃত্ব দেন জিনাতুন নেসা তালুকাদার। বিশেষ করে তিনি মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।[৮৩]

১৮ ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্যাতনের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য যে মিছিল বের করেন তাতে অংশ নেন ছাত্রইউনিয়নের অন্যতম নেত্রী জাকিয়া আখতার। মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন জাকিয়া আখতার, বিথী (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের স্ত্রী) ও মনোয়ারা। এই মিছিল কিছুদুর অগ্রসর হবার পরই সেনাবাহিনীও পুলিশের নির্বিচারে গুলিতে নিহত হন ডঃ শামসুজ্জোহা। মিছিলের সম্মুখে থেকেও জাকিয়া আখতার ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।[৮৩]

১৮ ফেব্রুয়ারীর পর ঘটনা স্রোত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর থেকে সরকার একটু একটু করে পিছিয়ে আসতে থাকে। ১৯ ফেব্রুয়ারী গোলটেবিলের চেষ্টা নেয়া হয় কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। অভূতপূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সরকার বুঝতে পারে যে, গণ আন্দোলনকে আর রোধ করা যাবেনা। ২১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান রেডিওতে ঘোষণা করেন তিনি আর পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে 'ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৮ নামক অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে'- এর ফলে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলাটি বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব সহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী মুক্তি লাভ করেন। অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে মুক্তি পেলেন মতিয়া চৌধুরী। মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৮৪] রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রাখেন বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস তোফাজ্জল হোসেন, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, রেবেকা মহিউদ্দিন, সারা আলী, আজিজা ইদ্রিস, রোকেয়া রহমান কবির, বেলানবী প্রমুখ।[৮৫]১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী ডঃ জোহার হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌনমিছিল বের হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা। [৮৬]

১০ মার্চ(১৯৬৯) রাওয়াল পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক বসে। বৈঠকে শেখ মুজিব ৬ দফা ও ১১ দফা দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতার ৬ দফা ও ১১ দফার বিরোধিতার কারণে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। আর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করেন। ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও পূর্ববাংলার জনগণ আবার নতুন করে পতিত হয় আর এক সামরিক জান্তার কবলে। অবশ্য দেখতে দেখতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন জোরদার হয়। ৭ ডিসেম্বর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীরাও সোচ্চার হন। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হবার জন্য ১৮ জন নারী সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। এঁরা হলেন খোদেজা চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, জোহরা চৌধুরী, আমেনা বেগম, হুরমতুন্নেসা, রেবেকা মহিউদ্দিন, আজিজা ইদ্রিস, বেগম জসিমউদ্দিন, খালেদা খানম, মিসেস শামসুন্নাহার, হোসনে আরা চৌধুরী, মমতাজ আকসাদ, সুলতানা চৌধুরী, মিসেস নবী, মিসেস মাহমুদ, নিসাকাত নাহার ও লায়লা সামাদ।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের নারী সমাজের অংশ গ্রহণের বিষয়টি ক্রমশ জরুরী হয়ে পড়ে। নারী সমাজের মধ্যে শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগায় বন্দী মুক্তি আন্দোলন, রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। এই চেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপুর্ণ। ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নারী সমাজকে একটি সংগঠনে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতি 'পূর্বপাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। যা পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদকিে সাধারণ মহিলারা তাদের নানাবিধ বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত হতে চাইলে ও সমাজে রাষ্ট্রের দমননীতির ফলে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে না পারলেও ঘরে থেকে রাজনৈতিক কাজে যতটুকু সাহায্য করা যায় তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। নারীসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে ষাটের দশকে রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণও বৃদ্ধি পায়। আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী এবং অবিবাহিত কন্যাদের উপর অভিভাবকের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা হত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন বেগম সুফিয়া কামাল ও মতিয়া চৌধুরী। এঁদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার কারণে উভয়ের পরিবারে নানা হয়রানী করা হয়েছে সরকারী তরফ থেকে। কিন্তু এতে তাঁরা দমে যাননি কিংবা আন্দোলন থেকে সরে দাড়াননি। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য অনেক ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং জরিমানা দিয়েছেন। মোট কথা সামাজিক, রাজনৈতিক, সরকারী সবধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েও ছাত্রী ও নারী সমাজ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ষাটের দশকের আন্দোলনে বিশেষ করে ছাত্রীদের গৌরবময় ভূমিকা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের উজ্জ্বল অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*,(ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃ. ১১৯-২১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-২৮।

৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স,১৯৯৯), পৃ. ৭।

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমাদের বাঁচার দাবী ৬দফা কর্মসূচী*,(প্রকাশকঃ আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ,৫১,পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ পূনর্মুদ্রণ,(সেপ্টেম্বর,১৯৬৯, মূল্যঃ ০.২৫ পয়সা) এ থেকে সংক্ষেপিত।

৫. ইত্তেফাক,২০ মার্চ,১৯৬৬।

৬. সাক্ষাৎকার: কাজী রোকেয়া সুলতানা, সেন্ট্রাল রোড,ঢাকা, ১২-০৬-২০০৩; সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,(ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,১৯৯৯), পৃ. XVi

৭. মোহাম্মদ হান্নান,*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*,২য় খন্ড,(ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী,১৯৯৪), পৃ.১৫১।

৮. দৈনিক *সংবাদ*,১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।

৯. দৈনিক *সংবাদ*, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।

১০. দৈনিক সংবাদ, ১৯ফেব্রুয়ারী,১৯৬৬।

১১. দৈনিক *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬।

১২. দৈনিক*ইত্তেফাক*, ৪মার্চ, ১৯৬৬।

১৩. দৈনিক সংবাদ,৮ মার্চ,১৯৬৬।

১৪. সালাহউদ্দি আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ১৩৫-৩৬।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১৬. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, (ঢাকাঃ বর্ণরূপা মুদ্রায়ণ, গ্রন্থে প্রকাশ কাল নেই), পৃ. ৩৭৯।

১৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, পৃ. ২১; ফরিদা আখতার (সম্পাদিত),*শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, (ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯), পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

২০. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৭৩।

২১. National Assembly Of Pakistan, Debates, Official Report, June 20. 1967, P.1801-2.

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪০।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, পৃ. ১৩০।

২৪. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পৃ. ৭৫।

২৫. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৩।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

২৭. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

২৮. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, (ঢাকাঃ প্যাপিরাস ১৯৯৯), পৃ. ৪২।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, পৃ. ৯৫-৯৬।

৩০. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১, ২১৫,২৫৩ ও ২৫৫; ২য় খন্ড,পৃ. ১৯৭ ও ২২৪।

৩২. সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-৫৬।

৩৩. দৈনিক *সংবাদ*, ১সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

৩৪. দৈনিক *সংবাদ*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

৩৫. দৈনিক *সংবাদ*, ১ অক্টোবর, ১৯৬৮।

৩৬. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৭-৬৮।

৩৭. দৈনিক *সংবাদ*, ২৫ নভেম্বর, ১৯৬৮।

৩৮. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।

৩৯. দৈনিক *সংবাদ*, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

৪০. মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊন সত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, (ঢাকাঃ জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৪২।

৪২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃদলিল পত্র, দ্বিতীয় খন্ড*, (তথ্য মন্ত্রনালয়ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), পৃ. ৪০৫-৮।

৪৩. মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পৃ. ৪৯।

৪৪. 'ডাক' (DAC-Democratic Action Committee) গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান ন্যাপ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, এন. ডি. পি, পি. ডি. এম, নেজাম-এ-ইসলাম পার্টি, জামায়াতে উলেমা- ই- ইসলাম পার্টি নিয়ে।

৪৫. দৈনিক *সংবাদ*, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯।

৪৬. প্রাগুক্ত,

৪৭. দৈনিক *পাকিস্তান*, ২১ জানুয়ারী ১৯৬৯।

৪৮. নিগার চৌধুরী, *ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলি*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী,১৯৯২), পৃ. ৫০।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫,২২০ও ২২১।

৫১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৯-২০০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫, ২৪৩-২৪৪।

৫৩. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯ ও ১৯৫।

৫৪. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২১০-২৬৪; ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫-১৪২।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ ও ২৩৪।

৫৬. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৯-২১১, ২৩৯-২৪১।

৫৭. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৩-২৭০।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৬০. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড,পৃ. ১৮৫,২০১-৩।

৬১. দৈনিক *সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারী, ১৯৬৯।

৬২. দৈনিক *সংবাদ*, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯;সাক্ষাৎকার:কাজী রোকেয়া সুলতানা,সেন্ট্রাল রোড,ঢাকা,১২-০৬-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

• মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ১৮৪।

৬৩. সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ১৭১-৭২।

৬৪. দৈনিক *সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৯।

৬৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০,২৭৮।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩, ২৯-৩০, ১০৭,১২৪ ও ২৭৬।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৫৪ ও ১১১।

৬৮. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৫, ২৪৫ ও ২৮১।

৬৯. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৯,২৪১, ২৭৩।

৭০. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩২-৩৯, ১৯৭।

৭১. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, পৃ. ২১২।

৭২. ডঃ নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪২-৪৩।

৭৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ: ২২৫,২৪২ ও ২৯১।

৭৪. দৈনিক *সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৭৫. দৈনিক *সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৭৬. দৈনিক *সংবাদ*, ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৭৭. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬, ১০৭ ও ১৪৮।

৭৮. দৈনিক *সংবাদ*, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯; নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪৩।

৭৯. দৈনিক *সংবাদ*, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৮০. দৈনিক *সংবাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৮১. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৮৪-৮৬।

৮২. দৈনিক *সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।

৮৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৮।

৮৫. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, পৃ. ১৮৫।

৮৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৭।

৮৭. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৩০ সাল থেকে অনুসৃত মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি ভারত উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল তার পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় পাকিস্তান ও ভারত এই দুই রাষ্ট্রে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্তির পিছনে ছিল মুসলিম জাতীয়তা ভিত্তিক চেতনা। পাকিস্তানের পূর্বাংশ বাংলায় ১৯৪৭ সালের পর থেকে পৃথক জাতিসত্তার ভিত্তিতে যে রাজনীতি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দানা বাধতে থাকে তারই পরিণতিতে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নামে এক নতুন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।[১]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এর এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই বাঙালী জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণভাবে বিকাশলাভ করে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হয়। পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ইতিহাসে পাকিস্তানবাসী কখনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সমগ্র দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষিত আইনগত কাঠামোর অধীনে ১৯৭০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্র করে ইয়াহিয়া, ভূট্টো এবং শেখ মুজিবের মধ্যে যে তীব্র সংঘাত শুরু হয় তারই অনিবার্য পরিণতিতে বাংলার সংগ্রামী মানুষ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[২]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য নারী সমাজ সচেতন ভাবে তৎপর ছিল। যদিও আওয়ামী লীগ অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা পত্রে নারীর মর্যাদা, রাজনৈতিক, সামাজিক সমঅধিকার বিষয়ে কোন বক্তব্য ছিলনা। নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি কোন দল। কিন্তু ভোটার নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্য দলে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭০ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসন পদ্ধতির নিয়ম বিধি ১৯৬৫ সালের নিয়ম থেকে পরিবর্তিত হয়। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে ছিল 'প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ৩জন সদস্যা'- পদ সংরক্ষণের আইন। ১৯৭০ সালে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নে সাত (৭) জন মহিলার আসন সংরক্ষিত রাখার আইন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর (১৯৭০) মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে ১২ নভেম্বর (১৯৭০) পূর্ব বাংলার উপকূল অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকরী সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস। এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, বরগুনা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামের এক বিস্তীর্ন প্রান্তর জনমানবহীন এক বিরানভূমিতে পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগনিত মানুষের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। ঘুর্ণিঝড়ের কোন সংকেত বা সতর্কবাণী রেডিওতে প্রচারের অভাবে প্রাণহানির সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। সর্বোপরি ঘূর্নিঝড় পরবর্তী ত্রানকার্য এবং উদ্ধারকার্য পালনে পাকিস্তান সরকার চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। বরং সরকার ও পাকিস্তানী প্রচারমাধ্যম গুলো ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে। পাকিস্তান সরকারের অবহেলা, উদাসীনতা, প্রদেশ বাসীর জানমালের জন্য কোনরূপ দায়-দায়িত্ব বোধের অভাব পূর্ববাংলার শোকার্ত জনগণকে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানে শোক বিহবল পরিবেশে সারা প্রদেশ থেকে ছাত্র, যুবক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে নারীরাও আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। যে সব নারী দূর্গতদের সেবায় এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, বদরুন্নেসা আহমদ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদা খানম প্রমুখ।

ডঃ সুলতানা জামান এর উদ্দ্যোগে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের নারী সমাজ, ডাক্তার ও সমাজ কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রান কাজে অংশ নেন।[৪] মতিয়া চৌধুরী ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চরভাটা, চরজব্বার, চরক্লার্কে দিনের পর দিন রিলিফের কাজ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত ভোলার চর জব্বার ও চরভাটা এলাকায় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ত্রান কাজে অংশ নেন রাশেদা খানম ও তাজুন্নাহার। ওষুধ, দুধ সহ বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন ঘুর্ণি দুর্গত জনগণের মাঝে।[৫]

১৯৭০ এর ভয়াবহ জলোচ্ছাসে খুলনার দুবলার চর ডুবে যাওয়ায় বহু লোক মারা যায়। সে সময় রিলিফ বিতরণের কাজ করেন কৃষ্ণা রহমান। দক্ষিনাঞ্চলের চরসীতায় ত্রান বিতরণের কাজ করেন চরসীতার শিবানী দাস। এছাড়া ত্রান বিতরণের কাজে অংশ নেন শিশির কনা ভদ্র ও তোলারাম কলেজের ছাত্রী দীপা ইসলাম। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে তিনি দূর্গত এলাকায় ত্রান বিতরণ কাজে অংশ নেন।[৬] এছাড়া উষা দাশ, ষোড়শী চক্রবর্তী, হোসনে আরা বেবী, মাজেদা খাতুন, মমতাজ শেফালী প্রমুখ ত্রান কার্যে অংশ গ্রহণ করেন সক্রিয়ভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই ভয়াবহ দুর্যোগকালে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে ঘুর্ণি দূর্গত এলাকা সফর ও ত্রান বিতরণ শেষে ঢাকা ফিরে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্ণনা করেন। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন দূর্গত মানুষের করুণ অবস্থার কথা আর পাকিস্তানী সরকারের দায়িত্বে উদাসীনতা ও ব্যর্থতার কথা। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ববাংলার নিরাপত্তার জন্য যেমন পাকিস্তানী সরকার সামান্যতম উদ্বিগ্ন ছিলনা, তেমনী ১২ নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে যে অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে তাতে পূর্ববাংলার জনগণ স্পষ্ট অনুভব করে যে, পাকিস্তানী সরকার পূর্ববাংলাকে তার উপনিবেশ হিসেবেই মনে করে সুতরাং তারা মুক্ত জনতা হিসেবে জীবন যাপনের অর্থাৎ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

পূর্ব বাংলার প্রতি শাসকশ্রেণীর অবহেলার সঙ্গে নির্মম শোষণের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব। নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি পোষ্টার পাকিস্তানী শাসনের অধীনে বাংলার দুর্গতি, তাদের শোষণ ও বঞ্চনার একটি চিত্র তুলে ধরেছিল। এই পোষ্টারটি আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন নিশ্চিত করে তোলে। 'সোনার বাংলা শশ্মান কেন' এই প্রশ্ন তুলে এই পোষ্টারে পাকিস্তানের বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। পোষ্টারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

সোনার বাংলা শশ্মান কেন

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খরচ	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
আমদানী	২৫%	৩৫%
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
চাউল (প্রতি মণ)	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা (প্রতি মণ)	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তেল(প্রতি সের)	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
সোনা (প্রতি তোলা)	১৭৫ টাকা	১৩৫ টাকা

[উৎসঃ আহমদ মাযহার, বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঢাকা বিউটি বুক হাউস, ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃ. ৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

দেশের এই ভয়ানক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আসন্ন নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য কোন কোন দলের পক্ষ হতে দাবী উঠলে ও আওয়ামী লীগ নির্ধারিত দিনেই নির্বাচনের পক্ষে মত ব্যক্ত করে। নির্বাচন না পিছিয়ে উপদ্রুত এলাকায় পরবর্তী সময়ে নির্বাচন পরিচালনার পক্ষে মত দেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭০ সালের ৭ এবং ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সর্বত্র যথারীতি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের ত্রিশটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'ছয়দফা' গণভোট ইস্যুর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে ছাত্রলীগ ৪ ডিসেম্বর তারিখে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক জনসভায় আওয়াজ তোলে 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্রধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর; গণবাহিনী গঠন কর বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। এ পটভূমিকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে দুটি আসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত আসনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করে।

সব পর্যায়ের নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদের সর্বমোট ৩১৩ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭, পিপলস্ পার্টি ৮৮, ওয়লীপন্থী ন্যাপ ৭, জামাতে ইসলাম ৪, পিডিপি ১ ও নির্দলীয় প্রার্থীরা ১৪ টি আসন পায়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, মোট ৩১০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮, পিডিপি ২, ওয়ালীন্যাপ ১, জামাতে ইসলাম ১, নেজামে ইসলাম ১ ও নির্দল প্রার্থীরা ৭টি আসন লাভ করে।[৭]

জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগের ৭ জন সদস্যা সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হন। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে বদরুন্নেসা আহমদ, নূরজাহান মুরশিদ, তসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আক্তার ডলি ও মমতাজ বেগম।[৮]

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কেননা নির্বাচনের প্রচারাভিযানের সময় শেখ মুজিব বার বার ঘোষণা করেছেন যে, নির্বাচন কে তিনি ছয় দফার প্রশ্নে গণভোট বলে মনে করেন। আর ছয় দফা ইতিপূর্বেই বাংলার জনগণের দ্বারা সমর্থন পেয়েছিল। ১৯৭০'এর এই নির্বাচনে লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে প্রচারণার কাজে অংশ নিয়েছেন বহু নারী। নির্বাচনী প্রচারে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জিনাতুন্নেসা তালুকদার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের দল আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন আদায় ও দলকে বিজয়ী করতে রাজশাহী শহর ও গ্রামে ব্যাপক প্রচারণা চালান। ঢাকাতে বেবী মওদুদ, ফরিদা খানম সাকী এবং যশোরে রওশন জাহান সাথী নির্বাচনী প্রচারকাজে অংশ নেন।[৯]

বদরুন্নেসা আহমদ নির্বাচনী প্রচারণা চালান। তিনি এ নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এম এন এ নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও অঞ্চল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রতিদ্বন্দী ছিলেন আমেনা বেগম। তেজগাঁও অঞ্চলের মহিলারা নৌকা মাথায় করে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। সাজেদা চৌধুরী সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রচারে কাজ করেন। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সাত জন মহিলার মধ্যে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। তেজগাঁও এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন সাহারা খাতুন। সাহারা খাতুন ঘরে ঘরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচারণা চালান। তেজগাঁও এ বঙ্গবন্ধু ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন জীবন প্রভা বিশ্বাস, রওশন আরা বেগম, টাঙ্গাইলে খাদিজা সিদ্দিকী, বেগম শামসুন্নাহার, হাসিনা পারভীন এবং আফরোজা হক রীনা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আফরোজা হক রীনা পুরনো ঢাকার নারিন্দা এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[১০]

নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ এর নির্বাচিত সদস্যগণ রমনার রেসকোর্স মাঠে এক ঐতিহাসিক জনসভায় শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতাদান কালে শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয়দফার' ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপর জোর দেন। অপর দিকে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় ও ছয়দফার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিবাদী মহল ও সামরিক চক্র দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং সুস্পষ্ট রায়কে বানচাল করার জন্যে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল সৃষ্টি করতে থাকে। জুলফিকার আলী ভূট্টো ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের এক মহাপরিকল্পনা শুরু করেন যদিও বাইরে ইয়াহিয়া খান দেখাচ্ছিলেন যে তিনি নির্বাচনের রায় মেনে নিতে প্রস্তুত। আর ভেতরে ভেতরে ভূট্টোকে দিয়ে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করছিলেন।[১১]

নির্বাচনের পরে ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করেন এবং ১২ ও ১৩ জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দুই দফা বৈঠকে মিলিত হন। প্রথম দিনের আলোচনা ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরের দিন দ্বিতীয় দফা আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ,

Dhaka University Institutional Repository

জনাব মনসুর আলী, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ও জনাব কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান যে, "আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট খুব শীঘ্রই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে সম্মত হয়েছেন।" ঢাকায় তিন দিন অবস্থান শেষে করাচী যাত্রার সময়ে তেজগাঁও বিমান বন্দরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, 'দেশের ভাবী প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁর সঙ্গে আলোচনা সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা পরাপুরি সঠিক।' ঢাকা থেকে ফিরে ইয়াহিয়া খান ১৭ জানুয়ারী লারকানায় জুলফিকার আলী ভূট্টোর বাসভবন 'আলমুরতাজায়' তাঁর সাথে এক দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হন। এরপর ২৭ ও ২৮ জানুয়ারী ভূট্টো তার দল বল সহ ঢাকায় আসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান জানান যে ' শাসনতন্ত্র হবে ছয়দফা ভিত্তিক' এবং তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানান। ভূট্টো আরো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে কালক্ষেপন করেন।

৩০ জানুয়ারী দুইজন কাশ্মীরী যুবক ভারতীয় যাত্রীবাহী ফোকার বিমান ছিনতাই করে তা লাহোর বিমান বন্দরে ধ্বংস করে দেয়। ফলে ৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ভারত সরকার ভারতের উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। নির্বাচনের ফলাফল বানচাল করার উদ্দেশ্যে ভারতের সঙ্গে সংকট সৃষ্টি করার জন্যই সম্ভবত ঐ বিমান ছিনতাই ও ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় অধিবেশন আহ্বানের জন্য পূর্ব বাংলা থেকে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, ভারতের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে ও তা ধামাচাপা দেয়া ইয়াহিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় জানানো হয় যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকাস্থ প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে ৩ মার্চ বুধবার সকাল নয়টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন।[১২]

কিন্তু ষড়যন্ত্রের এখানেই শেষ নয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) ভূট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, আওয়ামী লীগের ছয়দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তাঁর দল আসন্ন জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেনা। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়াদি' আলোচনার জন্য ভূট্টোকে আমন্ত্রণ জানান। এবং ১৯৭১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাওয়াল পিন্ডিতে ভূট্টো ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী এক বৈঠক হয়। ১৭ জানুয়ারী ইয়াহিয়া - ভূট্টোর

Dhaka University Institutional Repository

'লারকানা বৈঠক' এবং ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে 'রাওয়াল পিন্ডি বৈঠক' বাঙালীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ক্রমবর্ধমান পর্যায়। কেননা রাওয়াল পিন্ডি থেকে করাচী গিয়ে ভূট্টো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, 'জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা তাঁর নেই।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপর্যুক্ত সতর্কবানী সত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের অবসান হয় না, ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে করাচী প্রেসিডেন্ট হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় ভূট্টো-ইয়াহিয়ার মধ্যে পুনরায় শলাপরামর্শ হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) তারিখে ঢাকা শিল্প ও বনিক সমিতির এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানান। একই দিনে লাহোরে এক জনসভায় ভাষণ দান কালে ভূট্টো হুমকি দেন যে, 'তাঁর দলের কোন সদস্য যদি পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করে তাহলে দলের কর্মীরা ঐ সদস্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তিনি আরো বলেন 'জাতীয় পরিষদের সদস্যরা যদি পিপলস পার্টির অনুপস্থিতিতেই পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচনের কাজ চালিয়ে যান, তাহলে তাঁর দল খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করবে'।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সুস্পষ্ট রায়কে পদদলিত করার জন্যে, বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাসীনদের ষড়যন্ত্রের পরিনামে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন-

> ...আমি আমাদের জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ ৩ মার্চ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলাম। বিগত কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ঐক্যমতে পৌছবার পরিবর্তে আমাদের কোন কোন নেতা অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন।.....
>
> সংক্ষেপে বলতে গেলে

Dhaka University Institutional Repository

> পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনা পূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অতএব আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[১৪]

ইয়াহিয়া খান কর্তৃক বেতারের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ঢাকা সঙ্গে সঙ্গে একটি বিক্ষুব্ধ মিছিল-নগরীতে পরিণত হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা, দোকান পাট, যানবাহন সব বন্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্লাব, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন সহ সর্বস্তরের জনগণ রাস্তায় নামে। চারিদিক থেকে জঙ্গী মিছিল হোটেল পূর্বানীর সামনে এসে জড়ো হয়। পূর্বানী হোটেলে তখন আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সভা চলছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতাকে ধৈর্য হারা না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু জনতা অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী জানায়। ঐ দিন বিকেলে পল্টন ময়দানের এক বিশাল জনসভায় তোফায়েল আহমদ, আব্দুল মান্নান, সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. আব্দুর রব ও নুরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ ছাত্র ও শ্রমিক নেতা বক্তৃতা করেন। তাঁরা জনগণকে শেখ মুজিবের নির্দেশ মত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। শেখ মুজিবুর রহমান হোটেল পূর্বানীতে সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ঢাকা শহরে হরতাল এবং বুধবার সারাদেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রবিবার রেসকোর্সে জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের এই প্রস্তুতি পর্বে নারীরাও সংগঠিত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা করে মুসলিম ছাত্রী সংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা এক যুক্ত বিবৃতিতে অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানান।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১ মার্চ ১৯৭১ ওয়ালী ন্যাপের নেত্রী ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেত্রী মতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানে এক পথসভায় বলেন, "আজ আর কোন এক দল নয়, কোন মত নয়, নেই কোন ভেদাভেদ। শেখ সাহেব আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, আজ আর ন্যাপ নেই, আওয়ামী লীগ নেই, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে হবে। এখন থেকে পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গী ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই করবে।"[১৬]

গণপরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণায় শুধু ঢাকাই নয় চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।[১৭]

২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। জঙ্গী মিছিলে স্বাধীনতার দাবীতে বিক্ষোভরত জনতার উপর সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ এবং বেয়নেট চার্জ করে। এতে অন্ততঃ ৯ ব্যক্তি হতাহত হয়। ২ মার্চ 'জাতীয় লীগের' উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে এবং ন্যাপ' এর উদ্দ্যোগে পল্টন ময়দানে দুইটি প্রতিবাদ সভা হয়। ন্যাপের সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন মতিয়া চৌধুরী।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্রসভাতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে- যে কোন ত্যাগ স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। এই সভাতেই সর্বপ্রথম সবুজ পটভূমিকার উপর লাল বৃত্তের মাঝখানে সোনার বাংলার সোনালী মানচিত্র সম্বলিত 'স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয়' পতাকা উত্তোলন করেন আ. স.ম আব্দুর রব।

বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রসভাতে অনেক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন আয়শা খানম, কাজী রোকেয়া সুলতানা, রীনা খান, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, বেগম শামসুন্নাহার, নাসিমুন আরা হক মিনু, বেগম শামসুন্নাহার ইকো প্রমুখ।[১৮]

২ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে বেতার মারফত কার্ফ্যু জারী করা হয়। ৩ মার্চ তারিখে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়, জনতা পূর্ব রাত্রির অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন এলাকায় আরও শক্তিশালী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। রামপুরায় ২ মার্চ ব্যারিকেড সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ১৮ বছর বয়স্ক জঙ্গী ছাত্রনেতা ফারুক ইকবাল শহীদ হন। ৩ মার্চ সকাল ১১ টায় গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্দ্যোগে বটতলায় ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিক্ষকদের এক প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতালের দিনে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে হামলা, সংঘর্ষে চট্টগ্রামে ঐ এক দিনে প্রায় চারশত লোক হতাহত হয়।[১৯]

৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২ জন নেতাকে ১০ মার্চ ঢাকায় এক বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান, যাঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মওলানা মুফতি মাহমুদ, আব্দুল ওয়ালী খান, মওলানা শাহ আহমদ নুরানী, আব্দুল গফুর আহমদ, মোহম্মদ জামাল রেজা, নুরুল আমীন, মেজর জেনারেল জামালদার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান।

পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ সরূপ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ অপরাহ্নে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে ৫ টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল। ঐ সময়ে কোর্ট কাছারী, সরকারী অফিস, কলকারখানা, রেল, স্টীমার, বিমান ও সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান বন্ধ। হরতাল পালনকারী গরীব দুঃখীদের সাহায্য করার জন্যে বেলা ২ টার পরে রিক্সাওয়ালাদের বেশী পয়সা দেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ জানান। হাসপাতালে গুলির আঘাতে আহতদের জন্যে ব্লাডব্যাংকে রক্তদানের জন্যেও তিনি জরুরী আবেদন জানান। সাংবাদিকদের তিনি নির্ভীকভাবে সংবাদ পরিবেশন এবং কোন বিধি নিষেধ না মানার আহ্বান জানান। শেখ সাহেব ঐ সভায় ঘোষণা করেন যে, কয়েক দিনের মধ্যে যদি সরকারী মনোভাব পরিবর্তিত না হয় তাহলে ৭ মার্চ তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন।[২০] এদিন থেকে অহিংস অসহযোগের ঘোষণা দেন।

৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় যোগদানকারী জনতা স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাশা করেছিল। সে প্রত্যাশা কিছুটা পূরণ করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ সমন্বয়ে। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত রূপে ঘোষণা করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।[২১]

৩ মার্চ (১৯৭১) সারা দেশের মত যশোরের জনগণ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভে অংশ নেন মমতাজ বেগম ও ফিরোজা খানম। মমতাজ বেগম সহ ছাত্রলীগের অপরাপর কর্মীরা যশোরের কালেক্টরেট ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের শপথ নেন। এ শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন ফিরোজা খানম। শপথ অনুষ্ঠান শেষে ফিরোজা খানম, মমতাজ বেগম সহ উপস্থিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ গণমিছিল বের করেন। এই গণ মিছিল টেলিফোন ভবনের কাছে আসতেই সামরিক জান্তারা মিছিলে গুলি চালায়, এতে নিহত হন চারুবালা কর। ছাত্র সুলতান মাহমুদ লাবলুসহ আহত হয় অনেকে। এতে মিছিল আরো জঙ্গীরূপ ধারণ করে এবং মিছিল শেষে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। পরের দিন মিছিলেও অংশ নেন ফিরোজা খানম।[২২]

৪ মার্চ ঢাকা ও প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়; বাংলার মুক্তি আন্দোলনের চতুর্থ দিনটি পূর্ণ হরতাল, বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রা, গায়েবানা জানাজা, সভা ও স্বাধীনতার শপথ নেবার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ৪ মার্চ এর পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ পত্রে বলা হয়, "কলকারখানায় বাজছেনা বাঁশী। মানুষ নেই অফিস আদালতে। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বেসামরিক শাসনব্যবস্থা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধীকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে মানুষ খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়-বিক্ষুব্ধ এই বাংলাদেশে।"[২৩]

এদিন বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা এক বিবৃতিতে জানান যে, ২ মার্চ থেকে তাঁরা বেতার ও টেলিভিশন এর কোন অনুষ্ঠান করছেন না। তাঁরা ঘোষণা করেন, " যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত শিল্পীরা বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।"[২৪]

৪ মার্চ সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যায় জিমনেসিয়াম মাঠে এক ছাত্রী সমাবেশ হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও মেয়েদের কি করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন মুনিরা আক্তার ও কাজী রোকেয়া সুলতানা। এ সময় সর্বসম্মতি ক্রমে ঘোষণা করা হয় যদি প্রয়োজন হয় তবে অস্ত্রের বিরুদ্ধে মেয়েরা ও অস্ত্র হাতে নেবে। ৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) আয়োজিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এক জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বাংলার স্বাধিকারের সংগ্রামকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক কৃষক - ছাত্রজনতাকে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

৫ মার্চ শিল্প এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের ফলে বহু শ্রমিক হতাহত হয়। ৫ মার্চ ঢাকায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক লাঠি মিছিল বের করা হয়। ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এই লাঠি মিছিলে নেতৃত্ব দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রী ও এই লাঠি মিছিলে শরিক হন।[২৬] এই দিন ঢাকার লেখক ও শিল্পী বৃন্দ জনতার সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং শহীদ মিনারে ডঃ আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার শপথ নেন।[২৭]

৫ মার্চ নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি (আপওয়া, পূর্বাঞ্চল শাখা) সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করেন। বিবৃতিতে কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষের মত বাঁচার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থে যারা জীবন দান করেছেন তাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। দেশের স্বাধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশের নারী সমাজের প্রতি যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানায় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি।[২৮]

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে দুস্কৃতিকারী আখ্যা দেন এবং ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কথা ঘোষণা করেন। এই দিন লেপ্টেনান্ট জেনারেল টিক্কাখান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। জাতীয় পরিষদের ঘোষণা ছিল বস্তুতপক্ষে একটা ভাঁওতা মাত্র। ৬ মার্চ ও অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

৬ মার্চ (১৯৭১) ৩ টায় শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার বিক্ষোভ সভা হয়। সভা শেষে বিক্ষোভ মিছিল বায়তুল মোকাররমে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সাথে মিলে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়।[২৯]

৬ মার্চ বেতার, টিভি, এবং চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক প্রতিবাদ সমাবেশে স্বাধীনতা আন্দোলণের শপথ গ্রহণ করেন। কণ্ঠ শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু এতে সভাপতিত্ব করেন। এই সমাবেশে বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খান আতাউর রহমান পাড়ায় পাড়ায় গণসঙ্গীত শিল্পী দল গঠন করে পথে পথে গণ জাগরণের গান গাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন।[৩০]

পূর্ববাংলার ৩৩ জন চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা অভিনেত্রী ও সঙ্গীত পরিচালক এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ন্যায্য দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সাথে থাকবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন আব্দুল জব্বার, খান আতাউর রহমান ও অন্যান্যের সাথে রোজী চৌধুরী, শবনম, রোজী সামাদ, কবরী, সুজাতা. সুচন্দা ও সুলতানা জামান।[৩১]

৬ মার্চ কবি সুফিয়া কামাল এর সভানেত্রীত্বে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে। পূর্ব বাংলার নারী সমাজ এই সভা থেকে গণ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায়। দৈনিক সংবাদ এ প্রকাশিত এই বিষয়ক খবরটি নিম্নরূপঃ

'গত কাল (শনিবার) ঢাকা শহরে মা-বোনেরা গণ আন্দোলনের সাথে সংহতি ঘোষণা করে সভা ও মিছিল করেন। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ এই সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। বিকাল ৩ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এক প্রস্তাবে নিরীহ ছাত্র জনতা শ্রমিকের প্রতি গুলিবর্ষণ ও হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন ও প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে শান্তি ও শৃংখলার সাথে স্বাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সকল গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন সংগঠনের সহ-সভানেত্রী মিসেস সারা আলী, আহবায়িকা মালেকা বেগম, অধ্যাপিকা সেলিনা, নার্স কনিকা ভট্টাচার্য এবং মনোয়ারা বিবি। প্রত্যেক বক্তাই এদেশের বর্তমান পরিস্থিতিরি জন্য, গণহত্যার জন্য শাসক গোষ্ঠীকেই দায়ী করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান'।[৩২]

মূলতঃ সত্তরের নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করে, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত এবং বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্য পক্ষেই এগিয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্দ্যানে বিক্ষুব্ধ জন সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।" তিনি এই রেসকোর্স ময়দানেই ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বাংলার জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর এ জনসভায় সারা বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ যোগ দেয়। ছাত্র জনতার সাথে নারীরাও ব্যাপক সংখ্যায় সভায় যোগ দেয়। 'এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে' [সূত্রঃ 'সেইসব দিন' মুনতাসীর মামুন]। রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে রোকেয়া হলের কয়েকশ মেয়ে মিছিল নিয়ে উপস্থিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন আভা মন্ডল। আভা মন্ডল এই মিছিলে অংশ নেন এবং জনসভায় যোগ দেন। মিছিল সহকারে গিয়ে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনেন ১৯৭০ এ নির্বাচিত সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী মমতাজ বেগম হলে, পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের সংগঠিত ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সাথে।[৩৩]

৭ মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় নারীদের মিছিল নিয়ে যোগদেন উম্মেহানী খানম। ৭ মার্চ এর জনসভায় পুরুষের পাশাপাশি অনেক নারী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। এরকম একজন স্বেচ্ছাসেবী হলেন ফোরকান বেগম।[৩৪]

শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী ৮ মার্চ থেকে প্রতিটি গৃহশীর্ষে কালোপতাকা উত্তোলন করা হয়। সরকারী, আধাসরকারী অফিস-আদালত, কোর্ট কাচারী বন্ধ থাকে। তবে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাংলাদেশের ভেতরে টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা, বিদেশে সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে চালু থাকে। ব্যাংক ও চালু থাকে তবে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার বন্ধ রাখা হয়। প্রদেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সব রকম কর প্রদান ও স্থগিত রাখা হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগিতা দেখানো হয়। এ দিন লেপ্টেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান প্রাদেশিক গভর্ণর হিসেবে শপথ নিতে চাইলে পূর্ববাংলার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাতে অস্বীকৃতি জানান। কোন বিচারপতি টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে রাজী হলেন না।[৩৫]

৯ মার্চ (১৯৭১) মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে একটি জনসভায় ভাষণ দেন' তিনি ঘোষণা করেন "শেখ মুজিবের নির্দেশিত ২৫ মার্চের মধ্যে কোন কিছু করা না হলে আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল গণ আন্দোলন শুরু করব"। ভাসানী শেখ মুজিবের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে জনগণকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান। এই সভায় জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান অবিলম্বে শেখ মুজিবকে জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানান।[৩৬]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার ঘোষণার পর ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার সশস্ত্র আগমন শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী ১৮ দিন এদেশের নারী সমাজ বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট করেনি। প্রতিদিন মহিলাদের সভা,

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ, মিছিল লেগেই ছিল। ৮ মার্চ থেকে ভবনে ভবনে কালো পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচী সফল করেছে মেয়েরা।একাজে নারী সমাজ ও ছাত্রসমাজ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। নারী কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলকে বুঝিয়েছেন 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলা স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ'। এবং এ দায়িত্ব পালনে নারী সমাজ প্রধান ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়।[৩৭]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে সভানেত্রী সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তান মহিলা পরিষদ সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। শুধু মহিলা পরিষদই নয় অন্যান্য মহিলা সংগঠণ ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। '৯ মার্চ চট্টগ্রামে জে এম সেন হলে মহিলা আওয়ামী লীগের সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন মেহেরুন্নেসা, বেগম সরাফত উল্লাহ, বেগম নাজনীন, বেগম কামরুন্নাহার, বেগম মুছাখান, কুন্দপ্রভা সেন প্রমুখ'। ১১ মার্চ চট্টগ্রামে পূর্বপাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে নগরীতে বিরাট মিছিল হয়। বিকেলে মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জে এম সেন হলে এক বিরাট সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন ডাঃ নুরুন্নাহার জহুর, মিসেস সেলিনা রহমান, রিজিয়া সুলতানা, গুলশান আরা, জাহানারা আঙ্গুর, সাবেরা শবনম, উম্মে সালমা, মর্জিয়া ইসলাম ও খালেদা খানম প্রমুখ। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১২ মার্চ শহরে লাঠি মিছিল হয়।[৩৮]

১৪ মার্চ ১৯৭১ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক সংগ্রাম শিবিরের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সভায় বক্তৃতা করেন খোন্দকার ইলিয়াস, দাদা ভাই রোকনুজ্জামান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও লায়লা সামাদ।[৩৯]

১৫ মার্চ (১৯৭১) বাংলার জনগণ ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দাবীতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ৩৫ টি বিধি জারী করেন। এবং দেশ শাসন ব্যাপারে জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করতে লাগলেন।[৪০]

১৫ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বাহিনীর প্রায় সমুদয় জেনারেলকে নিয়ে কঠোর সামরিক প্রহরায় ঢাকা আগমন করেন। এদিন 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তির প্রতি হুষিয়ারী উচ্চারণ করে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

১৫ মার্চ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অপর এক সভায় মালেকা বেগম বলেন, "শোষণ মুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

দলমত নির্বিশেষে নারী পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সভায় আরো বক্তৃতা করেন ডাঃ মাখদুমা নার্গিস ও আয়শা খানম।"[৪১]

১৫ মার্চ চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক বৃন্দ স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সমর্থণ জানান। এবং নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য সকল চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় ডাঃ মান্নান, ডাঃ টি আলী ও অন্যান্যের সাথে বক্তৃতা করেন ডাঃ নাজমুন নাহার।

এ দিন টেলিভিশন নাট্য শিল্পীরা আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে একসভায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, গণ আন্দোলনের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করা হবে না। সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন আলেয়া ফেরদৌস ও রওশন জামিল।[৪২]

১৫ মার্চ (১৯৭১) খুলনার ছাত্রনেত্রী হাসিনা বানু শিরিন এক বিবৃতিতে বলেন, স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলাদেশের নারীগণ পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবে।[৪৩]

১৬ মার্চ ঢাকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক আরম্ভ হয়। এবং সারা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি এই বৈঠকের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তবে অসহযোগ আন্দোলন ও পুরোদমে চলতে থাকে। প্রতিদিনের মত এদিনও সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল বের হয় এবং তাদের প্রধান দাবী ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ চলবেনা। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের নির্দেশে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সকল শাখা কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ট্যাক্স আদায় করার জন্য বিশেষ একাউন্ট খোলে। অন্যদিকে ঢাকা সহ সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের উপর নির্যাতন চালায় পাক সামরিক বাহিনী। এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সেনাবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রদান করে। এতে তাঁরা ইয়াহিয়া খানের প্রতি সৈন্য ফিরিয়ে নিতে আহ্বান জানায়।

১৬ মার্চ শহীদ মিনারে জমায়েত হয় চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট এই তিন দশকের সংস্কৃতি সেবীরা। মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও মিছিলের অগ্রভাগ তাদেরই। পূর্ব পাকিস্তান লেখক শিবিরের বিরাট ব্যানারের একদিকের দন্ড ধরে লায়লা সামাদ এবং অন্যদিকে কাজী রোজী ও রাবেয়া খাতুন। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সুফিয়া কামাল, কবি মেহেরুন্নেসা এবং নতুন লেখিকা সুফিয়া খাতুন।[৪৪]

১৭ মার্চ মহিলা আওয়ামীল লীগের সভানেত্রী বেগম বদরুন্নেসা আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ শেষে ঢাকার নারী সমাজ এক জঙ্গী লাঠি মিছিল বের করে।[৪৫]

১৮ মার্চ ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংসদের সভানেত্রী বেগম শাহাজাদী হারুনের সভানেত্রীত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জাতীয় সংকটকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার আন্দোলনের বীর সেনানীদেরকে নির্বিচারে হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী বেগম হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনাব খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কনিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এদিন মাইজদী কোর্ট এর টাউন হলে মহিলাদের একসভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার এই সংকটময় মুহূর্তে মহিলাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। আর্জুমান্দ বানুকে আহ্বায়িকা নির্বাচিত করে ১৭ সদস্যা বিশিষ্ট একটি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[৪৬]

১৮ মার্চ চট্টগ্রামের জে এম সেন হলে মহিলা পরিষদ ও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সভা হয়। চট্টগ্রাম মহিলা পরিষদের আহ্বায়িকা উমরতুল ফজল সভায় সভানেত্রীত্বে করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালেকা বেগম। সভায় বক্তৃতা দেন মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার যুগ্ম আহ্বায়িকা হান্নানা বেগম, যুগ্ম আহ্বায়িকা বেগম মুশতারি শফি, সীমা চক্রবর্তী, দিল আফরোজ খানম, জাহানারা আঙ্গুর, আরতি দত্ত, ননী রক্ষিত, নুরুন্নাহার জহুর, রমাদত্ত, কুন্দ্রপ্রভা সেন প্রমুখ।[৪৭]

১৮ মার্চ 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' এর এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের মুক্তিকামী জণগণের সমর্থন কামনা করা হয়। ১৯ মার্চ ঢাকার জয়দেবপুরে এবং গাজীপুরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাথে বাঙালী সৈনিক ও জনসাধারণের সাথে সংঘর্ষ হয়। এদিন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় দফা বৈঠক হয়। বঙ্গবন্ধু জয়দেবপুর ও টঙ্গী এলাকায় পাকবাহিনীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'তারা যদি মনে করে থাকেন যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের সংগ্রামকে দাবীয়ে রাখা যায়, তাহলে তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে---- জনগণ যখন রক্ত দিতে তৈরী হয়, তখন তাদের দমন করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়ায় নেই।' ২০ মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবং ২১ মার্চ এক জনসভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করায় সম্মতি দিতে ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন, 'এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারই স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থির করবে। তিনি আরও বলেন যে, মুজিব যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাহলে বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা প্রিয় জাতি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দেবে'।

১০ দিন ধরে আলোচনার নামে চলে সময়ের অবক্ষয় ও প্রহসন। ইয়াহিয়া খানের সাথে ষড়যন্ত্রের সাথে শরীক হতে ২১ মার্চ ১২ জন উপদেষ্টা সহ সামরিক প্রহরায় ঢাকা আসে ভুট্টো। বলাবাহুল্য, এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। অপরদিকে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এই অযথা কালক্ষেপণে স্বাধীনতাকামী জনগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং প্রতিদিন সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণার দাবী জানাতে থাকে। ২২ মার্চ তারিখে ঢাকার সমস্ত সংবাদপত্রে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নির্ধারিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার প্রতিকৃতি ছাপা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ প্রতি ঘরে ঘরে এই পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়।

২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে এম সেন হলে অনুষ্ঠিত ইদানিংকালের বৃহত্তম মহিলা সমাবেশে ভাষণ দানকালে পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ঘোষণা করেন, 'আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম আমরা চালাব এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমান সংগ্রামে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহিলাদের ও প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা-শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ট নয়, সেজন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন'। তিনি নারী জাতিকে চির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ট্রেনিং গ্রহণের আহ্বান জানান।

এই সভায় মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম বলেন, 'এখন বাংলাদেশের জনগণের অধিকার স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জঙ্গী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে'। সভায় অন্যান্যের মাঝে হান্নানা বেগম, কুন্দ প্রভা সেন, সীমা চক্রবর্ত্তী, মুশতারী শফি, শিরিণ শরাফতুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।[৪৮]

২৩ মার্চ সিলেট শহরে উষাদাশ পুরকায়স্থ, ষোড়শী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মহিলা পরিষদের বিশাল একটি নারী মিছিল বের হয়। এ সময় নারী সংগঠন মহিলা পরিষদ সারা পূর্ব পাকিস্তানে নারীদের সংগঠিত করে সংগ্রামের প্রস্তুতি জানায়।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে চলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ছাত্রদের এই উদ্যোগ ছাত্রীদেরকেও ব্যাপক ভাবে সম্পৃক্ত করেছিল। ছাত্রইউনিয়ন মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু করে। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সব ছাত্রী প্রশিক্ষণ নেয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা, রোকেয়া কবীর, রোকেয়া খানম, মমতাজ শেফালী, আভা মন্ডল, নাজমা শাহীন বেবী,ডাঃ মেহরোজ, ডাঃ নেলী চৌধুরী, নাজমুন আরা নিনু, তাজিন সুলতানা, নাজমিন সুলতানা, রতন, হেলেন, শামীমা এবং আরো অনেকে। প্রশিক্ষক ছিলেন পিয়ারু ও দুদু নামে সামরিক বাহিনীর দুজন সদস্য। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ছাত্রইউনিয়নের কর্মীদের প্রশিক্ষক ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্রইউনিয়নের কর্মী মিয়া কাশেম।[৫০]

ছাত্রলীগের পক্ষথেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে ও কলাভবনের বারান্দায় গাদা বন্দুক নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমিন, হাসমত জাহান, রোজি বেবী, শামসুন্নাহার ইকো, মিনারা বেগম ঝুনু, রওশন আরা বেগম, বেগম শামসুন্নাহার, আফরোজা হক রীনা, বকুল মোস্তফা, নেলী চৌধুরী, রোকেয়া খাতুন রেখা, সালেহা বেগম, সালমা বেগম সুরাইয়া, রাফিয়া আক্তার ডলি প্রমুখ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৫১]

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, রাশেদা আমীন, শাসসুন্নাহার ইকো, রোজী বেবী সহ ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী নিয়ে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা ছিলেন মার্শাল মনি ও কাজী আরেফ আহমেদ। এই প্রশিক্ষণের পর ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটে এধরনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতেন বীর মুক্তিযোদ্ধা খসরু।[৫২]

শুধু ছাত্র সংগঠনই নয় বিভিন্ন যুব ও মহিলা সংগঠন ও সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করে। পাড়ায় মহল্লায় প্রস্তুতি স্বরূপ সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আজিমপুর স্কুলের মাঠে সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনেক মহিলা অংশগ্রহণ করেন।[৫৩]

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার প্রস্তুতি হিসেবে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সেগুন বাগিচায় মহিলাদের প্যারেড প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সালেহা আনোয়ার গ্রীনরোডের জাহানারা গার্ডেন আমতলার মাঠে মহিলাদের জন্য প্যারেড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই প্রশিক্ষণ ও প্যারেডে

Dhaka University Institutional Repository

বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল মান্নান সাহেবের বাড়ীতে নারীদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেন ডঃ জাহানারা আখতার।[৫৪]

মহিলা আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর বাসা 'মরিচা হাউস' এর সামনে মিসেস টি.এন. রশিদের পরিচালনায় প্রায় দু'শ মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শেষে ২৩ মার্চ 'মরিচা হাউস' থেকে মার্চ- পাস্ট করে মহিলারা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেন।[৫৫]

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বরিশাল সদর গার্লস স্কুলে কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন অঞ্জু গাঙ্গুলী। অঞ্জু গাঙ্গুলী প্রথম ব্যাচেই প্রশিক্ষণ নেন এবং পরে নিজেই প্রশিক্ষণ দেন। এ সময়ে বোমা তৈরী ও রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[৫৬]

প্রশিক্ষণ ছাড়া ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরিকল্পনা অনুসারে ছাত্রদের সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক ছাত্রব্রিগেড তৈরী করা হয়। ছাত্র ব্রিগেডের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা হয় । ঢাকা শহরে মোট ৫২টি স্থানে সংঘঠিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রী বোনেরা ফাস্ট এইড ট্রেনিংসহ সচেতন ও সংঘটিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পলাশী ব্যারাকে মা-বোনদের ট্রেনিং এ অংশ গ্রহণ। এই ট্রেনিং এ মূল দায়িত্বে ছিলেন কাজী রোকেয় সুলতানা। ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত ব্রিগেডের ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন রোকেয়া কবির। ড্যামি রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সকল ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ মিয়া আবুল কাশেম।[৫৭] ধানমন্ডি গার্লস স্কুল মাঠে ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ধানমন্ডি গার্লস স্কুলে প্রশিক্ষণ নেন হোসনে আরা ইসলাম বেবী।

২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সারা দেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলণ করা হয়। এদিন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল জয়বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ। সকাল ৯-২০ মিনিটে পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কুচকাওয়াজ শুরু হয়। এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে দশ প্লাটুন জয়বাংলা বাহিনীর এক প্লাটুন ছিল ছাত্রী। এদের হাতে ছিল ড্যামি রাইফেল।[৫৮]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের স্বাধীনতাকে বাস্তবায়নের প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ ছিল ২৩ মার্চ (১৯৭১) 'পাকিস্তান ডে' র পরিবর্তে ছাত্রলীগ বাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলাদেশ ডে' পালন। ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীবাহিনী কুচকাওয়াজে অংশ নেয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা নুরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আব্দুর রব, এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুচকাওয়াজের অগ্রভাগে ছিলেন পতাকা হাতে শামসুন্নাহার ইকো, ক্রমানুসারে ফোরকান বেগম, ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ শেফালী, রাশেদা কাওসার, মিনারা বেগম ঝুনু, রুবী, শিরিন আখতার, রোজী, নাজমা শাহীন বেবী, রাবেয়া, রাশেদা আমীন সহ অনেক মেয়ে। এই অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনি ও শেখ ফজলুল হক মনি, হাসানুল হক ইনু সহ ক'জন নেতা।[৫৯]

পল্টন ময়দানে পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ শেষে এই বাহিনী প্যারেড করে ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর বাড়ীতে গমন করে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে বাংলাদেশের পতাকা প্রদান করে। এদিন শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় শ্রমিক পরিষদের, নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।[৬০]

২৪ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ডঃ কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা চালিয়ে যায়। এদিন চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, ঢাকার মীরপুরে পাক সামরিক বাহিনীর মদদে অবাঙালীরা বাঙালী নিধন শুরু করে। বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যায়। এসময় তিনি তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা না করে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে এবং দাবী আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

২৫ মার্চে ও জনসাধারণের সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। এদিন শ্রমিকনেতা কাজী জাফর আহমদের সভাপতিত্বে পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্রইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে 'স্বাধীন জন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। সারাদেশ জুড়ে জনগণের মনে সংশয় ছিল বৈঠকের ফলাফল কি হচ্ছে? শেখ সাহেবের কাছে সৈয়দপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অবাঙালীদের দিয়ে গোলমাল করা হচ্ছে বলে খবর এলে তিনি ২৭ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেনঃ

> 'আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে পেরে মর্মাহত হয়েছি। বেসামরিক জনসাধারণের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ আসছে, পুলিশ বাহিনীকে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ও প্রচন্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। এসব কিছুই ঘটছে যখন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ঢাকায়---- আমি তাঁকে অবিলম্বে ঐরূপ সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনসাধারণ কে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া হবেনা। আমার আস্থা আছে যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানেরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য অর্থাৎ 'বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্যে' সর্ব প্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত।'
[ঢাকা টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র সংবাদ বুলেটিন সান্ধ্য অধিবেশন ২৫ মার্চ ১৯৭১][৬১]

২৫ মার্চ শেষ আশা ছিল একটা কিছু সমঝোতা হবে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ বলেছিলেন, 'আর আলোচনা নয়, এবারে সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই।' ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভূট্টোর বৈঠকের পর ভূট্টো সাংবাদিকদের জানান যে, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত আশংকা জনক। সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে ভুট্টোর বক্তব্যের কথা জানালেন, বঙ্গবন্ধু এরপর আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এসময় একজন সাংবাদিক এসে খবর দেন যে, ইয়াহিয়া খান সাদা পোশাকে প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করে বিমানবন্দর বা ক্যান্টনমেন্টের দিকে গিয়েছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে সকল প্রকার মানবিক রীতিনীতি লংঘন করে বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর সর্বাধিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যা চালাবার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালী জনগণের উপর চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ। এ সম্পর্কে সুকুমার বিশ্বাস তাঁর মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী' বই এ উল্লেখ করেছেন।ঃ

'উনিশ'শ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত। বাঙালীর জীবনে দুঃস্বপ্নের কালোরাত। বাংলার বুকে নেমে আসে অত্যাচার, উৎপীড়ণ, পাশবিকতা, নৃশংসতা আর হিংস্রতার কালো থাবা। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ সামরিক সম্ভার নিয়ে শুরু করলো সারা বাংলাদেশ ব্যাপী পৃথিবীর ইতিহাসের এক জঘন্যতম গণহত্যা-ধ্বংসলীলা। রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মত বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চরম নৃশংসতায়। যুদ্ধের সকল নিয়ম কানুন উপেক্ষা করে তারা

Dhaka University Institutional Repository

মেশিনগান, মর্টার আর ট্যাঙ্ক নিয়ে বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো।[৬২]

পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে এবং পরে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত ঘোষণাটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণা'

"THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TO-DAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE. TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH. FINAL VICTORY IS OURS"[৬৩]

[অনুবাদ ঃ সম্ভবত ঃ এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যেখানেই আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষন পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা-১।

এই ঘোষণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে প্রেরণ করেন। এবং তা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জনাব এম. এ. হান্নান ২৬ মার্চ প্রচার করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ সর্বাগ্রে প্রচার করে ভারতীয় বার্তা সংস্থা ইউ. এন. আই.। সংবাদটি ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে দিল্লীস্থ STATSMAN পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। Bangladesh Documents, Vol. I p. ২৮৩-২৮৭ এ সংকলিত ঐ সংবাদটি এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh Declares Freedom: Rahman's Step Follow's Army Crackdown. Pakistan Eastern Wing rechristened the independent state of Bangladesh by Shaikh Mujibur Rahman in a clandestine Radio Broadcust.,..... Speaking over Swadhin Bangla (Free Bengal) Betar Kenra Mr. Rahman later proclaimed the birth of an independent Bangladesh Mr. Rahman Said: "Pakistan armed Forces Suddenly attacked the East Pakistan Rifles base at peelkhana and Rajarbagh police station in Dacca at zero hours on March 26, Killing a number of Unarmed people. Fierce fighting is going on with East Pakistan Rifles at Dacca. People are fighting gallantly with the enemy for the cause of freedom of Bangladesh. Every forces at any cost in every corner of Bangladesh, May Allah bless you and help you in your struggle for freedom from The enymy. Jai Bangla.

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একাত্তরের ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত (স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের' দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন। মেজর জিয়ার অর্থাৎ একজন বাঙালী মেজরের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালীকে তড়িৎস্পর্শে জাগিয়ে তুলেছিল।[৬৪]

শুরু হয়ে যায় সশস্ত্র যুদ্ধ। ২৫ মার্চ রাতে পাক আর্মির অতর্কিত আক্রমণে নারী পুরুষ শিশু সহ অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে যেমন নারীরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নারীর অংশগ্রহণ শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সহ আরো বহু জেলায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের শাখা। মনোরমা বসু বরিশালে নেতৃত্ব দেন। মনোরমা বসুর সাথে ছিলেন পুস্পনাগ, রানী ভট্টাচার্য, সুফিয়া ইসলাম, সাজেদা মতিন, কৃষ্ণাচন্দ, ইলাচন্দ প্রমুখ অনেকেই। উমরতুল ফজল নেতৃত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রামে, সেখানে মুশতারী শফি, নূরজাহান খান, হান্নানা বেগম, দিল আফরোজ দিলু, গীতা ঘোষ, চিত্রা বিশ্বাস, রমাদত্ত, সীমা চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন। পাবনায় নেত্রী ছিলেন রকিবা খাতুন, ঈশ্বরদীতে মিসেস জসীম মন্ডল; সিলেটে উষাদাশ পুরকায়স্থ, খোজেদা কিবরিয়া, ষোড়শী চক্রবর্তী; কুমিল্লায় সেলিনা বানু; ময়মনসিংহে সোফিয়া করিম, মজিরুন্নেসা, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, নুরুন্নাহার বেলী, সুমিতা নাহা প্রমুখ। নারায়ণগঞ্জ এ হেনাদাস নেতৃত্ব দেন, সাথে ছিলেন নাজমা রহমান,

Dhaka University Institutional Repository

জোবেদা দীপা, লক্ষ্মী চক্রবর্তী প্রমুখ। নরসিংদিতে যুথিকা চ্যাটার্জী, গৌরী নাহা, ফওজিয়া পারভীন ছিলেন নিবেদিত। কবি সুফিয়া কামালের সাথে সে সময় নারী নেত্রীরা বহু জেলায় ঝটিতি সফর করেন। প্রবীণ ও নবীন নারী ও ছাত্রী নেত্রীরা ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ার ব্যাপক তৎপরতা জাগিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের নেত্রীবৃন্দ যথা- বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, নূরজাহান মুরশিদ, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মমতাজ বেগম, রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলাকালীন সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী (সাবেক ছাত্রনেত্রী) সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অংশগ্রহণ করেছেন।[৬৫]

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়া গ্রামে 'মুজিব নগরে' ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং প্রথম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় শেখ মুজিবুর রহমান যদি অনুপস্থিত থাকেন বা কাজ করতে না পারেন তাহলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। অস্থায়ীভাবে জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী, মনসুর আলীকে অর্থ ও বানিজ্যমন্ত্রী, জনাব এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়।

পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে জনগণ ও ইপিআর এর প্রতিরোধের লড়াই দেশ জুড়ে চলেছে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রতিরোধের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবহিনীর ব্যাপকঅংশ ও রাজনীতিবিদ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ সীমান্ত দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। কোন পরিকল্পনা ছাড়াই লক্ষ লক্ষ জনতা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে শরনার্থী হয়ে যান।

বাংলাদেশের ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভারতে গিয়েই পরিকল্পিত মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের সাহায্যের আবেদন করেন। এই আহ্বানে ভারত সরকারের সম্মতি জানানোর পরই বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় কিন্তু সরকার কাঠামোতে কোন নারী সাংসদকে বা রাজনৈতিক নারী নেত্রীকে যুক্ত করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার। সেই পরিচালনা কমিটিতে ও নারীদের যুক্ত করা হয়নি। যদিও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নারী সমাজ ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে সকল কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। সম্মুখ সমরে নারীদের অংশগ্রহণের তীব্র আকাংখা থাকায় তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দল থেকে নারীদের শুধুমাত্র অস্ত্র প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যার ফলে 'গোবরা ক্যাম্প' এ মেয়েদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু নারীদের যুদ্ধ করা সরকারী নীতি না থাকায় অকুতোভয় তরুনীরা হতোদ্যম হয়ে যায়।[৬৬] গোবরা ক্যাম্পের পরিচালক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেছেন ঃ

> 'মা বোনদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের পার্ক সার্কাসের গোবরা এলাকায় মহিলাদের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠন করা হয়। আর এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। এই ক্যাম্পে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। এছাড়া ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন চলতো রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা নারীরা কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, কেউ সেবা দিয়েছেন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, কেউ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।'[৬৭]

সম্মুখ সমরে নারীদের অংশগ্রহণের সরকারী নীতি না থাকলে ও নারী মুক্তি যোদ্ধারা কেউ কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ও মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তথ্য ও অস্ত্র সরবরাহ, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সেবা করা, বিদেশে জনমত গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে নারীরা স্ব ইচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারীরা যে সব ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল মুক্তিযুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা এবং যুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন যে সব নারী তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। স্বাধীনতা যুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাংলার জনগণ বিশেষ করে নারী সমাজকে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি 'মুজিবনগর মহিলা পূণর্বাসন কার্যকলাপ ও মহিলা সংগঠন মুজিবনগর' - এর সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এর প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নির্দেশে শরনার্থী আশ্রম পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট পেশ করা, শরানার্থীদের মাঝে চিকিৎসাসহ ত্রান সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণ ও শরনার্থী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয়।

নূরজাহান মুরশীদকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদুত নিয়োগ করলে তিনি ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রচার করেন। সভা সমিতিতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বক্তব্য রাখেন এবং বাংলাদেশের সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। সে সময়ে ভারতের পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখলে পাক সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে ১৪ বছরের কারাদন্ড ও বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দন্ডাদেশ জারী করেন।

সাজেদা চৌধুরী কোলকাতায় পৌছান এপ্রিল মাসে। দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের কথা বিবেচনা করে নারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে মুজিবনগর সরকার একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর উপর। জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় কলকাতার পদ্ম পুকুর এলাকার গোবরাতে সেই ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষনার্থী সংগ্রহ , থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল আয়োজন শেষে শুরু হয় নারীদের ফার্ষ্ট এইড, নার্সিং, মোটিভেশন ও সামরিক প্রশিক্ষণ। তাদেরকে ১৬ জন করে একেকটি দল বানিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে ও হাসপাতালে আহত মুক্তি যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও নার্সিং এর জন্য পাঠানো হয়।

মমতাজ বেগম মুজিব বাহিনীর (বি এল এফ) পূর্বাঞ্চলের বিশালগড় অফিসের দাপ্তরিক সহ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। রিভলভার চালনা, সামরিক কৌশল রপ্ত, তথ্য সরবরাহ সহ বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন।

রাফিয়া আক্তার ডলি মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমানা পেরিয়ে ভাতের তুরা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি অস্থায়ী সরকারের দেয়া যে সব কাজ করেন তাহল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সহায়তায় বিভিন্ন শরনার্থী ক্যাম্পগুলোর জন্য খাবার ও কাপড় সংগ্রহ করা। শুধু কলকাতায়ই নয়, যশোর বর্ডার এলাকায় সব অঞ্চলে যথা বনগাঁ, বারাসাত এলাকায় কাজ করেন। কলকাতা পার্ক সার্কাসে 'খাইরুন্নেসা কল্যান সমিতি' গঠন করে সমিতির মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য সংস্থা গুলো থেকে সাহায্য সংগ্রহ ও ক্যাম্প সমূহে বিতরণ এর দায়িত্ব পালন করেন।[৬৮]

মতিয়া চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আগরতলা ক্যাম্পে ছিলেন, যেখানে কমিউনিষ্ট পর্টি, ন্যাপ ও ছাত্রইউনিয়নের নেতা কর্মীরা বেশী উঠতেন। তাদেরকে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন। রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া তিনি রান্না এবং আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা করতেন। সেখান থেকে তিনি মালেকা বেগমকে সাথে নিয়ে কলকাতা ও দিল্লী যান আন্তর্জাতিক মহিলা সংস্থার সম্মেলনে ভারতীয় মহিলা সংগঠনের সহযোগিতায় স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারণার জন্য।

মালেকা বেগম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সহায়তায় এক আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দেশের নারী সমাজের কাছে বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়এর চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের দাবীতে অনশনরত অষ্ট্রেলীয় যুবকদের কাছে গিয়ে বিশ্ববাসীর সমর্থন প্রার্থনা করেন।

আয়শা খানম আগরতলা ক্যাম্পে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করানোর জন্য ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করতে তিনি মতিয়া চৌধুরীর সাথে একযোগে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে বক্তৃতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করেছেন। এদের সাথে ছিলেন মনিরা আক্তার, সেলিনা বানু, ডাঃ রত্না, রোকেয়া কবীর, ডাঃ ফৌজিয়া মোসলেম সহ অন্যান্যরা।

দেশের মধ্যে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন অনেক নারী। নাজমী আরা বেগম কাজ করেন টাঙ্গাইলে। নাজমী আরা কাদের সিদ্দিকী, শামসুল আলম, কালোখোকা, আব্দুল মান্নান প্রমুখ নেতাদের সাথে কাজ করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইলে মহিলাদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন করেন।

যশোর জেলার অন্যতম নেত্রী রওশন জাহান সাথী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাক আর্মি তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে তাঁকে তার বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখে। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে রওশন জাহান সাথী সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ছাত্র, যুবকদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রেরণা দিতেন।[৬৯]

বরিশালে জনগণকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করণের কাজ করেন চারুবালা গাঙ্গুলী এবং জীবন প্রভা বিশ্বাস। জীবন প্রভা বিশ্বাস মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল ও পদ্ধতি জানিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সভা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবনপ্রভা ভারতে না গিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।

ছায়া বসু এলাকার ছেলেদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার, কাপড়-চোপর সংগ্রহ করে সরবরাহ করেন। আমিনা বেগম মীনা সংগঠকের কাজ করেছেন রংপুরের রৌমারী ইয়ুথ ক্যাম্প ও পলাশডাঙ্গা গ্রামে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, খাবার জমা রেখে প্রয়োজনে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সাথে ছিলেন এলিজা সিরাজী, বিলকিস আরা, তহমিনা মিনি, সাফিনা লোহানী, পারভীন, আনোয়ারা, নাহার প্রমুখ।

কৃষ্ণা রহমান জুন মাসে গোবরা ক্যাম্পে গিয়ে কাজ শুরু করেন। কৃষ্ণা রহমান জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের কাজ করেছেন। এছাড়া নার্সিং প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতার গুনে কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ৮নং থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতে হত। ক্যাম্পের চার'শ জন মেয়ের জন্য নিয়মিত বাজার করা ছাড়াও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন।

আন্ডার গ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃতে কুপার্স এ একটা অফিস নেওয়া হয় এবং পার্টি মেম্বারদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অনিমা সিংহ, শান্তি দত্ত, হেনা দাস, দীপা দাস, কাজী রোকেয়া সুলতানা সহ পার্টি কমরেডরা থাকতেন। কমরেড ইলা মিত্র কাজী রোকেয়া সুলতানা ও দীপা দাস কখন হেনা দাসকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সর্বভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের বিভিন্ন সভা গুলিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেন।[৬৯ক]

সংগঠকের কাজ করেছেন মুকুল মজুমদার দীপা। মুকুল মজুমদার দীপা সল্টলেক, উল্টোডাঙ্গা গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসতেন প্রশিক্ষণ দানের জন্য। মার্কিন নৌবহর ফিরিয়ে নেবার দাবীতে ১২ ডিসেম্বর রাফিয়া আক্তার ডলিসহ তিনি কলকাতায় মিছিল করেন।

সালেহা বেগম কলকাতায় গিয়ে ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ এবং দত্তপুলিয়ায় বি.এস.এফ ক্যাম্পে ওয়ারলেস ট্রেনিং নেন। ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের ভেতরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তিনি গেরিলা পদ্ধতিতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালান। সরাসরি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সামরিক অফিসারদের কাছ থেকে অনুমোদন না পেয়ে মুজিব বাহিনীর করিডোর লিয়াজোঁ হিসেবে কলকাতা থেকে রিলিফ ও অর্থসংগ্রহ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া ঘাট ক্যাম্পে মেজর জলিলের কাছে পৌঁছে দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সালেহা বেগম ইন্টেলিজেন্স রিলিফের কাজ ও মুজিব বাহিনীর লিয়াজোঁর কাজ করে যেতে থাকেন।

সল্টলেকে জলঙ্গীর ক্যাম্পে যুদ্ধের রসদসমূহ রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন রওশন আরা বেগম। রেখা সাহা সল্টলেকের শরনার্থী ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করণের কাজ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের দায়িত্ব পালন করেন রাখী দাশ পুরকায়স্থ। এ লক্ষ্যে তিনি স্কুল কলেজেসহ বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশে বক্তৃতা দেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে জনসংযোগ, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য সংগ্রহ করতেন। ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত যৌথ গেরিলা বাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য দেশ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়াসহ প্রয়োজনে করিমগঞ্জ হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন। এছাড়াও ডাঃ নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, আজাদী হাই, হোসেনে আরা মান্নান, প্রমুখ শরনার্থী শিবিরের দেখাশোনার দায়িত্ব ছাড়াও জনমত গঠন, অর্থসংগ্রহ, রিলিফ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বন্টন এবং মেয়েদের জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণের মত বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।[৭০]

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে প্রবাসে লন্ডন, আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। নারী সমাজের ভূমিকা এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। প্রবাসে যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিসেস লুলু বিলকিস বানু ও মিসেস জেবুন্নিসা বক্স। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮ মার্চ পশ্চিম লন্ডনের ১০৩ নম্বর লেডবেরী রোডে মিসেস জেবুন্নিসা বক্সের বাড়ীতে মিসেস বক্স ও লুলু বিলকিস এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' (এ্যাকশান কমিটি) গঠিত হয়, জেবুন্নিসা বক্স সমিতির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ফেরদৌসী রহমান, আনোয়রা জাহান ও মুন্নি রহমান জনসংযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমিতির উৎসাহী সমর্থক ও নেত্রীদের মধ্যে আরো ছিলেন মিসেস সোফিয়া রহমান, জেবুন্নেসা খায়ের ও ডঃ হালিমা আলম ও রুনি খান। মহিলারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সমিতি গড়ে তোলেন এবং বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে তারা রাস্তায় নেমে এলেন। দীর্ঘ নয়মাস মুক্তিযুদ্ধ কালে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁরা সাহস ও কর্তব্য পরায়ণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁরা ষ্টিয়ারিং কমিটির পক্ষথেকে প্রচারপত্র বিলি, দেয়ালপত্র ও প্ল্যাকার্ড লেখা এবং বিক্ষোভে যোগদান করেন। সমিতির উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা "সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড" এর অফিসে গিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শিশুদের দুর্বিসহ জীবন যাপন ও হৃদয় বিদারক মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ৪ঠা জুন মিসেস বক্সের নেত্রীত্বে প্রায় দু'শ মহিলা ও শিশু সেন্ট জেমস পার্ক থেকে মিছিল করে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। এই স্মারক লিপিতে ইয়াহিয়া সরকারকে সাহায্যদান অব্যাহত রাখার বৃটিশ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়। লুলু বিলকিস বানু অক্লান্ত ভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া "ওয়ার অন ওয়ান্ট" ও "ক্রিশ্চিয়ান এইড" এর কার্যালয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নির্যাতিত গণমানুষের জন্য সাহায্যেরও আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি তিন হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য প্রদান করে।

১ আগষ্ট ১৯৭১ লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পল বানেটের নেতৃত্বে গঠিত এ্যাকশান বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বৃটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ হাজারের ও বেশী বাঙালী যোগ দেয়। সভায় বিচারপতি আবু সাইয়িদ সহ অন্যান্যের মাঝে বক্তৃতা করেন লুলু বিলকিস বানু।

এনামুল হক গঠিত "বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ" নামে একটি সংগঠন ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের কনওয়ে হলে "অস্ত্রহাতে তুলে নাও"

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে। মুন্নি রহমান বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন।[৭১]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিভিন্নমুখী ভূমিকা রাখেন আমেরিকা প্রবাসী আমেনা পন্নী। ২৫ মার্চের গণহত্যার খবর পেয়ে আমেনা পন্নী সানফ্রানসিসকো ও সন্নিহিত এলাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে নকশা জেনে বাংলাদেশের পতাকা তৈরী করে ২৮ মার্চ পাকিস্তান কনসুলেট ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের কনসুলেট ভবনে ঢুকতে না দিলে অগত্যা তাঁরা সামনের পতাকা দন্ড থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উড়িয়ে দেন।

আমেনা পন্নী বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গঠন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতা বিষয়ে জনমত গঠনে দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। বহুমুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে তিনি মার্কিন জনগণকে বাংলাদেশের আন্দোলনের যৌক্তিকতা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । পত্র পত্রিকায় লেখালেখি, রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দেয়া, ছাত্রদের নিয়ে মিছিল ও সভা-সমিতির আয়োজন প্রভৃতি নানাভাবে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য ওষূধপত্র যোগাড় করেন। ফ্লাইং টাইগার মারফত বিনা ব্যয়ে এসব ওষূধ লন্ডন পাঠান এবং সেখান থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে তা ভারতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌছানো হতো। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে তিনি প্রচুর চিঠি লেখেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। রবিশংকর ও জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে কনসার্ট শো'র আয়োজনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই কনসার্ট এর রেকর্ড বিক্রি করেন। নিজ ব্যয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খানের দুটি কনসার্ট শো'র আয়োজন করেন এবং অনুষ্ঠানের কার্ড বিক্রি করে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক তহবিল গঠন করেন। পাকিস্তানের সহায়তায় মার্কিন সরকার সানফ্রানসিসকো বন্দরে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই শুরু করলে আমেনা পন্নী তা প্রতিরোধে উদ্যোগী হন। বন্দর শ্রমিক বা লং শারম্যানদের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ন্যায্যতা তাঁদের বোঝাতে সক্ষম হন। ফলে বন্দর শ্রমিকরা পাকিস্তানী জাহাজে অস্ত্র তুলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরে সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে অস্ত্র বোঝাই করে। মোটকথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আমেরিকাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমেনা পন্নী ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

সানফ্রানসিসকো শহরে বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন জামিল আখতার বীনু। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।[৭২]

ওয়াশিংটনে ৩ মার্চ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এনায়েত করিম সাহেবের বাড়ীতে সমবেত হন প্রবাসী বাঙালীরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সংহতি জানানোর জন্য তারা সংগঠন গড়ে তোলেন। জুন-জুলাই মাসে বাঙালী মার্কিনীরা মিলে গড়ে তোলেন, "ফ্রেন্ডস অব ইষ্ট বেঙ্গল"। বাংলাদেশের জন্য প্রচার, বাংলাদেশের জন্য সমর্থন আদায়, মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সংগঠকদের মধ্যে হোসনা করিম, ফরিদা হক, সুলতানা আলম, রওশন আরা চৌধুরী এরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খাদিজা হক, নাজমা, পুতুল ছিলেন মুক্তেযুদ্ধের কাজের সমর্থক। বাংলাদেশের সংগ্রামী নেত্রী আশালতা সেন নিউইয়র্কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সংগঠিত করার কাজ করেন। তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ভবনে প্রতিবাদ জানান এবং অনশনে অংশ নেন।[৭৩]

২৫ মার্চের পর সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপশি বেশ কয়েকজন নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডসহ বিভিন্ন অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছেন অনেক নারী। কেউ ভারতে শরনার্থী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেবার পরে যুদ্ধ করেছেন আবার কেউ কেউ দেশের মধ্যেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারীরা পাক বাহিনীর নিধনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পাবনার শিরিণ বানু, নরসিংদীর ফোরকান বেগম, মিনারা বেগম, গোপাল গঞ্জের আশালতা বৈদ্য, বরিশালে করুনা বেগম, আলমতাজ বেগম ছবি, বীথিকা বিশ্বাস, রুনা দাস, মিনতি ওঝা, মালতি হালদার, তপতি মন্ডল, মনোয়ারা বেগম মনু, টাঙ্গাইলের হাজেরা সুলতানা, তারামন বিবি, কাকন বিবি প্রমুখ সশস্ত্র যোদ্ধা।

শিরিন বানু মিতিল ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ পাবনায় সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে ৩৬ জন পাকসেনা নিহত হয় এবং ২ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এই যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে পাবনা হানাদার মুক্ত হলেও পরে আবার হানাদারদের দখলে চলে যায়। ছেলেদের মত পোষাক পরিধান করে শিরিণ বানু রাইফেল হাতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। নগর বাড়ীতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পড়ে শিরিণ বানু মিতিলের উপর। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি বন্দুক হাতে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করেন। পাবনা আবার পাকবাহিনীর হাতে চলে গেলে অস্ত্র আনার জন্য তিনি ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

যান এবং মহিলাদের একমাত্র সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প গোবরা ক্যাম্পে যুক্ত হন।[৭৪]

টাঙ্গাইলে একজন মহিলা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন হাজেরা সুলতানা। ২৫ মার্চের পর তিনি টাঙ্গাইলের যমুনার চর এলাকায় অবস্থান করেন এবং সেখানে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির একটি গ্রুপ কমান্ডার আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তোলেন। সেখানে হাজেরা সুলতানা সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলের পাক বাহিনীর সঙ্গে ছয়টি বড় ধরণের যুদ্ধ হয়। সেখানে তিনি সহযোগীর ভূমিকা পালন করেন। তাদের সশস্ত্র গ্রুপটি পরবর্তীকালে কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে একীভূত হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি টাঙ্গাইলের চরাঞ্চল ও নরসিংদী জেলার শিবপুরের মান্নান ভূইয়ার নেতৃত্বাধীন আর একটি সশস্ত্র ঘাঁটি এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এছাড়া তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা, ওষুধ সংগ্রহ এবং সংবাদ সরবরাহের কাজ করেছেন দেশের ভেতরে থেকেই।[৭৫]

গোপালগঞ্জের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হলেন আশালতা বৈদ্য। তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এলাকার সাহসী ৪৫ জন মহিলাকে নিয়ে গড়ে তোলেন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা দল। হেরেকান্দি হাইস্কুল ও লেবুরবাড়ী প্রাইমারী স্কুলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অস্ত্রচালনা, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ নেন। এবং ৩০০ জন মহিলা দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ২৪ জুন হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে আশালতা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় হরিনাহাটি, কোটালীপাড়া, শিকের বাজার, রামশীল ও ঘাঘর বাজারে। যুদ্ধে পাকিস্তানীদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়, ২৫ জনকে বন্দী করা হয়। শহীদ হন তিন জন মুক্তিযোদ্ধা। আশালতা বৈদ্য ২২টি যুদ্ধে অংশ নেন। আশালতা বৈদ্য শুধু পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধই করেননি করেছেন আহত মুক্তি যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষা।[৭৬]

১৭ মার্চ আলেয়া বেগম মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলম ডাঙ্গা থানা (চুয়াডাঙ্গা) কমান্ডের ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এই আলেয়া বেগম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের চাপড়া ট্রেনিং ক্যাম্পে যুদ্ধকৌশল ও সমরাস্ত্র চালনা শেখেন। বয়সে কিশোরী হলেও তিনি কোন ভারী কাজে পিছপা হননি। পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি সর্বদা আগে কদম ফেলে এগিয়েছেন। রাইফেল, বন্দুক, এস এম জি, এস এল আর, সবকিছু চালানোতেই আলেয়া সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি একাধিক সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও সদর থানা

Dhaka University Institutional Repository

এলাকার যুদ্ধক্ষেত্রে আলেয়া বেগম সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করেছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে।

১৯৭১ সালে বাগেরহাট জেলার মেহেরুন্নেসা মীরা ও হালিমা খাতুন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেহেরুন্নেসা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগেরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মেজর তাজুল ইসলামের কাছে অস্ত্র চালনা ও ডিনামাইট বিস্ফোরনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি জেলার দশমহল, মাহুতকান্দা, বরইগুনা, খালিশপুর, বেসরগাতি, ভুটাপুর ও সন্তোষপুর এলাকায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মুখ সমরে অংশ গ্রহণ করেছেন বরিশাল জেলার অকুতভয় নারী মুক্তিযোদ্ধারা। অপারেশন 'স্বরূপ কাঠির' দুই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হলেন বিথীকা বিশ্বাস ও শিশির কনা। বিথীকা কুড়িয়ানার পেয়ারা বাগানে ক্যাপ্টেন মাহমুদ আলম বেগের সাথে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এবং ট্রেনিং পেয়ে এরা হয়ে উঠলেন এক একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা। পিরোজপুরের বিভিন্ন এলাকায় পুরুষ সহযোদ্ধাদের পাশাপশি এরা যুদ্ধ করেছেন। একাত্তরের ১১ জুলাই রাতে বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কনা স্বরূপকাঠি নদীতে নোঙ্গর করা পাক আর্মীদের গান বোটে গ্রেনেড চার্জের দায়িত্ব নেন। তারা নৌকা থেকে পানিতে নেমে সাঁতার দিয়ে গানবোটের কাছে গিয়ে গানবোটে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারেন। প্রচন্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাক বাহিনীর গান বোট। অনেকক্ষণ পরে অন্ধকারে কুচুরিপানার নীচ দিয়ে সাঁতার দিয়ে তীরে ফিরে একসময় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছান। বীথিকা বিশ্বাস ৯ নম্বর সেক্টর এর হেডকোয়ার্টার পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহাকুমার টাকীতে অবস্থান করেছেন। সেখানে তার দায়িত্ব ছিল গেরিলা এবং গুপ্তচর বৃত্তির ট্রেনিং দেয়ার জন্য মেয়েদের সংগ্রহ করা। শেষপর্যন্ত ১০০ মেয়েকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক অপারেশনে অংশ নেন বীথিকা বিশ্বাস।

দেশ মাতৃকার মুক্তির মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোতে অগ্নি শিখার মত জ্বলে উঠেছিলেন বরিশালের করুণা বেগম। করুণা বেগমের স্বামীকে রাজাকাররা নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ছিলেন গেরিলা বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। মুলাদী থানার কুতুব বাহিনীতে করুণা বেগম অন্য মহিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে অস্ত্র শিক্ষা নেন। এ বাহিনীর অধীনে ৫০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। করুণা বেগম এই দলের কমান্ডার ছিলেন। তিনি গ্রেনেড, স্টেনগান ও রাইফেল চালানো শেখেন এবং যেকোন ধরণের দ্রব্য

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। গেরিলা যোদ্ধা করুণার কাজ ছিল ছদ্মবেশে শত্রু-ছাউনির ওপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা কখন ও ভিখারীর বেশে কখনও গ্রাম্য কূলবধূর বেশে তিনি শত্রু শিবিরে নির্ধারিত অপারেশন চালিয়েছেন। ৫ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে করুণা বেগম আক্রমণ করেন পাকবাহিনীর মাহিলারার শক্ত ঘাঁটি। তিনি নিজেই পর পর ৫টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আক্রমণ শুরু করেন। পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধে ১০ জন শত্রুসেনা হতাহত হয়। অপর পক্ষে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র তাঁর পায়ে গুলি লেগে তিনি আহত হন। বরিশাল জেলার কসবা, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দিবাজার ও টরকীতে শত্রুর সঙ্গে খন্ডযুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[৭৭]

অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছেন ঝালকাঠির কেওতা গ্রামের হাবিবুর রহমানের কন্যা দশম শ্রেণীর আলমতাজ বেগম ছবি। দুই ভাই এবং ভাইয়ের বন্ধুর সাথে তিনি ও যুদ্ধে অংশ নেন। তাদের বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন জনাব সিরাজ সিকদার। স্থানীয় ভাবেই আলমতাজ বেগম রাইফেল চালানো এবং গ্রেনেড চার্জ করা শিখেন। একবার এক রাজাকারদের ধরে আনা হলে তাঁকে হত্যার দায়িত্ব পড়ে আলমতাজ বেগমের উপর। বিচারে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলমতাজ বেগম ব্যয়নেট চার্জ করে রাজাকার নিধন করেন। এছাড়া তিনি বিখ্যাত স্বরূপকাঠি অপারেশনে ও অংশ নিয়েছিলেন। আলমতাজ বেগম এর সাথে অন্য যে সব নারী যোদ্ধা ছিলেন তারা হলেন সুভাষিনী শোভা, মনজু, বীথিকা, মনিকা, শিখা, কনিকা রায়, রেবা, সন্ধ্যা নিভা, লাল বিবিসহ আরো অনেকে। স্বাধীনতার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি রণাঙ্গনে ছিলেন।[৭৮]

নবম সেক্টরে অস্ত্র ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন সুভাষিনী শোভা। শোভা ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে সুইসাইড স্কোয়াড গড়ে তুলেছিলেন। শোভাদের গ্রুপ লিডার ছিলেন মাহবুবুল। তিনি ৯ নং সেক্টরে বেনীলাল গুপ্তের অধীনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশনেন এবং ক্যাপ্টেন বেগ, বেনীলাল গুপ্ত ও কালাম এর কাছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। তিনি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। কুড়িয়ানা খালের মধ্যে পাকবাহিনীর স্পীডবোটে গ্রেনেড ছুড়ে স্পীড বোট ধ্বংস করেন শোভা। একবার তিনি ধরা পড়ে বরিশাল জেলখানায় হাজত বাস করেন। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসে আবার যুদ্ধে অংশ নেন।[৭৯]

সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন এস.এম. মনোয়ারা বেগম মনু। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পটুয়াখালী মহিলা কলেজে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন মেহেরুন্নেসা রুনু, মমতাজ বেগম, এস.এম. আনোয়ারা আনু ও

Dhaka University Institutional Repository

মনোয়ারা। মনোয়ারা ও আনোয়ারার কর্মতৎপরতার কারণে পাক আর্মি তাদের দুই বোনকে জীবিত ও মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা ঘোষণা করলে মনোয়ারা বেগম সুন্দরবনে পৌঁছান। সেখান থেকে শরণখোলা ক্যাম্পে গিয়ে অস্ত্রসহ গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষক ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন ও ভারতীয় আর্মির ক্যাপ্টেন পরিতোষ বাবু। মনোয়ারা বেগম বাগেরহাট জেলার রায়েন্দা অপারেশনসহ ফুলতলা, কচুয়া, মংলা, মোড়েলগঞ্জ, তুষখালী, মাছুয়া প্রভৃতি স্থানে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে যে দশজন নারী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সালেহা, আনু, তাসলিমা, বীথি, মিষ্টি, বকুল, সবিতার নাম উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাই তিনি নবম সেক্টরে সরাসরি অস্ত্র কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করেন।

কুড়িগ্রামের তারামন বিবি আর এক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। তারামন বিবি যুদ্ধ করেন ১১ নং সেক্টরের অধীন চিলমারী থানা এলাকায় দুই নম্বর এফ.এফ. কোম্পানীর রাজিবপুর অংশে। রাজিবপুরের দুই নম্বর প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন হাবিলদার মুহিব। তারামন বিবি হাবিলদার মুহিবের কাছে অস্ত্রচালনা শিখেন। অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেবার পর তারামন কয়েকটি যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ আগষ্ট চর নেওয়াজী স্কুলের নিকট পাক হানাদারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি যুদ্ধে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন। বার-তেরঘন্টা যুদ্ধ চলার পর এই গেরিলা যুদ্ধে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তেরজন পাক হানাদার ও রাজাকারের মৃত্যু ঘটে।[৮০]

কাঁকন বিবি ৫ নম্বর সেক্টরে যোগ দিয়ে প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ করতেন। বোমা, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ বহন করে কাঁকন বিবি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করে জর্জিয়া ব্রীজ ধ্বংসের কৃতিত্বে অংশ নেন। এছাড়া মহব্বতপুর, কান্দাগাঁও, বসরাই, টেংরাটিলা, বেটির গাঁও, নুরপুর, দোয়ারাবাজার, টেবলাই, সিলাইড় পাড় সহ বিশটি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন কাঁকন বিবি।[৮১]

দেশ শত্রুমুক্ত করার জন্য শামসুন্নাহার ইকো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নরসিংদী জেলার রূপগঞ্জ থানার পেরাবো ক্যাম্পে অবস্থানকালে পাকিস্তানী আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করলে শামসুন্নাহার ইকো ও আরো কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এতে অনেক পাকসেনা হতাহত হয় এবং অন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর আগরতলায় যান এবং সেখান থেকে বেশ কিছু অপারেশনে অংশ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে যে সব নারী পাকসেনাদের সাথে অস্ত্রহাতে লড়াই করেন তাদের মধ্যে দুজন হলেন ফোরকান বেগম ও মিনারা বেগম। গেরিলা ট্রেনিং ও সুইসাইড স্কোয়াডের পূর্বাঞ্চলীয় হাইকমান্ড শেখ ফজলুল হক মনির নির্দেশে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড (গেরিলা শাখা) আ.স.ম. আব্দুর রব ছাত্রলীগের তরুণী নেত্রীদের গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়ার্ডের আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন আগরতলায় ল্যাম্বুচোরা ক্যাম্পে। মহিলা গেরিলা স্কোয়াড সাব কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ফোরকান বেগমের নেতৃত্বে ৮ সদস্য বিশিষ্ট নারী গেরিলা স্কোয়ার্ডের ট্রেনিং শুরু হয়। এ প্রশিক্ষণে সব ধরণের আধুনিক অস্ত্র চেনা, পরিচালনা ও ধ্বংস করার কলাকৌশল, শত্রুপক্ষকে ডিটেক্ট করা, তাদের ব্যবহৃত কোড বুঝতে পারা, বিমান বন্দর সহ নানা গুরুত্বপুর্ণ স্থান ও স্থাপনা সমূহে আক্রমণ করে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার ব্যবস্থা ইত্যাদি পূর্ণ সামরিক উচ্চতর বিষয়াবলী শেখানো হয়। প্রথম দলে ফোরকান বেগম এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ হলেন ফরিদা খানম সাকী, মমতাজ বেগম, মিনারা বেগম ঝুনু, শামসুন্নাহার ইকো, আলেয়া বেগম, স্বপ্না চৌধুরী, আমেনা সূলতানা বকুল। ফোরকান বেগম ও মিনারা বেগম বেশ কিছু গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। ছাত্র নেতা নিখিল দাসের নেতৃত্বে মিনারা বেগম ও ফোরকান বেগম বিটগড়ে একটি অপারেশনে গ্রেনেড ছুড়ে পাক আর্মীদের হতাহত করেন।[৮২]

এছাড়া অনেক মহিলা সশস্ত্র যুদ্ধের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিলেও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে পারেননি। ফরিদা খানম সাকী, রাশেদা আমিন, স্বপ্নাদত্ত চৌধুরী, শিরিণ জাহান দিলরুবা, নাজমা শাহীন বেবী, গীতা মজুমদার প্রমুখ প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য ও অস্ত্র সরবরাহের কাজ ছিল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অত্যন্ত গোপনে এবং দৃঢ়তার সাথে করেছে মহিলারা। শুধু অস্ত্রই নয় বিভিন্ন চিঠিপত্র, লিফলেট, ওষুধ এবং খাবার দাবার সহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু আদান-প্রদান এর দায়িত্ব পালন করেছে নারী। গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, টাঙ্গাইল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শহরে ও গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। তারা আত্মগোপনে থেকেছেন, অ্যাকশন করেছেন যেখানে যেখানে-সব

Dhaka University Institutional Repository

জায়গায় মহিলারা যুক্ত ছিলেন সর্বাত্মক ভাবে। মহিলাদের সাহায্য ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ চালানো বাস্তবে সম্ভব ছিল না।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেসব নারী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন, তাদের মধ্যে ঢাকাতে ছিলেন মাহফুজা খানম, বেবী মওদুদ, জিয়াউন্নাহার রোজী, সাহারা খাতুন, আফরোজ হক রীনা, আসমা, রেশমা ও সায়মা সহ অনেকে।

মাহফুজা খানম পার্টির সিদ্ধান্তে ঢাকাতে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পুরানা পল্টনের বাসা ছিল ক্যাম্পের মত। মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকম যোগাযোগের কেন্দ্র। মাহফুজা খানম শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজ করতেন। বিপদজনক পথ পাড়ি দিয়ে চটের ব্যাগে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেবার কাজ করেন। ঢাকার U.S.I.S লাইব্রেরী অপারেশন, T.V. টাওয়ার অপারেশন ও সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা দেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের এনে ঢাকার পলি ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরী থেকে কেমিক্যাল সংগ্রহ করতেন বেয়ারাদের সহযোগিতায় যা দিয়ে বোমা বানানো হত। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর ও অঞ্চল থেকে আসা লিফলেট তিনি বিলি করার ব্যবস্থা করেন। এসব কাজে মাহফুজা খানম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন।

বেবী মওদুদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ চিঠিপত্র সমূহ বিপদের আশংকা সত্বেও বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেন। বিদেশী কূটনীতিকদের কাছে ও অনেক প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার কাজ করেন।[৮৩]

ঢাকার মগবাজার ওয়ারলেস এলাকার চার গেরিলা ভাই এর এক বোন সুরাইয়া আক্তার বেবী গোলাবারুদ হাতে পাক আর্মীর সাথে লড়াইয়ে গেরিলা এ্যাকশনে যোগ দেন। ১৬ ডিসেম্বর এ্যাকশন করা অবস্থায় পাক আর্মীর গুলিতে শহীদ হন।[৮৪]

কিশোরগঞ্জের সখিনা একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের সংবাদ দাতার ভূমিকায় কাজ করেছেন। ভিখারিনীর বেশে ঘুরে ঘুরে পাকিস্তানী সৈন্য, রাজাকার, আলবদর বাহিনীর অবস্থান জেনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জানাতেন। মুক্তিযোদ্ধারা সখিনার তথ্যের উপর নির্ভর করে পাকিস্তানী শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী থানার রহিমা বেগম আট নম্বর সেক্টরাধীন ওড়াকান্দি ধাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের অধীনে বিভিন্ন কাজ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও টাকা পয়সা সরবরাহ থেকে শুরু করে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, গোপনে অস্ত্র পৌঁছে দেবার মত গুরত্বপূর্ণ কাজ দক্ষতার সাথে করেছেন।

পাবনার ভানুনেছা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক থানার ওসির কাছ থেকে গুলি এনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচাতে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

টাঙ্গাইলে গেরিলাদের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন পৌরসভার ভ্যাকসিনেটর জয়নাব বেগম। ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের সেতু ধ্বংসের আগে এর যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করেন জয়নাব বেগম।[৮৫]

যশোরের ঝিকরগাছাসহ অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্মুখসমরে অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন মমতাজ বেগম। খুলনা জেলার তেরখাদা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য স্পাইং এর দায়িত্ব পালন করেন ফিরোজা খানম। এসব কাজ করেন নোয়াখালীতে শিবানী দাস। বরিশালে তথ্য ও অস্ত্র সরবরাহের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন পুষ্প গুহ, সুফিয়া খাতুন, নূরজাহান বেগম ও ভাগিরথী। গুপ্তচরের কাজ করতে গিয়ে পাক আর্মীদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন নূরজাহান বেগম। নূরজাহান বেগম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্র ও তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়মিত বরিশাল-শিকারপুর যাতায়াত করতেন। কখনো না যেতে পারলে খবর দেয়া থাকত কোথায় খবর পাবে। একবার চিঠি সহ নূরজাহান বেগম ধরা পড়লে পাক আর্মী তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের খবর বের করার জন্য নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায় এবং পানিতে ফেলে দেয় অজ্ঞান অবস্থায়। পরে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে।[৮৬]

পিরোজপুর জেলার জুজখোলা গ্রামের ভাগিরথীকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গেলে মুক্তির বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর এনে দিতে রাজী হন। মুক্তি পেয়ে ভাগিরথী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকিস্তানীদের খবর পৌঁছে দিতেন এবং পাকিস্তানীদের দিতেন ভুল সংবাদ। একদিন ভুল তথ্য দিয়ে পাকসেনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিয়ে এলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এতে অনেক পাকসেনা নিহত হয়। ভাগিরথীর চালাকী বুঝতে পেরে পাকসেনারা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

জীপের পিছনে বেধেঁ তাঁকে সারা শহরের রাস্তা ঘুরানো হয়। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা ভাগিরথীর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়।[৮৭]

চট্টগ্রামে 'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গড়ে তোলেন ডাক্তার নূরুন্নাহার জহুর। এই বাহিনীর মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে বিভিন্ন ভাবে। আছিয়া খাতুন ও আয়শা হায়দার অস্ত্র ও খবরাখবর আদন-প্রদান করার কাজ করতেন। সীমা চক্রবর্তীর বাসায় অস্ত্র রাখা হত।

'সেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তি ফৌজ সহায়ক কমিটি' মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে। সভানেত্রী ছিলেন প্রীতিরানী দাস পুরকায়স্থ। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, অভাব অভিযোগ দুর করা ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার ব্যবস্থা করা হয়। সেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজ কমিটির সাথে জড়িত ছিলেন গীতারানী নাথ, সুধারানী কর, প্রমীলা দাস, যুথিকা রায়, কানন দেবী, মঞ্জুদেবী, সুষমা দাস, সুনীতি দেবী, শেফালী দাস ও রমা রানী দাস প্রমুখ।[৮৮]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। দেশের ভিতরে এবং সীমান্ত এলাকার ক্যাম্প গুলোতে মহিলা ডাক্তারগণ বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে চিকিৎসার কাজ করেছেন। দেশের ভিতরে যে সব মহিলা ডাক্তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন এদের মধ্যে অন্যতম হলেন কুমিল্লায় ডাক্তার যোবায়দা, চট্টগ্রামের ডাক্তার শামসুন্নাহার কামাল, ও ডাঃ রেনুকনা বড়ুয়া।

ডাঃ রেনু কনা বড়ুয়া পূর্বপাকিস্তান রেলওয়ে হাসপাতাল চট্টগ্রামে এসিসটেন্ট সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ডাঃ রেনুকনার স্বামী সুপতি বাবু অফিস থেকে আর বাসায় ফেরেননি এবং তিনি জানতে পারেন পাক আর্মীরা তাকে হত্যা করছে। এরপর ডাঃ রেনুকনা বাবার বাড়ী রাউজানে চলে যান। জুলাই এর শেষ দিকে রাউজান এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা আসতে থাকে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। ডাঃ রেনুকনা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পুর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, অস্ত্রশস্ত্র রাখা, গোপনে পাকসেনাদের সংবাদ সংগ্রহ করে তা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠানো। কখনো কখনো আহত মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর কাছে আসত চিকিৎসার জন্য আবার কখনো তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত গভীর জঙ্গলে

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানায়। এভাবে তিনি কয়েক মাইল হেঁটে হেঁটে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিয়ে এসেছেন।

চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের চীপ মেডিকেল অফিসার ছিলেন ডাঃ শামসুন্নাহার কামাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ডাঃ শামসুন্নাহার কামালের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। ডাঃ শামসুন্নাহার হাসপাতালের মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করার সুযোগ পান। বন্দরের যত শ্রমিক কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ শামসুন্নাহার অত্যন্ত গোপনে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী ও সহমর্মী সাথী হয়ে ওঠেন। হাসপাতালে সাধারণ রোগী হিসেবে ভর্তি করিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। তিনি শুধু হাসপাতালেই চিকিৎসা করেননি মাঝে মাঝে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প গুলোতে পাঠিয়েছেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র। কোন কোন সময় পাকসেনাদের গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা কে তিনি নিজের বাড়ীতে চিকিৎসা দিয়েছেন রাজাকার আলবদরদের প্রতিরোধ সত্বেও।

অপর একজন সাহসী চিকিৎসক হলেন বীর চট্টলার ডাঃ নুরুন্নাহার জহুর। তিনি কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন আবার কখনো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেন। ডাঃ নুরুন্নাহার জহুর দেশের ভিতরেই 'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গড়ে তোলেন। তাদের নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে কাজ করেন। ৬ মাস দেশের ভিতরে কাজ করে তিনি ভারতে চলে যান। ভারতের আগরতলায় গিয়ে জেভি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের ওয়ার্ডে চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ক্যাম্পে ওষুধ করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নভেম্বর মাসে কলকাতায় গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার এ স্বাস্থ্য বিষয়ক কথিকা প্রচার করেন এবং রিলিফ কাজে অংশ নেন। এছাড়া ডাঃ নুরুন্নাহার জহুর শরণার্থী শিবিরে শিশু ও প্রসূতিদের চিকিৎসা করেন।

ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ২নং সেক্টরের অধীনে ছিলেন। মেঘালয়ে বাংলাদেশ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে। মেডিকেল কলেজের শেষবর্ষের কয়েকজন (৮/১০ জন) ছাত্র সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। লন্ডন থেকে আসেন ডাঃ মবিন, ডাঃ কিরণ সরকার দেবনাথ, ডাঃ নাজিমুদ্দিন এবং ডাঃ মোর্শেদ। বাঁশের ও প্লাষ্টিক ক্লথ দিয়ে তৈরী এ চারশ বেডের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করতেন ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ও তাঁর সহকর্মীরা। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। বহু রোগীকে তারা সুস্থ করে

Dhaka University Institutional Repository

আবার রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন যুদ্ধ করার জন্য। বহু ভারতীয় সদস্যদের ও চিকিৎসা দিয়েছেন ডাঃ ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম।[৮৯]

ডাঃ মাখদুমা নার্গিস মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় অবস্থান করেন আগরতলার ক্র্যাফটস হোস্টেল ক্যাম্পে। তিনি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন এবং শিবিরে শিবিরে গিয়ে শরনার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বোঝাতেন।

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেন লেঃ (অবঃ) কনকপ্রভা সরকার। কনক প্রভা সরকার ৬ নম্বর সেক্টরে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবা ও গুরুতর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাগডোকরা ভারতীয় হাসপাতালে পৌছে দেন। শুধু তাই নয় মুক্তিযোদ্ধারা যখন যুদ্ধ করতেন কনকপ্রভা সে সময় ফার্ষ্ট এইড বক্স নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতেন।

অস্থায়ী সরকার প্রদত্ত চাকুরী নিয়ে ডাঃ কাজী তামান্না কলকাতার আশেপাশের সকল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত নাটক করতেন। এছাড়া ও ডাঃ ফাতেমা চৌধুরী, ডাঃ নুরজাহান ও ডাঃ লায়লা প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখেন।[৯০]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে বহুলোক আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিচালিত হত ভারত সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্যে। শরণার্থী শিবিরে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা, নুতন শরণার্থীদের নাম তালিকাভূক্তি করণ, ওষুধ পত্র প্রদান, রিলিফ দ্রব্যাদি বিতরণ ও রান্নার কাজ করেছেন মেয়েরা।

আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের খোঁজখবর এবং সকল শরণার্থী শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ফোরকান বেগম এর নেতৃত্বে গঠিত হয় মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (১৯৭১ এর ১০ জুলাই)। এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের নারী সমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা। আদর্শ - (১) সংগ্রাম (২) সেবা (৩) একতা (বাঙালী জাতীয়তা বাদের আদর্শ)

স্বেচ্ছাসেবিকা প্রধান - জাহানারা হক
সাধারণ সম্পাদিকা - ফোরকান বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সহ-সভানেত্রী	-	আম্বিয়া আজম ও সূচিত্রা গাঙ্গুলী
কোষাধ্যক্ষা	-	রিজিয়া চৌধুরী।
সাংগঠনিক সম্পাদিকা	-	ফোরকান বেগম
দপ্তর সম্পাদিকা	-	মিনারা বেগম ঝুনু
সদস্যা	-	ফিরোজা আতিক, নাসিমুন্নাহার হুদা, সাজেদা চৌধুরী।

উক্ত কমিটির বিভিন্ন কাজ যারা পরিচালনা করেন তারা হলেন ১. মিসেস জাহানারা হক ২. মিসেস ফরিদা মহিউদ্দিন ৩. রিজিয়া চৌধুরী ৪. মিসেস নুরুন্নাহার জহুর ৫. মিসেস আলী আজম ৬. সূচিত্রা গাঙ্গুলী ৭. মিস সাজেদা চৌধুরী ৮. মিসেস ফিরোজা আতিক ৯. মিনারা বেগম ঝুনু ১০. ফোরকান বেগম।

কমিটির বিভিন্ন শাখা

১. নার্সিং শাখা কমিটি
২. গেরিলা ট্রেনিং কমিটি
৩. হাসপাতাল কমিটি
৪. রিলিফ কমিটি
৫. মাতৃ ও শিশু কল্যান কমিটি

এসব কমিটির তরফ থেকে অন্যান্য বিষয়ে যেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তেমনি নার্সিং শাখা কমিটি মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেবায় নিযুক্ত করা হয়।[৯১]

সেবিকা হিসেবে মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, আগরতলা, করিমগঞ্জ, গোবরাসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মালেকা বেগম, শান্তিদত্ত, রাহেলা, সুরাইয়া, বীথিকা, নাজমা, সাজেদা বেগম, মুশতারী শফি, রোকেয়া বেগম, ডাঃ মাখদুমা নার্গিস, আয়শা খানম, ডাঃ ফওজিয়া মোসলেম, উষাদাশ পুরকায়কাস্থ, মুনিরা আক্তার, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, বিভা সরকার, মনিকা ব্যানার্জী, বেগম বদরুন্নেসা, কল্পনা, কৃষ্ণা রহমান, গীতাধর, গীতাকর, গীতা মজুমদার, শেফালী, ইরা, অনিলা, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, শোভা, রঞ্জিতা, অঞ্জলী, যুঁথিকা, আন্না, সাঈদা কামাল, সুলতানা কামাল, ডাঃ সেতারা বেগম, খুকু আখতার, ডাঃ ডালিয়া সালাউদ্দিন, রেশমা, আসমা, জাকিয়া, পদ্মা, নীলিমা প্রমুখ। এরা সবাই অপরিচিত পরিবেশ ও অনিশ্চিত পরিবেশে কাজ করে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

জিনাতুননেসা তালুকদার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বামীর সাথে মুর্শিদাবাদে বাংলাদেশ থেকে আগত যুবক যুবতীদের ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে পাঠাবার জন্য নাম রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য গোবরা ক্যাম্পে গিয়ে ৩ মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করার দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই মহান দায়িত্ব পালন করেন।

টাঙ্গাইলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন খাদিজা সিদ্দিকী। স্বামী ডাক্তার হওয়ার কারণে অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের বাসায় আসতেন চিকিৎসার জন্য। স্বামীর পাশাপাশি খাদিজা সিদ্দীকিও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিতেন এমনকি ছোট অপারেশন ও বাসায় করতেন। এসময় তিনি মুক্তি যোদ্ধাদের ওষুধ সরবরাহ করতেন।

বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনে আশ্রয় নিয়ে বরিশাল শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেন রানী ভট্টাচার্য। ভারতে কুপার্স ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করেছেন ঝুনু সরকার। সুলতানা কামাল ভারতে যাবার পর জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আগরতলার সোনামুড়া, দারোগা বাগিচা ও বিশ্রামগঞ্জে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে সুলতানা কামাল স্বেচ্ছাসেবী নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি কোন প্রশিক্ষণ নেননি। তবে ডাক্তার ক্যাপ্টেন আখতারের সাথে কাজ করে তিনি কাজ শেখেন। সুলতানা কামাল পরে বাংলাদেশ হাসপাতালের সার্জিক্যাল ইউনিটের চার্জে ছিলেন। তাঁর ছোট বোন সাঈদা কামাল ছিলেন মেডিকেল ইউনিটের দায়িত্বে। তাদের সাথে সেবার কাজ করেন খুকু আহমদ, ডালিয়া সালাউদ্দিন, সবিতা মন্ডল, পদ্মা রহমান, নীলিমা আহমদ, মিনু বিল্লাহ, আসমা আলম, রেশমা আলম, জাকিয়া খাতুন প্রমুখ।

সাগরদীঘি হাসপাতাল ক্যাম্পে সেবার দায়িত্ব পালন করেন রোকেয়া বেগম। রোকেয়া বেগম গোবরা ক্যাম্পে তিন মাস প্রশিক্ষণ শেষে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য পনের দিন শিয়ালদহে রেলওয়ে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণ শেষ হলে রোকেয়া বেগম তার বোনসহ ছয়জনের একটি টিম মালদহে সাগরদীঘি হাসপাতাল ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেন।

লক্ষ্মী চক্রবর্তী মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নার্সিং শাখা কমিটি আয়োজিত নার্সিং প্রশিক্ষণে অংশ নেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ শেষ করে লক্ষ্মী চক্রবর্তী জি,বি হাসপাতাল ও ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে কাজ করেন। এ সময় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব পালন করেন।[৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

মমতা রায় ও শেফালী রায় সেবার কাজ করেন ঠাকুর নগর শরণার্থী ক্যাম্পে। ঠাকুরনগর শরণার্থী ক্যাম্পে কিছুদিন নার্সিং প্রশিক্ষণ নেবার পর আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শরনার্থীদের সেবা করেন। জুলাই থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত তাঁরা সেবার দায়িত্ব পালন করেন।[৯৪]

দেশের ভিতরে বিভিন্ন জেলা ও পাড়াতে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বহু মহিলা জীবন মরণকে উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। অর্থ সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারের দপ্তরে ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতেন। এতে কিছুটা হলেও প্রবাসী সরকার উপকৃত হয়েছেন। যা মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন রওশন হাসিনা, প্রনতি দস্তিদার, সোফিয়া করিম, বেগম মালেকা আশরাফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, কবি সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, নার্গিস জাফর, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, খোদেজা কিবরিয়া, বেবী কাশেম, আনোয়ারা বেগমসহ আরো অনেকে।[৯৫]

মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকবাহিনীর কড়া নজর ছিল সুফিয়া কামালের উপর। স্বাধীনতা যুদ্ধের পুরো নয়মাস তিনি তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে অবস্থান করেন। মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতো। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে যেসব প্রতিবেশী ও আত্মীয় নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান তাদের রেশন কার্ড সুফিয়া কামাল নিজের কাছে রেখে দেন। এবং এসব কার্ড দিয়ে তিনি রেশনের মালামাল তুলে নিজের বাসায় রাখেন। চাল, ডাল, আটা, পুরানো কাপড়, চোপর যা পেরেছেন সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। এসব কাজে ইডেন কলেজের কিছু ছাত্রী সাহায্য করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা পিছনের দেয়াল টপকিয়ে এসে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন শহীদুল্লাহ কায়সার। রাজাকাররা তাঁকে বারবার প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া সত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য অব্যাহত রাখেন।[৯৬]

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সর্বান্তঃকরণে একাত্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের সচেতন পর্যবেক্ষক ও সমর্থক ছিলেন জাহানারা ইমাম ও তাঁর পরিবার। ছেলে রুমী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। ২নং সেক্টরের গেরিলা যোদ্ধা। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন ইমাম পরিবার। ব্রীজ, কালভার্টের তালিকা বা ব্রীজের ঠিক কোন কোন পয়েন্টে কালভার্ট একস্‌প্লোসিভ বেঁধে ওড়ালে ব্রীজ ভাঙ্গবে অথচ দেশ স্বাধীন হবার পর খুব সহজে মেরামত করা যাবে তাঁর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও সময় সহ সরবরাহের দুঃসাহসিক কাজটি করে দিয়েছেন শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

ইঞ্জিনিয়ার। জাহানারা ইমাম মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন ওষুধ, খাবার, টাকা, সানগ্লাস, নেইলকাটার। মুক্তিযোদ্ধাদের যে কোন ধরণের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেনে জাহানারা ইমাম।[৯৭]

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম ও সক্রিয় ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। তাজউদ্দিন আহমদ ও শেখ ফজলুল হক মনির চিঠি আসতো তাঁর কাছে। সে অনুযায়ী তিনি কাজ করতেন।

রংপুরে মালেকা আশরাফ নিজ বাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দান সহ প্রয়োজনীয় খাবার, বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। যশোর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভানেত্রী রওশন হাসিনা নিজ এলাকাতে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গোপন আশ্রয় কেন্দ্র করেন এবং তাদের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ ও কাপড়সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ দায়িত্বে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠাতেন নূরুন্নাহার বেলী। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ, খাদ্য, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন রাজিয়া খাতুন, ডাঃ হালিমা খাতুন, দীপালি চৌধুরী, লায়লা সামাদ, এডলিন মালাকার, নাজনীন সুলতানা সহ আরো অনেকে।[৯৮]

আশ্রয়দাত্রী হিসেবে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন যশোর অঞ্চলের মিসেস ওসমান। তিনি রান্না করে খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন যুদ্ধ শিবিরে। ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর রাতে গুলিতে তিনি নিহত হন। চট্টগ্রামের আতিয়া মওলার 'কাকলী' বাড়ীটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। গোপাল গঞ্জের আনোয়ারা বেগম প্রতীক্ষায় থেকেছেন রাতে যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা খেতে আসে।[৯৯]

মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছেন নাজিরপুর থানার সামন্তগাতী গ্রামের যশোদা রানী। যশোদা রানীর বাড়ী ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। সেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অপারেশনে যেতেন। দীর্ঘ ২/৩ মাস তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পরম যত্নে রান্না করে খাইয়েছেন, বিভিন্ন রকম সাহায্য করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন ভারতে শরনার্থী হয়ে যাওয়া রাধা রানী রায়। নাজিরপুর এলাকার যত পরিচিত মুক্তিযোদ্ধা ভারতে গিয়েছেন, তাদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য দিতে কুন্ঠা করেননি নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও।[১০০]

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাঙালী জাতি যখন পাক বাহিনীর আক্রমণে এবং অনিশ্চিত জীবনে খাবি খাচ্ছিল তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান গুলো তাদের মনে প্রেরণা যোগায়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও তাদের কণ্ঠ থেকে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাদের অনুভূতি।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয় এবং এ সময়েই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচার প্রচারণার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন ডাঃ মঞ্জুলা আনোয়ার এবং অপর জন ছিলেন কাজী হোসনে আরা। এই বেতার কেন্দ্রে গান-বাজনা, সুর, নাটক, কথিকা, ধর্ম আলোচনা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন এ সময়ে। বিখ্যাত জল্লাদের দরবার; কাঠগড়ার আসামী; রণাঙ্গনের চিঠি; ইয়াহিয়া জবাব দাও; সোনার বাংলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সোনার বাংলা অনুষ্ঠানে কাজলীর মা এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন মাধুরী চট্টপাধ্যায়। নিয়মিত কলা কুশলী ছাড়াও কিছু অনিয়মিত বুদ্ধিজীবী এবং সুধী জ্ঞানীজন কথক অথবা ছোট গল্পকার হিসেবে নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে যেসব নারী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তারা হলেন বেগম মুশতারী শফী, ডাক্তার নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, কুলসুম আসাদ, নূরজাহান মাযহার, রাফিয়া আক্তার ডলি, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুন, রেখা আক্তার, জলি জাহানুর, দীপা ব্যানার্জী, শওকত আরা আজীজ, পারভীন আখতার প্রমুখ।[১০১]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা করা হয় চট্টগ্রামস্থ মুশতারী শফীর নিজস্ব বাসভবনে। এক্ষেত্রে বেগম মুশতারী শফী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ট্রানজিসটারের মাধ্যমে গোপনে ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, আকাশবানী ও অন্যান্য দেশের বাংলা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদ, মতামত ও পর্যালোচনা শুনে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' প্রচারের মেটেরিয়াল, সংবাদ বুলেটিন ইত্যাদি তৈরী কাজে মুশতারী শফি নিযুক্ত ছিলেন। আগষ্ট মাসে কলকাতায় গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দ সৈনিক ও নাট্য শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। এসময়ে তিনি উম্মে কুলসুম ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। বেতারে নিয়মিত নাটিকায় অংশ নেয়া ছাড়াও নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে 'জল্লাদের দরবার' নাটকে অংশগ্রহণ এবং 'অগ্নিশিখা' অনুষ্ঠানে গাজীউল হক রচিত অমিত্রাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দে 'এহিয়া বধ কাব্য' আবৃত্তি করা ও প্রতি সপ্তাহে ' বাংলার রণাঙ্গনে নারী' শীর্ষক স্বরচিত কথিকা পাঠ করা ছিল তার প্রধান কাজ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধের উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন কাজী রোজী। 'প্রতিনিধির কার্যতে' অন্যান্যের সাথে বক্তব্য রাখেন বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। স্বাধীন বাংলা বেতারে নাটক ও আবৃত্তি করেন লায়লা হাসান। নিয়মিত নাটক করতে ডাঃ কাজী তামান্না।[১০২]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজী সংবাদ পড়তেন পারভীন হোসেন ও নাসরীন আহমেদ শিলু। দেশের ভেতরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নিরাত্তার কারণে নাসরিন আহমেদ জারীন আহমাদ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তবে ভারত যেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সেদিন নাসরিণ আহমেদ তাঁর নিজের নামেই সংবাদ পাঠ করেন। তিনি ছিলেন কণ্ঠ শিল্পী কিন্তু প্রয়োজনে হলেন সংবাদ পাঠিকা।[১০৩] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পাঠের পর সংবাদ পর্যালোচনা করতেন শেফালী দাস। এছাড়া বিপ্লবী কবিতার অংশ বিশেষসহ স্লোগান দিতেন।[১০৪]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে সব কণ্ঠশিল্পী তাদের গানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী আপামর জনসাধারণকে উজ্জীবিত করেন তারা হলেন অমিতা বসু, কল্যানী ঘোষ, শাহীন সামাদ, হেনা বেগম, স্বপ্না রায়, মালাখান, রূপাখান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, রমা ভৌমিক, লায়লা জামান, মনজুলা দাশ গুপ্ত, উমা চৌধুরী, ঝর্না ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, কল্যানী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনাদাশ, সাবিনা বেগম, ভক্তি রায়, অর্চনা বসু, মিনু রায়, রীতা চ্যাটার্জী, ভারতী ঘোষ, শেফালী শ্যান্নাল, অরুণা সাহা, জয়ন্তী ভূইয়া, কুইন মাহজাবিন, গীতশ্রী সেন, মলিনা দাশ, মিতালী মুখার্জী, আফরোজা মামুন, বুলবুল মহলানবীশ প্রমুখ। শাহনাজ রহমতুল্লাহ বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে ও তার গান বাজানো হত। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন রানু খান।[১০৫]

কল্যানী ঘোষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে 'পূর্ব দিগন্তে সুর্য উঠেছে', 'নোঙ্গর তোল তোল', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব' সহ অসংখ্য গানে কণ্ঠ দিয়ে মুক্তি বাহিনীর মধ্যে এবং স্বাধীনতার পক্ষের জনসাধারণকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নমিতা ঘোষ ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠ দিতে শুরু করেন। ব্যারিষ্টার বাদল রশীদের নেতৃত্বে দিলীপ সোমের গীতি আলেখ্য নিয়ে চৌদ্দ সদস্যের একটি দলের সদস্য হিসেবে নমিতা ঘোষ ভারতের দিল্লী, বোম্বে, গোয়া, পুনা, কানপুর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে অর্থ সংগ্রহ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।[১০৬]

অনুপ্রেরণা মূলক গান গেয়ে সব মানুষকে প্রেরণা দেয়ার জন্য গঠিত হয়েছিল 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। যার সম্পাদক ছিলেন মাহমুদুর রহমান এবং সভানেত্রী ছিলেন সনজীদা খাতুন। মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা প্রথম অনুষ্ঠান করে রবীন্দ্রসদনে। একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান 'রূপান্তরের ইতিহাস' মঞ্চায়িত হয় রবীন্দ্রসদনে। এতে বাঙালী জাগরণের সমস্ত ইতিহাস ছিল। দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশের নিপীড়নের কথা জানানো হয়। শরণার্থী শিবির এবং মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা হত। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পীসংস্থায় ছিলেন ডালিয়া নওশীন, কল্যানী ঘোষ, উমা চৌধুরী, শাহীন সামাদ, দীপা বন্দোপাধ্যায়, সুমিতা নাহা, নায়লা, লুবনা, শীলা মোমেন সহ অনেকে।[১০৭]

সুমিতা নাহা 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' সাথে জড়িত হয়ে দিল্লী, আসানসোল সহ বিভিন্ন এলাকায় গান করে চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি আকাশ বানীতে অতিথি শিল্পী হিসেবে গান করেন। শীলা মোমেন তাঁর বোন শর্মিলা এবং নীলাসহ 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থায়' যোগ দেন। এরপর থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শহরে অবস্থিত শরণার্থী ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের মনোবল দৃঢ়তর করেন। দিল্লীসহ বিভিন্ন শহরে গান গেয়ে ভারত সহ বিশ্ববাসীর সমর্থন ও সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে "মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা"।

'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' শিল্পীরা মাঝে মাঝে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গিয়ে গান রেকর্ড করাতেন যা পরবর্তীকালে বাজানো হত। 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' গানটি 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' শিল্পীদের কণ্ঠে রেকর্ড করা।

'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার' অন্যতম শিল্পী হলেন শাহীন সামাদ। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গানের জন্য তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁদের গানের রিহার্সাল হতো কলকাতার ১৪৪ লেনিন স্মরনীতে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সংস্থার সাথে গান গেয়েছেন। অনেক জায়গায় শাহীন সামাদ নিজেই লিডিং সিঙ্গার হিসেবে কাজ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তাঁদের যুদ্ধভিত্তিক গান শোনান। বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে যে অর্থ আসতো তা দিয়ে ওষুধ, কম্বল, টিনফুড, বাসনপত্র কিনে শরনার্থী ক্যাম্পে পাঠানো হত। এছাড়া তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন শিল্পী ছিলেন। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত শাহীন সামাদ মুক্তিকামী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাঁর গানের মাধ্যমে প্রেরণা যুগিয়েছেন।[১০৮]

চলচ্চিত্র ও বেতারের নাট্য ও অভিনয় শিল্পীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বিভিন্ন নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সজীব করে তোলেন। এরা হলেন- মাধুরী চট্টপাধ্যায়, সুমিতা দেবী, করুণা রায়, নন্দিতা চট্টপাধ্যায়, কাজী তামান্না, উম্মে কুলসুম, সুফিয়া খাতুন, তাজিন মাহনাজ মুর্শিদা, দিলশাদ বেগম প্রমুখ।[১০৯]

চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কবরী সারোয়ার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনয় করে বাংলাদেশের দুস্থ মানুষের সাহায্য করেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের মনে দেশাত্ববোধ জাগ্রত করেন। 'বোম্বেতে সর্বদল সংহতি সম্মেলনে' (All party Bangladesh Solidarity Communication) একটা ভিন্নধর্মী অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের নারীদের করুণ অবস্থার কথা বুঝিয়ে দেন। এই ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি বাংলাদেশের উপর পড়ে। বিশ্ববাসীর জানতে চেষ্টা করে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা।[১১০]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন অনেক নারী। এরকম একজন শহীদ হলেন কবি মেহেরুন্নেসা। ছয়দফা থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছেন। তাঁর অনেক কবিতা স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। উত্তাল মার্চের প্রথম থেকে তিনি মিরপুরে মহিলাদের সংগঠিত করেন স্বাধীনতার দাবীতে। ৭ মার্চ মহিলাদের নিয়ে জনসভায় অংশ নেন। ২৩ মার্চ মিরপুর এলাকায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মেহেরুন্নেসা অসীম সাহস ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনতার সঙ্গে একাত্ম হন। বিহারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দাবী নিয়ে ছুটে যান শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীতে। তাঁর স্বরচিত কবিতা 'জনতা জেগেছে' পাঠ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সাহিত্য সভায় যাতে তাঁর আন্দোলনমূখী মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট ছিল। এসব কারণে অবাঙালী বিহারীরা ২৭ মার্চে মেহেরুন্নেসা সহ তাঁর মা

Dhaka University Institutional Repository

বাবা ভাই বোনকে হত্যা করে কবি মেহেরুন্নেসা মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম মহিলা শহীদ।[১১১]

মুক্তিযুদ্ধে অপর শহীদ হলেন সাংবাদিক সেলিনা পারভীন। সেলিনা পারভীন স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য নিয়ে প্রকাশ করেন 'শিলালিপি' নামক পত্রিকা। এতে প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের লেখা প্রকাশিত হত। পাকসেনা প্রধান রাওফরমান আলী তাঁর পত্রিকার লেখক কবি এবং বাংলার লোক শিল্পের অলংকার নিয়ে আঁকা প্রচ্ছদ পছন্দ করেননি। ফরমান আলী পরামর্শ দেন সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত পাকিস্তানী ভাবধারার লেখা ও ছবি দিয়ে শিলালিপি প্রকাশ করার। কিন্তু সেলিনা পারভীন তা করেন নি। 'শিলালিপি' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল বাংলাদেশের পতাকার ছবি। একারণে কালো তালিকা ভূক্ত হয় 'শিলালিপি'। আর পাক দোসর আলবদর, রাজাকারদের বুদ্ধিজীবী খুনের তালিকার মধ্যে পড়েন সেলিনা পারভীন। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, একটি জীপ এসে তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় এবং ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য বরেন্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে।[১১২]

পাকিস্তানী সেনাদের নির্মমতার আরেক শিকার ডাঃ আয়শা। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাঃ আয়শা চিকিৎসা এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ে এবং পাকবাহিনীর পরাজয়ের খবর পেয়ে উল্লাসিত ডাঃ আয়শা পাকবাহিনীদের হাতে বন্দী বেগম মুজিব ও তাঁর সন্তানদের বিজয়ের সংবাদ দিতে বের হন ১৮ নং বাড়ী থেকে। সেই মুহূর্তে ডাঃ আয়শাদের গাড়ী চোখে পরে পরাজিত পাকসেনাদের। তারা মুহূর্তে একটানা গুলি করে ঝাঝড়া করে দেয় গাড়ীটি। ডাঃ আয়শা দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন তখন গুলির আঘাতে ঘটনা স্থলেই তিনি নিহত হন।

পাকহানাদারদের হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হন শিক্ষাবিদ লুৎফুন্নাহার হেলেনা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন দুঃসাহসী সংগঠক। তিনি বেশ কিছু যুবককে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ৫ অক্টোবর মাগুরার মুক্তাঞ্চল মহম্মুদপুর থেকে পাকবাহিনীর দোসর আলশামস, রাজাকারা তাকে বন্দী করে লোমহর্ষক ভাবে হত্যা করে। শত্রুর হাতে ধরা পড়েও হেলেনা আত্মসমর্পণ করেননি। পাকবাহিণীর দোসররা তাঁকে জীপের সাথে বেঁধে শহর থেকে টেনে দেড় মাইল দুরে ওয়াপদা সংযোগ খাল পাড়ে নির্মম ভাবে হত্যা করে।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব থেকে এদেশের নারীসমাজের এক অগ্রণী অংশ সক্রিয়ভাবে কাজ করেন মুক্তিযুদ্ধের সফলতার লক্ষ্যে। নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ নারীই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে, শরণার্থী ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের কাজ বলতে ছিল মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ করা, সরকারী প্রশাসনিক কাজ করা, প্রচার করা, সংগঠিত করা, জনমত সৃষ্টি করা, প্রশিক্ষণ দেয়া এবং প্রশিক্ষণ নেয়া, অর্থ সংগ্রহ, ওষুধ, খাবার, কাপড় সংগ্রহ, চিকিৎসা করা, সেবা করা, প্রতিরোধ করা, যুদ্ধ করা, মনোবল তৈরী করা, উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগানো, আশ্রয় দেয়া, লেখা ও গানের মাধ্যমে মুক্তিকামী জনতাকে জাগিয়ে তোলা সহ প্রভৃতি কাজ। দেশের ভেতরে ও বাইরে ভারতে প্রবাসে, শহরে গ্রামে এসব কাজে নারী সমাজ অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর ও অস্ত্র আদান-প্রদানের কাজ করতে গিয়ে বহু নারী জীবন ও সম্ভ্রম হারানোর মত ঝুঁকি নিয়েছে। এভাবেই বাঙালী নারী পুরুষদের সম্মিলিত সংগ্রামের মরণপণ লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি বাংলাদেশ নামের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী নারী সমাজ অত্যন্ত বলিষ্ঠ গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. বদরুদ্দিন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৩৭৮ বাংলা), পৃ. ৬০।

২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১) পৃ. ৯৭।

৩. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গ বন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনষ্টিটিউ, ২০০১), পৃ. ৩৩।

৪. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, *পৃ.* ৩২।

৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮), ১ম খন্ড, পৃ. ১৭৭ ও ২৪৪।

৬. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০, ২৩৯, ১৪৩ ও ২৪৩।

৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক,*মুক্তি সংগ্রাম*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১২৭-২৮।

৮. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৩৩।

৯. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,১ম খন্ড, পৃ. ২০৫,২২৫,২৩৭ ও ২৫৩।

১০. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১,৬৭,১১৯,১২৫,১২৯,১৪৮,২৯,১৯৫ ও ২০৩।

১১. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, (ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২০-২১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

১৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তি সংগ্রাম*,পৃ. ১৭৬-৭৮।

১৪. দৈনিক *'পাকিস্তান'*,২মার্চ,১৯৭১।

১৫. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*,(ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ৮৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।

১৭. দৈনিক *সংবাদ*, ২ মার্চ, ১৯৭১।

১৮. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯,২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. দৈনিক *পাকিস্তান*, ৪ মার্চ, ১৯৭১।

২০. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, পৃ. ২৮।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২২. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড,পৃ. ২৪৬ ও ২৮০।

২৩. দৈনিক *পাকিস্তান*,৫ মার্চ, ১৯৭১।

২৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তি সংগ্রাম*, পৃ. ২০৫।

২৫. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০; সাক্ষাৎকার: কাজী রোকেয়া সুলতানা,সেন্টাল রোড, ঢাকা, ১২-৬-২০০৩।

২৬. দৈনিক *পাকিস্তান*, ৬মার্চ,১৯৭১।

২৭. প্রাগুক্ত,

২৮. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

২৯. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*,(ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৭।

৩০. নাজিমুদ্দিন মানিক, *৭১' অসহযোগ আন্দোলনের দিন গুলি*,(ঢাকাঃ ওয়ারি বুক সেন্টার, ১৯৯২), পৃ. ৪৩।

৩১. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিন গুলিঃ মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, পৃ. ৬৪-৬৫।

৩২. দৈনিক *সংবাদ*, ৭মার্চ, ১৯৭১।

৩৩. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য(সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৮ ও ১৯৫।

৩৪. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*,(ঢাকাঃ সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১৯৯৮), পৃ. ৩০০।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ*, (হাক্কানী পাবলিশার্সঃ কলকাতা বই মেলা,১৯৯৯), পৃ. ২৯১-৯২।

৩৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*,১০মার্চ, ১৯৭১।

৩৭. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৩৮।

৩৮. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামঃ মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*,(চট্টগ্রাম ঃ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র,১৯৯৩), পৃ. ২৩১,২৩২ ও ৩০৮।

৩৯. রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয় মাস*,(ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী,১৯৯১), পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪০. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, পৃ. ২৯৭,২৯৮,৩০২।

৪১. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, পৃ. ৬৮।

৪২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৮।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৪৪. রাবেয়া খাতুন, একাত্তরের নয় মাস, পৃ. ৫,৬।

৪৫. নাজিমুদ্দিন মানিক, *একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি*, পৃ. ৫।

৪৬. আতিউর রহমান, অসহযোগের দিনগুলি, পৃ. ১৪৩,১৪৪।

৪৭. মাহফূজুর রহমান, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামঃ মুক্তি যুদ্ধে চট্টগ্রাম*, পৃ. ২৩২।

৪৮. আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

৪৯. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী,(ঢাকা ঃ প্যাপিরাস ১৯৯৯),পৃ. ৪৫।

৫০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য(সম্পাদিত), ১ম খন্ড, পৃ. ২১৩,২১৭,২৪৪,২৬২,২৬৫; ২য় খন্ড, পৃ. ২১০,২৩৪,২৯৩।

৫১. প্রাগুক্ত,১ম খন্ড, পৃ. ১৯৫,২২৯,২৫১,২৫৬; ২য় খন্ড, পৃ. ১২৬,১৪৯,২০২,২২২।

৫২. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড,পৃ. ২৫১।

৫৩. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৬।

৫৪. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৯।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৫৭. সাক্ষৎকার: কাজী রোকেয়া সুলতানা, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ১৪-৬-২০০৩; প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড,পৃ. ২৬৫।

৫৮. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৪০।

৫৯. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধে নারী*,পৃ. ৩০১।

৬০. আবুল কাসেম ফজলূল হক, *মুক্তি সংগ্রাম*, পৃ. ২৩৮।

৬১. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬২. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১০৩।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, পৃ. ৩১১।

৬৪. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পৃ. ১১৮-১৯।

৬৫. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৪১-৪২।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯।

৬৭. মুক্তিযোদ্ধা নারীদের সম্বর্ধনা ও লোক সঙ্গীত প্রতিবেদন, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮),পৃ. ১৬।

৬৮. মালেকা বেগম, একাত্তরের নারী, পৃ. ১০৭-৯।

৬৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য(সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,১ম খন্ড, পৃ. ১৭৭,১৮১,২১৫,১৫৬,২৫৪।

৬৯ক. সাক্ষাৎকার কাজী রোকেয়া সুলতানা, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ১৪-৬-০৩।

৭০. প্রাগুক্ত,২য়খন্ড,পৃ.২,৪,২৯,১৪৪,১৯৭,১৯১,১৯৪,২২৯,১২৭,২৭৪ ও ২১১।

৭১. শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*,(ঢাকাঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮), পৃ. ৩২,৩৩,৬২,৩৫-৩৬।

৭২. সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬-১৭,৫৫।

৭৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৩-৩৬।

৭৪. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, (ঢাকাঃ নিউএজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ৫৪।

৭৫. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত,১ম খন্ড, পৃ. ২৪১-৪২।

৭৬. তপন কুমার দে, মুক্তি যুদ্ধে নারী সমাজ, পৃ. ৪৭-৪৮।

৭৭. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৮৬-৮৮,৮৩-৮৪,৯১-৯২।

৭৮. শচীন কর্মকার (সম্পাদিত), *মুক্তি যোদ্ধা বিজয় মিলন ২০০০*, মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর স্মরনিকা, (ঢাকাঃ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তন, ২০০০), পৃ. ২৩।

৭৯. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকাঃ ন্যাশন্যাল পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৪০-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,২য় খন্ড, পৃ. ২৮৫-৮৬,২৪৯।

৮১. দৈনিক *'জনকণ্ঠ'*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৮২. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৯,২৫১; ২য় খন্ড,২২২।

৮৩. প্রাগুক্ত,১ম খন্ড, পৃ. ১৮৮,১৮৯,২২৫।

৮৪. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ঢাকার গেরিলা অপারেশন*,(ঢাকাঃ নগর যাদুঘর, ১৯৭২), পৃ. ৭২-৭৪।

৮৫. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৯৩,১০৬,১১৭।

৮৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬,২৮১,২৪০,৬৪,১০৭,২৫৪।

৮৭. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তি যোদ্ধা*, পৃ. ৮৮-৯১।

৮৮. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, পৃ. ৭১,১০৯।

৮৯. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, পৃ. ৬১-৬৩,৬৬-৬৭ ও ৪২-৪৩।

৯০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, পৃ. ১৮৬,১৯৮,২০৩।

৯১. ফোরকান বেগম,*স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধে নারী*,পৃ. ৮১-৮৩ ও ১৩৮।

৯২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪৭।

৯৩. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত,১ম খন্ড, পৃ. ২০৫; ২য় খন্ড,পৃ. ১৩০,৪২,১৪১,১৮৭,২৮৯,২৯২।

৯৪. সাক্ষাৎকারঃ মমতা রায়, ১৮ জুন, ২০০১, ঢাকা।

৯৫. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, পৃ. ৯।

৯৬. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ১৪৯।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

৯৮. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড*,পৃ. ৪৬-৪৭, ৭৫,১১১ও ১৫৪।

৯৯. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, পৃ. ৪৭।

১০০. সাক্ষাৎকারঃ মমতা রায়, ১৮ জুন, ২০০১, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১০১. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, পৃ. ৮৪-৮৭।

১০২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৪,২৩৫ ও ২০৩।

১০৩. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১), পৃ. ৬৯।

১০৪. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত,২য় খন্ড, পৃ. ১৫০।

১০৫. মেহেরুন্নেসা মেরী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৪-৮৭।

১০৬. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত) প্রাগুক্ত,২য় খন্ড, পৃ. ১৫৪,১৯৮।

১০৭. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৬।

১০৮. সেলিনা হোসেন(সম্পাদিত) *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*,২য় খন্ড, পৃ.২২৮,২১৭,২৩৩।

১০৯. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, পৃ. ৮৪-৮৭।

১১০. প্রাগুক্ত।

১১১. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, (ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯), পৃ. ১৫১-১৫২।

১১২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ২৭৮-২৮০।

১১৩. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, পৃ. ৩৯-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয় চেতনা বিকাশে নারী।

দুর্বল রাজনৈতিক ভিত নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐকের একমাত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করতে থাকেন ধর্মকে। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষমতা হস্তগত করে নেন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাঙালীর ন্যায্য অধিকারকে অস্বীকার করতে থাকেন। ফলে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতিকেও দমিয়ে রাখতে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছে পাকিস্তানী শাসক বর্গ। এবং তাদের এই সুপরিকল্পিত হামলায় প্রথম শিকার বাংলা ভাষা। বিভিন্ন সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম পন্থায় তারা বাঙালী সংস্কৃতিকে অবদমনের চেষ্টা চালাতে থাকে। যেমনঃ পূর্ববাংলার দীর্ঘ দিনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের পূর্ব নাম বহাল রাখা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস পাকিস্তানী মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন এই অজুহাতে বহু বাঙালী কবি ও সাহিত্যিক এবং তাদের লেখাকে নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু ভাষা কিংবা লেখাই নয় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানীদের আচার-আচরণ সহ বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তির বিরূপ সমালোচনা করতে থাকে। সামরিক শাসনামলে এই হামলা প্রকট আকার ধারণ করে।[১]

পশ্চিম পাকিস্তানীদের ক্রমাগত আঘাতে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ক্রোধ ধূমায়িত হতে থাকে। ১৯৪৭ সাল থেকে যে ধুমায়িত অগ্নিশিখা গ্রাস করে শোষক শ্রেনীর সমগ্র সত্তাকে-তা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আসার আগে থেকেই ছাত্র, তরুণ, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, নারীসমাজ, শ্রমিক এমন কি সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই এদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে সম্পৃক্ত হয়। কেউ সরাসরি কেউবা পরোক্ষভাবে। আর এভাবেই আমাদের মুক্তি পথের সোপান তৈরি হচ্ছিল। এই লক্ষ্যেপৌঁছবার জন্য আমাদের বার বার রক্তক্ষয়ী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অবতীর্ন হতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪র সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারী এদেশের রাজনৈতিক অগ্রসরতাকে রুখে দেয়, গ্রেফতার হয় অগনিত রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ছাত্র নেতা। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র বার্ষিকী পালন, ১৯৬২ সালে আইয়ুব শাহীর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্র সমাজের দুঃসাহসী প্রতিবাদ,৬৮-৬৯ এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান,৭০' এ সাধারণ নির্বাচন, সর্বশেষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ। উল্লেখিত সময়ে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আপন গতিতে এগিয়ে গেছে। রাজনীতি সচেতন বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বহু সাংস্কৃতিক কর্মী তৈরি হয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে স্বল্প মাত্রায় হলে ও এদেশের নারীর অংশ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চাশ ঘাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে নগরে বন্দরে ও গ্রামে। প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের চেতনা থেকে দাবী আদায়ের উচ্চারণ সোচ্চার হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এর মধ্য দিয়ে।[২]

এসব সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমূহ জনগণকে অধিকার সচেতন করে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি, সংগঠক হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও এর মাধ্যেমে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে নারীর ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনকে বাঙালী শিক্ষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ সমর্থন দেয়। তাই বলে তারা তাদের আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভুলে যায়নি। পাকিস্তান নামে স্বাধীন হবার আগেই রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্বতা সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক আগে (১৯২০) এর দশকে বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন তথা "শিখা গোষ্ঠীর" আন্দোলনের মাধ্যমে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এরই ধারাক্রমে ১৯৪২ সালে গড়ে ওঠে "পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি"। বাঙালী মুসলমানের বুদ্ধিভিত্তিক এই আন্দোলনে ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রেরণা।[৩]

কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সাফল্যের শুরু থেকে অর্থাৎ তদানীন্তন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা ঘোষণা করার সময় থেকে অনেকের কাছে প্রতীয়মান হয়ে উঠে যে, ক্ষমতা গেলেও মুসলিম লীগের হাতে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের কোন পরিকল্পনা নেই। এই সাংস্কৃতিক শূণ্যতা পুরণের উদ্যোগ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবুল কাশেম (১৯২০-১৯৯২) ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে "তমদ্দুন মজলিশ" গঠনের মাধ্যমে। তমদ্দুন মজলিশের লক্ষ্য ছিলঃ

Dhaka University Institutional Repository

১) বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২) সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। যেহেতু এদেশের জনসাধারণের শতকরা ৮০ ভাগের ও বেশী মুসলমান, তাই এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৩) সাহিত্যিকে অশ্লীলতামুক্ত ও গণমূখী করতে হবে।

৪) জনসাধারণকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হবে।

৫) নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

৬) আদর্শবাদী যুব সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। তানা হলে পাকিস্তান এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৭) পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তমদ্দুন মজলিশের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, হাসান ইকবাল, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফাকামাল, বদরুদ্দিন উমর, এনামুল হক,দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রমূখ। তমদ্দুন মজলিশের মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ও দ্যুতি পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকে তমদ্দুন মজলিশের নীতি আদর্শের সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। এরা হলেন মোঃ মাহফূজ উল্লাহ (জন্মঃ১৯৩৬),মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-৯১), আনোয়ারউদ্দিন, মাহফুজুলহক, তালুকদার মনিরুজ্জামান এবং ফেরদৌসী বেগম প্রমূখ।[৪]

বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা ঘোষণার দাবী প্রথম উত্থাপন এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী করে তমদ্দুন মজলিশ। বাংলা ভাষার সঠিক মর্যাদা দান ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে মজলিসের তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগেই ভাষা প্রশ্নে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মজলিশের উদ্যোগেই ভাষা সমস্যার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্ক ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানী সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, সভা প্রভৃতির আয়োজন করে তমদ্দুন মজলিশ। ভাষা সমস্যা রাজনৈতিক মর্যাদা লাভের পিছনে ও এই সংগঠন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মজলিশের মূখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতীয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ যতদিন এটা নিছক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল তত দিন মজলিশের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভাষা প্রশ্নটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিলে মজলিশের প্রভাব কমতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মজলিশের প্রভাব থাকে না।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

❑ মহিলা সমিতি ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে বেগম সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী এবং যুঁইফুল রায় ও নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে "পূর্বপাকিস্তান মহিলা সমিতি"গঠিত হয়। যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পুর্ণিমা বকশী, মজিরা খাতুন, মনোরমা বসু, হেনা দাস,জ্যোৎস্না নিয়োগী, ভানুদেবী, অর্পনা প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন এই মহিলা সমিতির উদ্যোক্তা। প্রগতিশীল নারীদের সংগঠন ছিল মহিলা সমিতি। মহিলা সমিতি কোন সাহিত্য -সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিলনা। একটা প্রগতিশীল সংগঠন হিসাবে নারীশিক্ষা সংকোচনের সরকারী নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধসহ সরকারের বিভিন্ন দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে মহিলা সমিতি আন্দোলন করে। ১৯৫০ সালের দিকে এসে মহিলা সমিতির সাথে যুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সামিনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন,নেলী বেগম, হালিমা খাতুন প্রমূখ। ১৯৫১ সালে বেগম সুফিয়া কামাল ও দৌলতুন্নেসা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঢাকা শহর 'শিশু রক্ষা সমিতি'।১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও মহিলা সমিতি তার কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে গুলির সংবাদে ১২নং অভয়দাস লেনে বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে মহিলারা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ করেন ও একটি নিন্দা প্রস্তাব আনেন। ২৮ ফেব্রুয়ারীতে পুরানা পল্টনে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে মহিলাদের সভা হয়। নূরজাহান মোর্শেদ ও লায়লা সামাদ বক্তৃতা করেন। শিশু রক্ষা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কর্মী সদস্যরা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। মহিলাদের সভা করা,'সর্ব দলীয় সংগ্রাম পরিষদের' লিফলেট বিলি করা,মহিলাদের মধ্যে সঠিক বক্তব্য পৌঁছানো ইত্যাদি কাজে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন বেগম সুফিয়া কামাল, হালিমা খাতুন, নূরজাহান মোর্শেদ, আফসারী খানম সহ আরো অনেকে। [৬]

❑ সংস্কৃতি সংসদ ১৯৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন "সংস্কৃতি সংসদ" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। সংস্কৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), কবি এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান, ওবায়েদ হক সরকার, মরহুম আনওয়ারুল আজীম। এ সংসদ গঠনে অনুপ্রেরণা যোগান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও খান সারওয়ার মোর্শেদ। সংস্কৃতি সংসদ প্রথম থেকেই ছিল কমুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন। যার কারণে সংস্কৃতি সংসদের আদর্শও ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও রুশ বিপ্লব প্রভাবিত। প্রতিষ্ঠিত হবার পর সংস্কৃতি সংসদের কর্ম কান্ড প্রধানত নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এবং এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চায়নের মধ্যদিয়ে। ১৯৫১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাহবুব আলী ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সংসদের নাটকের নারী চরিত্রে প্রথম বারের মত ছাত্রদের পরিবর্তে ছাত্রীরা অভিনয় করেন। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে মুসলমান ছেলেদের পক্ষেই নাটক অভিনয় করা সহজ সাধ্য ছিলনা। সেখানে মেয়েরা ছেলেদের সাথে নাটকে অভিনয় করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। নারী চরিত্রে অভিনয় করেন মিস নুরুন্নাহার, মিসেস রোকেয়া কবীর (শিক্ষিকা) ও মিসেস লায়লা সামাদ। অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর নীলক্ষেতের বাস ভবনে রিহার্সালের ব্যবস্থা করেন লিলি চৌধরী।[৭]

সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে সে সময়ের বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি জড়িত হন। সংস্কৃতি সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন ডঃ খান সরওয়ার মুরশিদ (অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ), সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম। অন্যরা হলেন শহীদ আনম গোলাম মোস্তফা, মুজিবুর রহমান খান, মমতাজ উদ্দিন আহমদ,সন্‌জীদা খাতুন, বজলুল করিম, আবদুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দু মজুমদার, আসাদ চৌধুরী ,রশীদ হায়দার প্রমূখের সাথে ফরিদা বারী মালিক, কামরুন্নাহার লাইলী, জহরত আরা খানম, ফাহমিদা খাতুন, ফেরদৌসী মজুমদার, মালেকা বেগম ও সুলতানা রেবু প্রমুখ।[৮]

এছাড়া সংস্কৃতি সংসদের ১৯৬৫ সালের কার্যকরী পরিষদে বেশ কয়েকজন মহিলা গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। যেমন-সহ সভাপতি পদে ফারুক আলমগীর, নরেন বিশ্বাস সহ অন্যান্যের সাথে ছিলেন জিনাত ইসলাম, নিলুফার আহমদ। সহ সম্পাদক পদে-নার্গিস আবেদ,প্রমোদ সম্পাদিকা-আবেদা বেগম, সাহিত্য সম্পাদক পদে সহযোগী সদস্য ছিলেন হাসনা হেনা বকুল, নাট্য সম্পাদক পদের সহযোগী ছিলেন আখতার জাহান বেগম।[৯]

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সন্মেলন, চট্টগ্রাম ১৯৫১

চট্টগ্রাম প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা ১৯৪৭ সালে 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক' নামে পর পর দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিকের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে ১৯৫১ সালের ১৬মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করা হয় অধ্যাপক আবুল ফজলকে (শিক্ষক চট্টগ্রাম কলেজ)। সম্মেলনের সংবাদ পেয়ে ঢাকার মর্নিং নিউজ ও দৈনিক আজাদ এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। তারা প্রচার করে যে কম্যুনিষ্টরাই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। ফলে ঢাকার অনেক সাহিত্য ব্যক্তিত্ব সম্মেলনে অংশ

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া থেকে বিরত থাকেন। এতদসত্ত্বেও আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং বেগম সুফিয়া কামাল যথাক্রমে সম্মেলনে মূল সভাপতি এবং প্রধান অথিতি হিসাবে যোগদান করেন। [১০]

সম্মেলনে পূর্ববাংলার সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্নীত হয়,এবং প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ নিজেদেরকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক রবীন্দ্র নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।[১১] বেগম সুফিয়া কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন,

> ভাষা ও ভাবের চাকচিক্য, বিদেশী সাহিত্যের ধার করা জৌলুষ যার সঙ্গে লেখকের অন্তরের পরিচয় পরিণয় ঘটেনি, বৃন্ত ছেড়া বাসীফুলের মত তা ম্লান হয়ে যেতে কিছু মাত্র দেরী লাগেনা। গতবিশ বছরের মধ্যে এমন বহু চকচকে ও ধারালো অথচ জাতীয় চিত্তের সঙ্গে যোগসূত্রহীন কৃত্রিম লেখাই পাঠকের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে। দেশের মাটি, পানি, বায়ু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে, দেশকে ভাল করে না জানলে যে নিজেদের বিকাশ সম্ভব নয়- এ কথা উল্লেখ করে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, সৃষ্টির জন্য ভালবাসার ছেয়ে যাদুমন্ত্র আর নেই। তিনি আরো বলেন,'ভালবাসুন, দেশকে ভালবাসুন, দেশের শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভালবাসুন'।[১২]

□ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ১৯৫২

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তানী শাসকরা প্রগতিশীল যে কোন আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। যে কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের কার্যক্রমে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তারা পূর্বতন অখন্ড বাংলার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৩]

তারা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য,ধারা বাহিকতা ও মানবতাবাদকে দ্বিখন্ডিত করার সচেতন প্রয়াস শুরু করে। সৈয়দ আলী আহসান 'দৈনিক আজাদ' এবং সরকার পরিচালিত 'মাহে নও' পত্রিকায় নিয়মিত লেখার মাধ্যমে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির পথ নির্দেশ করার জোর চেষ্টা চালান। তিনি বাংলা সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে পূর্ণ ইসলামী জীবনধারা ভিত্তিক নতুন সাহিত্য রচনার পরামর্শ দেন। [১৪]

Dhaka University Institutional Repository

এই অপচেষ্টা সম্মিলিত ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য নতুন সংগঠন ও শিল্পী গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তব কারণে 'প্রগতি লেখক সংঘ' পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব ছিলনা। তবে ইসলাম মনা লেখকদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য উদারপন্থী ও প্রগতিশীল লেখকেরা নতুন করে একই মঞ্চে সমবেত হয়ে ১৯৫২ সালের শেষ দিকে 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন সংসদের সভাপতি। পাকিস্তান সাহিত্য সংস্যদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, মুনীর চৌধুরী, আব্দুল গনি হাজারী, আনিসুজ্জামান প্রমুখ সাহিত্য ব্যক্তিত্বদের সাথে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামালও লায়লা সামাদ।[১৫]

১৯৫২ সালে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠনের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু ছিল। ১৯৫৪-৫৭ সালের জন্য পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি পদে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন (আব্দুল গনি হাজারী, অজিত গুহ, শওকত ওসমান) বেগম সুফিয়া কামাল। সদস্য ছিলেন লায়লা সামাদ। পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কর্মতৎপরতা প্রধানত আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য বৈঠকের বাইরে তেমন কোন বড় ধরনের কার্যক্রম ছিলনা। তবে ১৯৫৪ সালের ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল ঢাকায় যে সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় তাতে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৪ সালের ১৫ এপ্রিল সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে লায়লা সামাদ লিখেছেনঃ

> নববর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন হাসান [হাসান হাফিজুর রহমান] এবং আরও কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক। সেদিন সকালে সংসদের বার্ষিক অধিবেশন হয় ও সংসদের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য 'শকুন্তলা' মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা হয়। এই নৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনা পরিচালনা ব্যবস্থাপনা এমনকি মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার সবকিছুর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। .....ইত্তেফাক লেখে, এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে।[১৬]

১৯৫৪ সালের ১০মে সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে ফজলুল হক মিলনায়তনে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। ২৭ মে ১৯৫৪ সালে একই স্থানে পালিত হয় নজরুল জয়ন্তী। ১৪নভেম্বর (১৯৫৪) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর মৃত্যতে সাহিত্য সংসদ শোকসভার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনায় অংশ নেন বেগম সুফিয়া কামাল। ১৯৫৫ সালে ১৫ এপ্রিল সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল, গান পরিবেশন করেন লতিফা রশীদ। ঢাকা হল মিলনায়তনে নববর্ষের এই অনুষ্ঠানটি হয়।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ কর্মীরা ১৯৫৩ সালের মার্চে "একুশে ফেব্রুয়ারী" নামে একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশ করেন। কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ভাষা আন্দোলনের স্মারক এই সংকলনটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে মাইল ফলক হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকবে।[১৭] পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কার্যক্রম স্থায়ী হয়েছিল ৬ বৎসর। এই স্বল্প কালেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে এই সংগঠনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারীর পর পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের বিলোপ ঘটে।

❑ পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনঃ কুমিল্লা ১৯৫২

১৯৫২ সালের ২২,২৩ ও ২৪ আগষ্ট 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিস' এর উদ্যোগে কুমিল্লা শহরে 'পূর্বপাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠানে ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ,কম্যুনিষ্ট পার্টি, রেভোলিউশনারী সোশালিষ্ট পার্টিসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কুমিল্লা শাখা সমূহ সহযোগিতা করেছিল।[১৮] তাছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশ নিয়েছিলেন যেমন- চট্টগ্রাম এর প্রান্তিক শিল্পী সংঘ ও রেলওয়ে শিল্পী সংঘ ঢাকার আর্ট স্কুল, পূর্ব পাকিস্তান শিল্পীসংসদ, বেতার শিল্পী, অগ্রণী শিল্পী সংঘ,অগত্যা গ্রুপ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক।[১৯]

সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'আহবান' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, পাকিস্তানোত্তর কালে জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি 'মোহ মুক্ত চিত্তে' পর্যালোচনা করা সম্মেলনের লক্ষ্য। উদ্যোক্তারা সে জন্য জাতি ধর্ম, শিক্ষিত, অশিক্ষিত , বিত্তহীন, বিত্তশালী নির্বিশেষে এবং যে বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নীরবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ গঠন ও ধারণ করে আসছে, তাদের সবাইকে সম্মেলনে যোগদান করার আহবান জানান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুর্নবিন্যাস এবং 'ভদ্র সংস্কৃতি' ও লোক সংস্কৃতির সমন্বিত করণের ওপর জোর দেন। মূল সভাপতি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন: "আজ তারা সম্ভবত দেশকে পাপের গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চায়। তারা প্রশ্ন তুলেছে যে বাংলা আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যম হতে পারে না.....সংস্কৃতি ধ্বংস করার অনেক উপায় আছে। গণ বিরোধীও সমাজ বিরোধী কঠোরনীতি তন্মধ্যে একটি। কিন্তু তাদের এই নীতিকে অবশ্যই পারস্য বাসীর কাছে পরাজিত আরবদের মত ভাগ্য বরণ করতে হবে"।[২০]

সম্মেলনের প্রতিদিনের অনুষ্ঠান দুইপর্বে বিভক্ত ছিল; সকালে প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা , বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঢাকা আর্টস্কুল একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে কুমিল্লা টাউন হলের থিও সফিক্যাল ভবনে। বেগম সুফিয়া কামাল এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। [২১] সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ করেন লায়লা সামাদ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'সংস্কৃতি সংকট', বেগম হাশমত রশীদ 'নারী প্রগতি', রওশন ইয়াজদানী 'ময়মনসিংহের লোকগাঁথা', মিসেস জিনাত গনি নৃত্য প্রসঙ্গে। [২২]

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি পরিবেশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক মঞ্চস্থ করে এবং কবিয়াল রমেশশীল 'যুদ্ধবনাম শান্তি' পালা গান পরিবেশন করেন। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দমন করার ঘৃন্য প্রয়াসের নিন্দা করা হয়। অপর প্রস্তাবে যুদ্ধকে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফুর্ত বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং শান্তির পক্ষ্যে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সম্মেলনে শান্তি ও প্রগতির ভিত্তিতে জীবন গঠনের দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত ঘোষাণা করা হয়।[২৩]

কুমিল্লা সম্মেলন ছিল দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে একটি বড় ধরনের অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। উদ্যোক্তারা পূর্ববাংলায় নিজেরাই নিজেদের সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্মানের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। যার কারণে উদ্যোক্তারা সম্মেলনে কোন ভারতীয় লেখককে আমন্ত্রণ জানাননী সর্বোপরি সন্মেলনের মূল আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী । এই সন্মেলন পুর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখা এবং জনগণের জীবন ধারা অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও গণমূখী সাহিত্য সৃষ্টিতে সবাইকে সংশ্লিষ্ট করার দর্শনকে তুলে ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

□ ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫২

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ

> আমরা যদি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তবে প্রথমে 'ইসলামী রাষ্ট্রের' স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পরিস্কার ধারণা করে নেবো। আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে চাই । ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানব কল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোন গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে এবং অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই।[২৪]

চারদিন ব্যাপী এই ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিলঃ সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান।

সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ও যুদ্ধ বিরোধী তৃতীয় ব্লক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধি করার জন্য'ইসলামিক কালচারাল কনফারেন্স' নামের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা,দেশী- বিদেশী সকল প্রকার অশ্লীল যৌন প্রচার পত্রিকাকে পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষণা করা, পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহবান করে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশ শাসন করার জন্য সরকারের নিন্দা করা হয়।[২৫] তবে এই সম্মেলনে ইসলামী ভাবধারা প্রচারিত হলেও এই সম্মেলনে পূর্ববাংলার ভাষা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির নিজস্বতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। এ সম্মেলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিলনা বললে চলে।

□ বেগম ক্লাব ১৯৫৪

নারীর অধিকার ও সমাজ উন্নয়নের উন্নয়ন কাজ নিয়ে ইতিপূর্বে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের কাজ শুরু হলেও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার জন্য আগ্রহী মহিলাদের কোন সংগঠন ছিলনা। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন এর পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'বেগম' পত্রিকা ও ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাব' পূর্ব পাকিস্তানের মহিলাদের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলো। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। দেশের

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সমাজসেবী সাহিত্যিক শিল্পীদের পারস্পারিক ভাবের আদান প্রদান করা, মতবিনিময় করা এবং নারী প্রগতি, মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে সম্মিলিত কর্মসূচী নেয়ার জন্য 'বেগম ক্লাব' যথেষ্ঠ ভুমিকা রেখেছে। বিশেষতঃ ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এদেশের নারী সমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা সাধনা, নারী সমাজের বিভিন্ন খবর, নারী আন্দোলনের নানা বিষয়ের ওপর মতামত প্রকাশ করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার সুযোগ করে দেয়া, গ্রাম বাংলার মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি কাজে 'বেগমে'র ভূমিকা ছিল। নানা মত ও সংগঠনের সদস্যরা বেগম ক্লাবে যুক্ত হয়েছিলেন। 'বেগম' এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ থেকেই বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন সম্মানিত কবি ও সমাজ সেবী। শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হোসনে আরা মোদাব্বের, খোদেজা খাতুন, সারা তৈফুর, জোবেদা খাতুন, লুলু বিলকিস বানু, শাহজাদী বেগম, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, খালেদা ফ্যান্সি খানম, সেলিনা বাহার চৌধুরী প্রমুখ মহিলা ও তরুণী বেগম ক্লাবে সমবেত হতেন। [২৬]

□ পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দল গুলোর রাজনৈতিক নির্বাচনী জোট 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হলে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি কর্মীরা ও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হন। কয়েকবার তারিখ পরিবর্তিত হবার পর শেষ পর্যন্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের ২৩ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত । ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্মেলন এর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের মূলনীতি পাওয়া যায় ১০৮ জন শিল্পী সাহিত্যিকের এক যুক্ত আবেদন পত্রে। বিবৃতি দাতারা ছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ববাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্যকে তাঁরা তাঁদের মূলমন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা তাদের দায়িত্ব হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি, দেশ-মানবের হিতার্থে সৃষ্টি ক্ষমতাকে নিয়োজিত করা। বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যকে প্রবাহমান ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা এবং জাতি- ধর্ম- বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায্য আসনের জন্য চেষ্টা করা। [২৭]

সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে দৈনিক আজাদে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হতে চার শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান

Dhaka University Institutional Repository

করবেন, পঞ্চাশ জনের অধিক মহিলা প্রতিনিধি ও সম্মেলনে যোগদান করবেন।[২৮]

চট্টগ্রাম থেকেই প্রায় দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং এর মধ্যে কুড়ি জন রয়েছেন মহিলা প্রতিনিধি। জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজে যথাক্রমে সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিন অর্থ্যাৎ ২৩ এপ্রিলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সভাপতিত্ব করেন ডঃ আবদুর গফুর সিদ্দিকী। জনাব আব্দুল লতিফ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'গান গেয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।[২৯]

সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে ভাষা ও সাহিত্য শাখা এবং বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও ডঃ কুদরত-ই-খুদা। অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, ডাঃ শচীন্দ্র মোহন মিত্র প্রমুখ অন্যান্যদের সাথে বেগম মেহের কবির। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বেগম সুফিয়া কামালের অনুপস্থিতিতে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ। প্রথমে নজরুল গীতির আসরে অংশ নেন আব্দুল লতিফ, শেখ লুৎফর ও মাহবুবা হাসনাত প্রমূখ। অনূষ্ঠানে 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' নামক একটি ছায়ানাট্য পেশ করে চট্টগ্রামের লোক সংস্কৃতি পরিষদ। এতে লবনের দুর্মূল্য, খুলনার দুভিক্ষ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও প্রদেশের গত সাধারণ নির্বাচনের দৃশ্য দেখানো হয়। এর পর খান বাহাদুর আমিনুল হক লিখিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কাফের' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন ফজলুর রহমান ও লায়লা সামাদ।[৩০]

২৬ এপ্রিল (১৯৫৪) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শওকত ওসমান (১৯১৯-৯৮) ঢাকা সংস্কৃতি সংসদের শিল্পীরা এ অনুষ্ঠানে মেঘনাদ বদ কাব্যের একটি দৃশ্য পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে অংশ নেন ফরিদা বারী মল্লিক, সনজীদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দীন এবং মালেকা আজিজ। ঢাকা সংস্কৃতি সংসদ 'কবর' একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করে।[৩১]

মোটামুটি সফল ভাবে এই সম্মেলন সমাপ্ত হলেও এ সম্মেলন সমালোচনার সম্মুখীন হয়-এ দেশীয় ইসলামী ও পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সম্মেলন শুরুর দিনেই উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিবৃতি দেন। সঙ্গীত শিল্পী মোহাম্মাদ হোসেন খসরু, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আব্দুল হালিম চৌধুরী,লায়লা আর্জুমান্দ বানু প্রমূখ।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

❑ বুলবুল ললিত কলা একাডেমী ১৯৫৫

উপমহাদেশের বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী বুল বুল চৌধুরীর স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৫৫ সালের ১৭মে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বুলবুল ললিত কলা একাডেমী। এদেশের সংস্কৃতি চর্চার এক ক্লান্তিলগ্নে বুলবুল চৌধুরী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে নৃত্যশিল্পকে জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। প্রয়োজনীয় আঙ্গিক ও ভাবকল্পনা গ্রহণ করে আঙ্গিক, মুদ্রা ও তাল-লয়ের কঠিন নাগপাশ মুক্ত সাধারণ মানুষের ভঙ্গি ও ইঙ্গিত ময়তাকে শিল্পরুপ দান করেন এবং মানুষের প্রাণ সত্তাকে নৃত্যরূপে সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপন করেন। বিষয় বস্তুর যথার্থ পরিবেশনে তাঁর নৃত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে থাকা দেশীয় মহাজন, কালোবাজারী ও আমলা শাসনের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন এবং তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের স্বাক্ষর হচ্ছে বুলবুল চৌধুরীর নৃত্যনাট্য মন্বন্তর। যে কারণে বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু মাহমুদ নুরুল হুদা প্রতিষ্ঠিত বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী কমিটিতে সমাবেশ ঘটেছিল প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব , কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের। বুলবুল ললিত কলা একাডেমীর চেয়ারম্যান ছিলেন-শের-এ-বাংলা একে ফজলুল হক, সভানেত্রী ছিলেন বেগম রানা লিয়াকত আলী।[৩৩]

বুলবুল ললিত কলা একাডেমী প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করলে ও পাকিস্তানী সংস্কৃতির ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা চালায়, এতে পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। বুলবুল ললিত কলা একাডেমী প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল না। একাডেমী নিয়মিত ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র, নজরুল, জয়নুল আবেদীন প্রমুখ প্রয়াত শিল্পীবৃন্দের জন্ম-মৃত্য বার্ষিকী পালন, বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে একাডেমী অংশ নেয়। যেমন- ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বুলবুল লালিত কলা একাডেমী অংশ নেয় এবং সেই আয়োজনকে সূচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সহায়তা করে । বুলবুল ললিত কলা একাডেমী গড়ে তোলা এবং এর সহায়তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন যাঁরা তাদের মধ্যে ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধূরী, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম সেলিনা বাহার চৌধুরী এবং শ্রীমতি বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

কাগমারী সম্মেলন টাঙ্গাইল,১৯৫৭

১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল- সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছিল তার মধ্যে অন্যতম। কাউন্সিলকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিশর ও ভারত প্রতিনিধি পাঠায়। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় একশ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মির্জাপুর থেকে কাগমারী পর্যন্ত রাস্তায় অর্ধশত মনোরম তোরণ স্থাপন করা হয়। দেশ বিদেশের স্মরণীয় ব্যক্তি যেমন- জিন্নাহ, সিরাজ উদ্দৌলাহ, জগলুল পাশা, তিতুমীর, জর্জ ওয়াশিংটন লেনিন, গান্ধী, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বসু প্রভৃতির নামে তোরণের নামকরণ করা হয়। মওলানা ভাসানী তার স্বাগত ভাষণে বলেন, সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে তোলা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।[৩৫]

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেন নাজমী আরা। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন নাজমী আরা।[৩৬]

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখের সাহিত্যালোচনায় দেশ বিদেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক প্রভাব ও ঐক্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ছিল তাঁদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের বিষয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান বাউল গান, যাত্রা গান, জারি গান, লাঠি, তলোয়ার ও রামদা খেলা। ভারতীয় দল পথের পাঁচালী এবং আমেরিকান দল Cow Boy চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। (দৈনিক সংবাদ ১০/০২/৫৭)। কাগমারীতে এ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। যা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে আরো একটি অবশ্যম্ভাবী দিক নির্দেশনা।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে। সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা করা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেই শুধু নয়, নির্বাচনে ও তারা সংস্কৃতিমনা নাম নিয়ে অংশ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগের শিল্পসাহিত্য সংঘ, ছাত্র শক্তির সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ছাত্র মজলিশ ও তামিরে মিল্লাত নামে ইসলামী ছাত্র সংঘ কাজ করে। এরকম নাম

Dhaka University Institutional Repository

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে যেমন-অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক, দিশারী ইত্যাদি নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠন গুলো প্রকৃত পক্ষে আত্মগোপন করে।[৩৭]

☐ রোমান হরফ প্রবর্তন ও জাতীয় ভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার লক্ষ্যে একটি উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সামরিক আইন জারীর পর থেকেই। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'জেনারেল আইয়ুব খান এক ধর্ম, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি ও অভিন্ন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটি জাতি গঠনের প্রয়াস চালান । যদি ও প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি কিন্তু ভাষা সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয় । এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়,"ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন" নামে একটি সংস্থা।[৩৮]

এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানের পরিকল্পনাবিদগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ও সংস্কার শুরু করেন। যেমন- কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতার "চল চল চল" এর "নব নবীনের গাহিয়া গান,সজীব করিব মহাশ্মশান" আংশিক সংশোধন করে তাঁরা লেখেন,'সজীব করিব গোরস্থান'।[৩৯]

সুতরাং এসব পদক্ষেপ বিপরীত ফল বয়ে আনে। পূর্ব বাংলার পৃথক সত্তা, স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের পুরনো দাবী আরো জোরদার হয়। এবং সে সময় সাংস্কৃতিক আন্দোলন মূল পরিচিতি তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। আইয়ুব খান প্রথম থেকেই সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একটি ভাষা প্রচলনের চেষ্টা চালায়। পরিকল্পনা ছিল বাংলা ও উর্দুর সমন্বয়ে রোমান হরফে লিখিত একটি ভাষা প্রচলন করা। আইয়ুব খান তাঁর 'প্রভু নয় বন্ধু' (Friends not masters) গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"এটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিস্কার যে দুটি জাতীয় ভাষা নিয়ে আমরা এক জাতি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না; আমরা বহু জাতি রাষ্ট্র হিসেবে থেকে যাবো। আমি একটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি যা স্বীকার করতেই হবে। ..... এটাও সমান ভাবে সত্য যে যদি জনগণ তা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান যেখানেই থাকুক না কেন নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় যোগ্য একটি মাধ্যম থাকতে হবে। এ ধরণের মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদিগকে বাংলা ও

Dhaka University Institutional Repository

উর্দুর সাধারণ উপাদান গুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং সে গুলিকে একটি সাধারণ লিপির মাধ্যমে বিকশিত করার ব্যবস্থা করতে হবে"।[৪০]

প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য 'শিক্ষা কমিশন' ও বাংলা একাডেমী চেষ্টা চালায়। ১৯৫৯ সালে কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্টে দুটি প্রস্তাব দেয়া হয়।

> প্রথমত ঃ রোমান বর্ণমালার প্রচলন ও বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্ঠায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর জন্য অর্থ যোগানো;
> দ্বিতীয়তঃ ছাপার উপযোগী আদর্শ উর্দু ও বাংলা বর্ণমালা নির্ধারণ, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার এবং ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন যারা উর্দু ও বাংলা বর্ণমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রোমান বর্ণমালা তৈরী করবেন। প্রস্তুতিপর্ব শেষ হবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন মত প্রকাশ করে।[৪১]

বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য বাংলা একাডেমী একটি কমিটি স্থাপন করে। বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কমিটির সভাপতি। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমী Bengali and Urdu: A literary Encounter শীর্ষক (বাংলা ও উর্দ্দু: এক সাহিত্যের মুখোমুখি) এক সেমিনারের আয়োজন করে। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণর আজম খান সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি দুই প্রদেশের ভাষাগত ব্যবধান দূরীকরণের জন্য একটি ইতিবাচক সমাধান খুঁজে বের করার আহবান জানান। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল জাতীয় সংহতি জোড়দার করা। বাংলা একাডেমীর পরিচালক বাংলা ও উর্দ্দুর অভিন্ন শব্দ চিহ্নিত করে সেগুলো জনপ্রিয় করে তোলার আহবান জানিয়ে বলেন, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত "আরবী, ফার্সি, উর্দু, তুর্কী" শব্দের একটি অভিধান প্রকাশ করা গেলে দুই রাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যেকার দূরত্ব কমে আসবে।[৪২] এ বছরই বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য সৈয়দ আলী আহসানকে সভাপতি করে গঠিত কমিটি বর্ণ বিলোপ এবং কিছু সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। বাংলা একাডেমীর চতুর্থ বার্ষিক সভায় গভর্ণর আব্দুল মোনেম খান এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে একটি সমঝোতায় আসার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহবান জানান। [৪৩]

কিন্তু এধরণের উদোগের বিরুদ্ধে শীঘ্রই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সম্মিলিত ছাত্র সভায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং রোমান হরফ প্রচলনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররা সম্মিলিত ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, এই ধরণের প্রয়াস তারা মেনে নেবে না।[৪৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আয়োজিত একটি সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক আব্দুল হাই ভাষা তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোন থেকে এর বিরোধিতা করেন।[৪৫]

১৯৬০ সালের শহীদ দিবসে ও ১৯৬২র ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের অন্যতম বক্তব্য ছিল রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। বাংলা একাডেমী বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের জন্য প্রণীত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। সে কাঠামো ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের সদস্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে বিবেচনার জন্য রেজিষ্ট্রারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালের ২৮মার্চ শিক্ষা পরিষদের বৈঠকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে একটি উপসংঘ গঠন করা হয়। বাংলা বানানের সংস্কার, ও সরলায়ন, বাংলা লিপির সংস্কার ও সরলায়ন, বাংলা ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলায়নের জন্য উপসংঘ কাজ শুরু করে। এই সংস্কার কর্মসূচী সমর্থন করে ৫৮ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন জাহানারা আরজু,জোবেদা খানম, কামরুন্নেসা এবং লুৎফুন্নেছা খাতুন প্রমুখ।[৪৬]

সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধে "বাংলা হরফের রদবদল বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে।" এই শিরোনামে একটি বিবৃতি দেন ৪১ জন বুদ্ধিজীবী। এদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোতার হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, শহীদুল্লাহ কায়সার সহ অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম লায়লা সামাদ এবং নুরজাহান বেগম।[৪৭] এই বাক-বিতন্ডার মধ্যে ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপ নেয়। দেখা যায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধীতার পাশাপাশি ভাষা সংস্কার প্রস্তাবেরও বিরোধীতা করা হয়। কখনো একক ভাবে কখনো সবাই মিলে।

পাকিস্তান লেখক সংঘ ১৯৫৯

পাকিস্তানী জন সাধারণের জন্য উন্নততর অধিকতর সুখী ও আনন্দদায়ক এবং পূর্ণ ও অধিকতর সৃজনশীল ও সুনির্দিষ্ট জীবন অর্জন করার ঘোষণা নিয়ে ১৯৫৯ সালের ২৯,৩০ ও ৩১ জানুয়ারী করাচীর গোয়ানিজ হলে

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan writers Guild গঠিত হয়। সংঘের শপথ পত্রে বলা হয় 'মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবজাতির বিকাশের স্বার্থে' পাকিস্তানী লেখকদের আত্মোৎসর্গের কথা। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থে একটি সুষ্ঠু ও সুখী সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্বও তারা গ্রহণ করেন।[৪৮]

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই সংঘের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতিমান লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই জড়িত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি এই সংগঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবার কেউ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে সংঘের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্দীন, কবি সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহীম, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, জোবেদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, খোদেজা খাতুন প্রমুখ। ১৯৭০ সালের মার্চে করাচীতে, পাকিস্তান লেখক সংঘের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন অন্যান্যের সাথে মিসেস জাহানারা ইমাম, মিসেস রাজিয়া খান এবং মিস উম্মে আমারা।[৪৯]

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানী জাতীয় আদর্শ সমন্বিত করণ ও বিকাশের স্বার্থে। কালক্রমে কেন্দ্রীয় শাসক সম্প্রদায়ের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠলে পাকিস্তান লেখক সংঘের কার্যক্রমও পিছিয়ে পড়ে। এবং ১৯৬৪ সালের পর এক পর্যায়ে এ কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ লেখক শিল্পীরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য স্বতন্ত্র চিন্তা চেতনা নিয়ে ১৯৬২ সালে নতুন করে পাকিস্তান লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা গঠন করে। তাদের কার্যক্রম সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক লেখক সংঘের কার্যক্রম থেকে পৃথক ছিল।

□ রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী পালন ও ছায়ানট প্রতিষ্ঠা

১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের শত বার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে। এ সময় সারা বিশ্বে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিল ব্যতিক্রম। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এর সরাসরি বিরোধীতা না করলেও পূর্ব পাকিস্তানের তথ্যসচিব ও বি.এন.আর

Dhaka University Institutional Repository

(Bureau of National Reconstruction) এর প্রধান মুসা আহমেদ এক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী সংগ্রহ করে এর বিরুদ্ধে অজস্র প্ররোচনা ও নিন্দাবাদ করতে শুরু করেন। দৈনিক আজাদ এদের প্রধান মুখপত্র হিসেবে কুৎসিৎ ভূমিকা পালন করে। সামরিক সরকার নানা অজুহাতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বেশ কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে। সংস্কৃতি অঙ্গনে গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছিল। এ পরিস্থিতিতেও মফস্বলের বিভিন্ন শহরে জন্মবার্ষিকী পালনের খবর আসতে থাকে। কিছু কিছু জেলা সদরে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠান মালা তৈরী করা হয়েছে বলে প্রত্রিকায় খবর প্রকাশিত হতে থাকে।

পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলেও পাকিস্তানীমনা বুদ্ধিজীবীরা তখন নিশ্চুপ থাকেনি। তারা এসব স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠান সমূহে দুই বাংলাকে একত্রিত করা, পাকিস্তানী দর্শন ও ইসলামী আদর্শ বিরোধী শক্তি গাঁটছাড়া বাঁধার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন। ১২ বৈশাখ (১৩৬৮ বাংলা) দৈনিক আজাদে "রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান" শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয় মুসলমানদের রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালন মৃত্যুদন্ড যোগ্য মহাপাপ। অর্থাৎ এ অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে 'কোহেনদার' ডাকের সমান এবং এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু।' দুদিন পর আরেক সম্পাদকীয়তে বলা হয় রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু ছিলেন। বৈশাখ মাসের এ তিনটি সম্পাদকীয় ছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যর্থতা, মুসলমানদের কাছে তার অগ্রহণযোগ্যতা এবং রবীন্দ্র বার্ষিকী উদযাপনকারীদের পাকিস্তান বিরোধী মানসিকতার সমালোচনা করে আরো তেইশটি প্রবন্ধ ও চিঠি প্রকাশিত হয়। এসব লেখক ও শিল্পীরা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়নের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করে। ঢাকা জেলার পরিষদ হলে রবীন্দ্র বর্জনের আলোচনায় অংশ নেন আব্দুল মান্নান তালিব, দেওয়ান আব্দুল হামিদ, মওলানা মহিউদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে তাঁরা বলেনঃ

> "পাকিস্তানের ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খন্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখন্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসেবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এই সভা তাদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে"।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সরকারের ভ্রুকুটি ও সহযোগীদের প্রচারনা ফলপ্রসু হয়নি। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ব্যাপী সারা প্রদেশে নিরবিছিন্ন ভাবে সেমিনার, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ,নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান চলতে থাকে। ফলে বহুদিনের স্তব্ধতা কেটে গিয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গন সজীব হয়ে ওঠে। ঢাকা শহরে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি এস এম মুরশেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি, ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সমন্বয়ে 'রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উৎসব কমিটি' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে গঠিত কমিটি।[৫১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতা জাহানারা বেগম ও অমূল্য চক্রবর্তীর উদ্যোগে কার্জন হলে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ।[৫২] এ অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে কবি সুফিয়া কামাল বলেনঃ

> "রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গালীর কবি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশ্ব কবি" রবীন্দ্র প্রতিভা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর অবস্থান আমাদের আপন ভোলা মনের সঙ্গোপনে। রবীন্দ্রনাথ ঋতুর কবি। গ্রীস্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, প্রত্যেক ঋতুই কবির কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও উত্তর বাংলারই কবি। তার সোনার তরী পূর্ব বাংলার পদ্মা ও মেঘনাতেই বাহিত হয়েছিল আজও কবির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে শিলাইদহ শাহজাদ পুর প্রভৃতি স্থান"।[৫৩]

কবি সুফিয়া কামাল রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। গীতিনক্সা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সভা শেষ হয়।[৫৪]

সরকারী বিরোধীতা সত্বে ও রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী পালনে ভূমিকা রাখেন সনজীদা খাতুন । ময়মনসিংহে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনে অংশ নেন সুমিতা নাহা। মোনায়েম খাঁর লোকজনের বিরোধিতা সত্বে ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুনের নেতৃত্বে ময়মনসিংহে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী আলোকময় নাহা আন্দোলনের হাল ধরেন। এই প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে সুমিতা নাহা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জড়িত হন। এবং গান করে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

□ ছায়ানট ১৯৬১

রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান সফল ভাবে সমাপ্ত হবার পর একদল সাংস্কৃতিক কর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার জন্য স্থায়ী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে উদ্যোগেরই অংশ হিসেবে ঢাকা ও জয়দেব পুরে দুটো ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জয়দেব পুরে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোখলেসুর রহমান, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সাইদুল হাসান,শামসুন্নাহার রহমান, সুফিয়া কামাল, ফরিদা হাসান সহ আরো অনেকে। সভায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সমিতি গঠন করা হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছায়ানট।[৫৬]

১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে ছায়ানট আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম সভাপতি হন সুফিয়া কামাল, প্রথম সম্পাদক মিসেস ফরিদা হাসান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, আহমেদুর রহমান, কামাল লোহানী, মিসেস মহিউদ্দীন, সনজীদা খাতুন। এছাড়া ও বিভিন্ন সময়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন যারা তাদের মধ্যে ছিলেন ইফফাত আরা খান।[৫৭]

ছায়ানটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সনজীদা খাতুন লিখেছেন, "সংগঠনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণা হলে ও, ছায়ানট সংঘবদ্ধ হল বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলার জন্য।[৫৮]

তাই শুরু থেকে কায়মনে বাঙালী হবার ব্রত নিয়ে ছায়ানট অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া ছায়ানট মূলত একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান। এটা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি ও সঙ্গীতচর্চায় এদেশের ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমূখী হওয়া। ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে 'হাজার বছরের বাংলা গানের আসর' ছিল প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রকাশ্য অনষ্ঠান। অন্যান্য নিয়মিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রবীন্দ্র-নজরুল বার্ষিকী পালন, বাংলা নববর্ষ উদযাপন, বর্ষামঙ্গল, হেমন্ত ও বসন্ত উৎসব। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হত রমনার বটমূলে অন্যদিকে হেমন্ত উৎসব হত বলধা গার্ডেনে। অনুষ্ঠানে নানা ভাবে দেশজ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত গানের মধ্যে 'আবার তোরা মানুষ হ' অনুকরণ খোলাস ভেদী কায়মনে বাঙ্গালী হ' গানটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

ছায়ানট মূলত একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান হলেও এটি রাজনৈতিক ভাবে প্রগতিশীল শিবিরের হয়ে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করেছে।[৬০] এটা লক্ষ্য করা যায় ছায়ানটের অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র নজরুল বার্ষিকী পালনের সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝে অনুষ্ঠান সাজানো হত। শান্ত পরিবেশে শ্রদ্ধা নিবেদনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশে যখনই আন্দোলন থাকতো তখনই সঙ্গীত চয়নে আবৃত্তির অংশ নির্বাচনে সচেতন ভাবে কালোপযোগী বিষয় অবলম্বন করা হত। দেখা যায় রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকীতে কখনও শুধু দেশাত্ববোধক গান হত। নজরুল জন্ম বার্ষিকীতে ও তার জাগরণী গান পরিবেশন করা হত।[৬১]

ছায়ানট যেহেতু সংস্কৃতি ও সঙ্গীত চর্চায় এদেশীয় ঐতিহ্য ফুটিয়ে তুলেছে সব সময়, সেহেতু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় এদেশীয় সংস্কৃতি, গান প্রভৃতি গণ মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যা পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব এর জন্ম দিয়েছে । সুতরাং দেখা যায় যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার এবং এদেশের বাঙালী সংস্কৃতির পরিশীলিত রূপ সংরক্ষণ ছায়ানটের লক্ষ্য হলে ও ছায়ানট বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

□ ভাষা সাহিত্য সপ্তাহ ১৯৬৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'। বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে চার দেয়ালের পরিধি, পুঁথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৬২]

সমগ্র অনুষ্ঠানকে আলোচনা, কবিতা- গদ্য- নাটক থেকে পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এই কয়ভাগে বিন্যাস করা হয়। প্রদর্শনীর শাখা ছিল চারটি- ভাষার বিবর্তন ,সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। চার্ট, রেখা চিত্র, স্থির চিত্র, হস্ত লিখিত পুঁথি, প্রথম যুগের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে প্রদর্শনীকে কৌতূহলোদ্দীপক ও সর্বসাধারণের সহজ বোধ্য করে তোলা হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর গদ্য পাঠের আসর বসে। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম। গদ্য পাঠ উপসংঘের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম। বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই তার বক্তৃতায় দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য আত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস ও আশা আকাংখার রক্ষণাবেক্ষণ তার বিশ্বাস ও রুপায়নে সহায়তা করা বাংলা বিভাগের বিশেষ দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সে সময়ের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন বহু দর্শক কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। এই আগ্রহের মূলে ছিল অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব ও উৎকর্ষতা। তবে একথাও ঠিক যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের যে অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিল সে সময়, সেটাই সবাইকে টেনে নিয়ে গেছে অনুষ্ঠানের দিকে।[৬৩] এবং অস্ফুট জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে এই ' ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ'।

□ পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ)

বাঙালীদের কাছে বাংলা নববর্ষ একটি অর্থবহ দিন। নানা অনুষ্ঠান উৎসবের মাধ্যমে দিনকে পালন করা বাঙালী সংস্কৃতির অতি প্রাচীন রীতি। কিন্তু পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে উৎসবটি ক্রমশ: গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে আবার বর্ষবরণ গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৬৪ সালে সন্‌জীদা খাতুনের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ ছায়ানট রমনার বটমূলে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ পালন করে। [৬৪]

তবে এবছর ঢাকা শহরে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ১লা বৈশাখ পালিত হয়। প্রাদেশিক সরকার এদিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে এবং ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূত পূর্ব জনসমাগম দেখা যায়। বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, তমদ্দুন মজলিশ, নিক্কন ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, সমাজ কল্যান কলেজ ছাত্র সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। [৬৫]

□ রবীন্দ্র সঙ্গীত বিতর্ক

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পিন্ডিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পূর্ববাংলার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ক্রমান্বয়ে এই বিতর্ক জাতীয় পরিষদের বাইরে ও ছড়িয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে অনেক তিক্ততা সৃষ্টি হয়। ২০ জুন সরকারী দলের নেতা আব্দুস সবুর খান বলেন, "সম্প্রতি তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিভাগ পূর্ববর্তী পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার অশুভ তৎপরতা চলছে। বিদেশী

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের পর এই ধরনের তৎপরতা আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে। বিষয়টির দিকে যথাযথ মনযোগ দেয়া না হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।"[৬৬]

পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কিত যে বক্তব্য দেন তা পাকিস্তান অবজারভার এ'Broadcast ban on Tagore' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল নিম্নরুপঃ

> Rawalpindi, June 22: Khawaza Shahabuddin, Minister for Information and Broadcasting, told the National Assemble to day that the Songs by poet Rabindranath tagore Which he termed " against Pakistan's Cultural Values" Would not be broadcast in future, and the use of other songs would also be reduced. He was answering to Supplimentaries on a question from Mr. Mujibar Raham Choudhury.[67]

২৪ জুন ১৯৬৭ তারিখে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ও প্রকাশিত হয়। তথ্য মন্ত্রীর এ বক্তব্য বুদ্ধিজীবী মহলে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঘোষণার পক্ষে বিপক্ষে বিবৃতি প্রদান শুরু হলে প্রসঙ্গটি আবার পরিষদে উত্থাপিত হয়। সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল জোড়ালো। ঢাকার দুটো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ক্রান্তি' ও 'অপূর্ব সংসদ' আন্দোলনের সূচনা করে। জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্যের নিন্দা করে বিবৃতি প্রদানকারী ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে নারীরাও ছিলেন। এদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ও ড. নীলিমা ইব্রাহিম এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বিবৃতিতে তারা বলেন ঃ

স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩ জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে । সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।[৬৮]

এই বিবৃতির পরপরই সারা দেশে বেতারে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন- যেমন ছায়ানট,

Dhaka University Institutional Repository

ক্রান্তি.সৃজনী, ঐকতান, সংস্কৃতি সংসদ, স্পন্দন, পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) আমরা কজনা, বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বানীচক্র, পূরবী এবং খুলনার চৌদ্দটি প্রতিষ্ঠান এই নীতির বিরোধিতা করে এবং সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে রবীন্দ্র সাহিত্য- সঙ্গীতকে বাঙালীদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে দাবী করেন।[৬৯]

রাজনৈতিক দল গুলোও এসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রচারের পক্ষে মত দেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সরকারের রবীন্দ্র বিরোধী নীতির সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম তাঁর বিবৃতিতে বলেন,'ক্ষমতা বলে হয়তো সাময়িক ভাবে বেতার ও টেলিভিশন হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু গণচিত্ত হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুমধুর আবেদনকে কোন কালেই মুছে ফেলা যাবেনা'।[৭০]

বিবৃতি দানের পাশাপাশি প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। কবি জসীম উদ্দিনের বাসভবনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠিত সভায় আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং একে প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। ঢাকা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। এ সভায় বক্তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বর্ণনা করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে ও এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন বেগম সুফিয়া কামাল ও বেগম লায়লা আর্জুমান্দ বানু।[৭১]

রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে তার প্রতিবাদ স্বরূপ ঢাকায় তিন দিন ব্যাপী কবিগুরুর উপর প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা অনুষ্ঠান করেন। এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি অভিনীত হয়। তাতে অংশ নেন কাজী তামান্না। রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন সনজীদা খাতুন। ছায়ানটের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন এবং রমনার বটমূলে বাংলা নববর্ষ পালনের মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন।[৭২]

এ ছাড়া সংস্কৃতির উপর হামলার প্রতিবাদে খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীগণ প্রতিবাদ ও বিবৃতি প্রদান করেন। সিলেটে রবীন্দ্রনাথের উপর আন্দোলনের সাথে নিবেদিতা দাশ

Dhaka University Institutional Repository

পুরকায়স্থ জড়িত ছিলেন। এসময় সিলেটের সারদা হলে ঘটা করে রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়।[৭৩]

অপর দিকে সরকারী সিদ্ধান্তের সমর্থনে ও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বিবৃতি বক্তৃতা দেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন জাহানারা আরজু, নীনা হামিদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, ইসমত আরা, ফউজিয়া খান, ফুলঝুরি খান, শাহনাজ বেগম প্রমূখ।[৭৪]

এসব সত্বেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের পক্ষে আন্দোলন জোরদার হয়। পূর্ববাংলায় আন্দোলন দ্রুত বিস্তারে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এবং ৪ জুলাই (১৯৬৭) তথ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়ে জাতীয় পরিষদে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। তিনি বলেন সংবাদ মাধ্যমে তাঁর বিবৃতিকে বিকৃত করা হয়েছে। সব রবীন্দ্র সঙ্গীত আদর্শের দিক থেকে পাকিস্তান বিরোধী এমন কথা তিনি কখনো বলেননি। তিনি শুধু একজন উর্দু কবির বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কোন গান যদি পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী হয় তাহলে সেটা পাকিস্তান রেডিওতে প্রচার করা হবেনা।[৭৫]

সরকার পক্ষ তথা রবীন্দ্র বিরোধী পক্ষের এই পশ্চাদপসারণ প্রকৃত পক্ষে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারে বিশ্বাসীদের বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। তার প্রমান পাওয়া যায় কয়েকমাস পরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বার্ষিকী পালন কালে। এ বছর বিপুল সমারোহে রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এবং অনুষ্ঠানে দর্শক শ্রোতার উপস্থিতি ও ছিল অনেক বেশী।

□ বই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন

গণ অভ্যুত্থানের পর সামরিক সরকার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে গণ বিরোধী ভূমিকার আশ্রয় নেয়। সামরিক সরকার একে একে তাদের অপছন্দের বই এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। কয়েকটি বইয়ের প্রকাশককে তাদের প্রকাশিত বই গুলি কেন নিষিদ্ধ করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করে। বই গুলো ছিল কামরুদ্দিন আহমদ এর 'সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব ইষ্ট পাকিস্তান' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বছর' বদরুদ্দিন উমরের 'সাংস্কৃতিক সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' সত্যেন সেনের উপন্যাস 'আলবেরুণী, আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'সত্যের মত বদমাস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মওলানা ভাসানীর একটি রাজনৈতিক পুস্তিকা 'ভোটের আগে ভাত চাই' র উপর ও একই ধরণের নোটিশ জারী করা হয়। সরকারের এই হটকারী সিদ্ধান্তে সাংস্কৃতিক কর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ড.

Dhaka University Institutional Repository

এনামুল হক, কবি জসীম উদ্দিন, কবি সুফিয়া কামাল সহ ত্রিশজন শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক এক বিবৃতিতে সরকারের এই পদক্ষেপকে বিপজ্জনক বলে বর্ণনা করেন এবং বই গুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহবান জানান। কয়েকজন রাজনীতিক,শ্রমিক নেতা, সাংবাদিক মওলানা ভাসানীর লেখা পুস্তিকার জন্য নোটিশ জারীর নিন্দা করে এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতিমালায় উদ্দেশ্যমূলক হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন। 'সাম্প্রতিক গোষ্ঠীর ' লেখকরা এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। বেগম সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আবুল হাশিম বলেন, আমরা একই সাথে বাঙালী, মুসলমান, এবং পাকিস্তানী। আমাদের বাঙালীত্ব অপরিবর্তনীয়। তিনি আরো বলেন যে, স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করার মধ্যেই পাকিস্তানের সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব নিহিত এবং লেখকের স্বাধীনতায় দায়িত্বহীন ভাবে হস্তক্ষেপের ফলে এই সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বিপন্ন হতে পারে।[৭৬]

পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা শহরের প্রায় বিশটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি' গঠিত হয়। সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান এবং সৈয়দ আতিকুল্লাহ কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন। কমিটি ঢাকায় কয়েকটি পথ সভা করে এবং ৮ জানুয়ারী বাংলা একাডেমীর প্রতিবাদ সভায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত লেখকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতাশ জন শিক্ষক, পূর্ব বাংলা ছাত্র শক্তির সভাপতি, বারজন চিত্র শিল্পী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরানব্বই জন শিক্ষক, গণসাংস্কৃতিক সংঘ এবং তিরিশ জন চলচ্চিত্র শিল্পী লেখকদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দেন। ১৩ জানুয়ারী বায়তুল মোকাররমে লেখকদের এক পথ সভায় বক্তৃতা করেন কবি জসীম উদ্দিন ও সুফিয়া কামাল। তারা প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী জানান। চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে অন্যান্যের সাথে ছিলেন শবনম।[৭৭]

১৪ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা সাহিত্যের উপর সরকারী হামলার প্রতিবাদে একটি সভা হয়। সভায় বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জাতি এবং মুক্ত চিন্তার ওপর হামলা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। ১৯৭০ সালের ১৫ জানুয়ারী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ড. এনামুল হকের সভাপতিত্বে লেখকদের অধিকার রক্ষা কমিটির এক সভা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এই সভায় তথ্যও প্রকাশনা অধ্যাদেশ বাতিল, সব বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন এর মাধ্যমে সংস্কৃতির উপর গুপ্তচর বৃত্তি বন্ধ করা, পাকিস্তান কাউন্সিল ও পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল এর মাধ্যমে সংস্কৃতি ও সাহিত্যে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।[৭৮] এ প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তৃতা করেন বেগম সুফিয়া কামাল ও মিসেস মনোরমা বসু।[৭৯]

আন্দোলনের মুখে সরকার দূরভিসন্ধিমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক কবির চৌধুরীকে আহবায়ক করে বিভিন্ন বই পর্যালোচনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন মোহাম্মদ এনামুল হক, কাজী দীন মোহাম্মদ, হাসান জামান এবং আশরাফ সিদ্দিকী। যদি ও শেষোক্ত তিন ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্র বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। দেখা যায় সরকারের কৌশল সফল হয়। এর পর এ বিষয়ে আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।[৮০]

❑ পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন এর পর পূর্ব পাকিস্তানে আর একটি বড় ধরণের আন্দোলন এর সূত্রপাত হয় 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক একটি বইকে কেন্দ্র করে। অভ্যুত্থানের পর থেকে বাঙালী তরুণ মানসে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা শুরু করে পাকিস্তানী সরকার। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের আদর্শ নির্বিষ্ট করার জন্য পাঠ্য বইয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সিরাজুল ইসলাম রচিত 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক বইটি ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে পূর্ববাংলার মাধ্যমিক স্কুল সমূহে নবম ও দশম শ্রেনীতে পাঠ্য করা হয়। বইয়ের প্রথম খন্ডে ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি এবং পাকিস্তান অর্জনের মধ্যে দিয়ে তার চূড়ান্ত বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় খন্ডে প্রধানত পাকিস্তানী সংস্কৃতির ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভাষা, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়।[৮১]

স্কুলের ছাত্ররা পাঠ্য সূচী থেকে এই বই প্রত্যাহারের জন্য সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের এ আন্দোলনে রাজনৈতিক মানদন্ড চলে

Dhaka University Institutional Repository

আসায় আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে। দুটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় । একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) নেতৃত্বে। উভয় পরিষদ ১৯৭০ সালের আগষ্ট থেকে স্কুল ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ শুরু করে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনে যোগ দেয়। এবং বইটি প্রত্যাহারের জন্য দাবী জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেন ষোল জন বুদ্ধিজীবী।[৮২] ১৯৭০ সালের ২৯ আগষ্ট পত্রিকায় বিবৃতি দাতাদের মধ্যে প্রথম নামটি ছিল বেগম সুফিয়া কামালের। চট্টগ্রামের স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনমুখী, করে তুলতে সহায়তা করেন তাসমিন আরা বেগম, গুলজার বেগম প্রমুখ। ঢাকায় ও ছাত্র সংগঠনের নেত্রীরা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন।[৮৩]

আন্দোলনের মুখে সরকার কিছুটা আপোষ করে; বইটির কিছু অংশ পুনরায় লেখা এবং কিছু অংশ বাদ দেবার আশ্বাস দেয়া হয়। সেপ্টেম্বরের পর আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে এবং সবাই আগত সাধারণ নির্বাচনী আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে একের পর এক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন এবং শাসন যন্ত্রের খড়গ হস্তের বিরুদ্ধে পুরুষের সাথে বাংলার নারীরাও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে বাংলার মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্তির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তাদের নিজস্ব আশা আকাংখার বাস্তবায়ন ও জাতিসত্তার বিকাশ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলক ভাবে সহজ হবে। এদেশের সাধারণ মানুষ মনে করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষের সংস্কৃতিগত সাযুজ্য না থাকলেও ধর্মীয় সাযুজ্য অভিন্ন আশা আকাংখার বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার প্রতি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় কিংবা মুসলিম স্বাতন্ত্র চেতনাই ছিল পুর্ব বাংলায় পাকিস্তানবাদীতার মূল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসনের ২৪ বছরে পূর্ববাংলার সমাজে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । মানুষের জীবনাচরণ , অভ্যাস, আচার-রুচি ও পোষাক পরিচ্ছদে এসেছে পরিবর্তন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জমিদারী প্রথার অবসান হয়েছে এবং দেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। বদলে গেছে পুরনো মূল্যবোধ। বাংলাদেশের সমাজে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মার্কসবাদী চিন্তা চেতনার ও বিকাশ ঘটে। যার ফলে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদী ধারার পরিবর্তন হয়ে তার স্থলে পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র বাঙালী ধারা প্রবল হয়েছে। ধর্মীয় চেতনার ধারা ক্ষীনতর হয়ে এসেছে। পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের চেতনা প্রবল হয়েছে। কোন জাতির স্বাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

চেতনা ও আকাংখা বাস্তবায়নের পিছনে সেই জাতির রাজনৈতিক কর্মকান্ড, সংগ্রামী তৎপরতা যেমন বিরাট ভূমিকা পালন করে,তেমনি তাতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাতির মন-মননের বিকাশ এবং অভিন্ন জাতীয় চেতনাকে ও সুসংবদ্ধ করে তার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। [৮৪]

জাতীয়তাবাদ একটি চেতনা এক ধরনের মানসিকতা এবং অনুভূতি। এই চেতনা মানুষকে তার নিজস্ব জাতিসত্তা, ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে সহায়তা করে এবং সংরক্ষণের দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে । এই চেতনা মানুষকে একত্রিত করে মহামিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এবং জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর করে তোলে । জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ পৃথিবীর অন্যান্য জন সমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে দেখে । এই পার্থক্য বোধই জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয়তাবাদের দুটি দিক রয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক। তবে দুটো দিকই পরস্পরের পরিপূরক এবং পাশাপাশি চলে এসেছে। দেখা যায় প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একটি সামাজিক দিক রয়েছে কিংবা সেটা কোন না কোন ভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ও তেমনি দেখা যায়, সামাজিক আন্দোলনের ও একটা রাজনৈতিক দিক রয়েছে, তানা হলে ও সেই সামাজিক আন্দোলনই এক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে কিংবা রাজনৈতিক রূপ লাভ করেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও এ ধারার বাইরে নয়। পূর্বপাকিস্তানে জাতীয়তাবাদের এ দিক গুলো ছিল পরস্পরের পরিপূরক।

প্রথমত, পূর্ব বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাঙালী জাতীয়তাবাদ ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন,শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। যা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পরপরই জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা তেমন গভীর ছিলনা। ভাষা আন্দোলনের মত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠায় রাজনৈতিক অঙ্গনে তা দিক নির্দেশনায় পরিণত হয়। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক বিচার করলে দেখা যাবে এই আন্দোলনের ভিত্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল। জাতীয় ভাষার দাবীতে সূচিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করে। উপরন্তু এর ফলে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নতুন ভিত রচিত হয়। এভাবে ভাষা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[৮৫]

বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা (১৯৪৭-৭১) গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গেছে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নারীর অংশ গ্রহণ প্রত্যক্ষ করার মত যা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পাশাপাশি মার্কসবাদী চিন্তা- চেতনারও বিকাশ ঘটেছিল। যদি ও সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী চিন্তা বা রাজনীতির প্রভাব এদেশে কখন ও বড় হয়ে উঠেনি তবে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে নতুন ধারার সূচনায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা এর উদার ও সংস্কার মুক্ত আদর্শে তখন বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ সমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল। নারীরা বিশেষ ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিল বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠনে অংশ গ্রহণের জন্য। কেননা তখনকার রাজনীতিতে সরাসরি নারীর অংশ গ্রহণকে সমাজ ভালো চোখে দেখেনি বলে সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের একটা সুযোগ করে নিয়েছে নারী সমাজ। তাই বলে এমন নয় যে, সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ছিলনা। তুলনামূলক কম হলে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে নারীর যে ভূমিকা ছিল তা আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলোতে। সমকালীন 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে নারীর ভুমিকা'এ অধ্যায়ে দেখা গেছে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে নারী সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলার নারীরা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। মিছিল, মিটিং এ অংশ গ্রহণ,বক্তৃতা, বিবৃতি প্রদান, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, জাতীয় পরিষদে প্রতিবাদ, লিফলেট বিলি করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারী জনগণের মধ্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন গণসঙ্গীত। আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী," আব্দুল লতিফের "ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়"। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কবিয়ালের লেখা গান জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মানুষকে দিয়েছিল উদ্দীপনা। পঞ্চাশের দশকের গণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গান গেঁয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়েছেন অনেক নারী। এদের মধ্যে ফাহমিদা খাতুন (বর্তমানে স্বনামখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী), রাজশাহীতে বেগম জাহানারা, বগুড়ায় জাহানারা লাইজু, লুলু, নাটকে কুমিল্লার নমিতা বল প্রমুখ অন্যতম।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বিভিন্ন গণ আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙালী ঐতিহ্য খুড়ে বের করে আনা হয় এই গণসঙ্গীত গুলোকে। কবিতা, নাটক ও চলচ্চিত্রে ও জাতীয়তাবোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র চর্চার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল বলেই সত্তরের দশকের ভাষাসাংস্কৃতিক আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। ৬৯ এর গণ আন্দোলনে ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের যে অবদান ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিই নয় গ্রাম বাংলার যাত্রা পালা পর্যন্ত তার নিজস্ব ঢং এ জাতীয় বিকাশের তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিল। লোক সংস্কৃতির ধারক বয়াতীরা ও গান বেঁধেছেন। বঙ্গবন্ধু গণ আন্দোলন, পল্টন ময়দানের জনসভা, ৬ দফা, রাজপথের রক্ত- সব এসেছে জারি, সারি ও গণ সঙ্গীতে। আন্দোলন মুখর দিনগুলোতে যারা গণ সংগীতের চর্চার মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবেদা বেগম, মিনি জাহানারা, দুলু, নিলুফার বেগম, আনজুম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী ও কল্যাণী ঘোষ প্রমুখ।[৮৭]

১৯৭০ এর নির্বাচন পরবর্তী দিনগুলোতে রাজনৈতিক মহল থেকে সরাসরি স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হবার আগেই সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে তা বলা হয়ে গিয়েছিল গান, কবিতা, নাটকের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে ঢাকা সহ বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে স্বাধীনতার চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধ মানেই অর্ধেকটা স্বাধীন বাংলা বেতার।[৮৮]

১৯৭১ এ বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ যে সব গান গেয়েছেন তা স্বাধীন বাংলা বেতারে ও গাওয়া হত। "জয় বাংলা বাংলার জয়," "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি," " মুজিব বাইয়া যাওরে," "শোন একটি মুজিবের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি" প্রভৃতি গান সে সময়ে জনগণকে স্বাধীনতার চেতনায় জাগিয়ে তুলেছিল। " সোনা সোনা সোনা"- এ গানের শিল্পী ছিলেন শাহনাজ বেগম, এবং "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা" গেয়েছেন স্বপ্না রায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সর্বস্তরের কণ্ঠশিল্পী দের মধ্যে ছিলেন সনজীদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, স্বপ্না রায়, মালা খান, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, রমা ভৌমিক, নায়লা জামান, বুলবুল মহলানবীশ, মনজুলা দাশ গুপ্তা, উমা চৌধুরী, ঝর্ণা ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাশ, সাবিনা বেগম, অনিতা বসু, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম, ভক্তি রায়, অর্চনা বসু, মিনু রায়, রীতা চ্যাটার্জী, ভারতী ঘোষ, শেফালী শ্যান্নাল,

Dhaka University Institutional Repository

অরুনা সাহা, জয়ন্তী ভুঁইয়া, কুইন মাহজাবিন, শক্তি শিখা দাস, গীতশ্রী সেন, মলিনা দাশ, মিতালী মুখার্জী, আফরোজা মামুন, শাহীন সামাদ প্রমুখ। [৮৯]

স্বাধীনতাকামী জনতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এসব সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীরা তাদের কণ্ঠের মাধ্যমে প্রেরণা যুগিয়েছেন। নাট্যকর্মীদের মধ্যে ছিলেন মাধুরী চট্টপাধ্যায়, মাসুদা নবী, শবনম মুশতারী, সুমিতা দেবী, করুনা রায়, অমিতা বসু, লায়লা হাসান, শক্তি মহলানবীশ, বুলবুল মহলানবীশ, নন্দিতা চট্টপাধ্যায়, কাজী তামান্না, দিলশাদ বেগম প্রভৃতি। [৯০]

গানের পাশাপাশি ছিলো "চরমপত্র" জল্লাদের দরবার আর আবৃত্তির অনুষ্ঠান-এক তারুণ্যে উদ্ভাসিত উন্মাতাল সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিচয় তুলে ধরে নারী তার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি সমগ্র বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে। যার পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ১৯৪৭-৭১*,পি এইচ ডি অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মার্চ ১৯৮৮, (ঢাকাঃ আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৩।

২. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃ. ৬৬-৬৭।

৩. আহমাদ মাযহার, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বিউটি বুক হাউস,২০০০), পৃ. ৪৬।

৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৯৬), পৃ. ৩৯-৪১ ও ৬৫।

৫. ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব*, পৃ. ৮০-৮১।

৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ১৪৩-৪৬ ও ১৫১ - ৫৩।

৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ৭১-৭৪।

৮. আনিসুজ্জামান, *সাংস্কৃতি সংসদের কথা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ সম্মেলন' ৮৯ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, সম্পাদক, হামিদ কায়সার অপু)।

৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ৭৯-৮০।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-৮৩।

১১. সাইদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ৩৬।

১২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-৮৬।

১৩. আব্দুল গনি হাজারী, *'সাহিত্যে বিপন্নবাদ'* মাসিক সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ বাংলা।

১৪. মাসিক *সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১।

১৮. অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়েরের সাক্ষাৎকার, উদ্ধৃত, সাইদ-উর- রহমান, পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, পৃ. ৩৬।

১৯. মাহবুব-উল- আলম, *সংকট কেটে যাচ্ছে*, (কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫২), পৃ. ৫-৬।

২০. মূল সভাপতির ভাষণ, উদ্ধৃত, সাইদ-উর-রহমান, পাণ্ডুলিপি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

২১. মাহবুব-উল- আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব*,পৃ. ৮৫

২৪. ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন (পুস্তিকা),সম্মেলন উপলক্ষে অক্টোবরে (৫২)মজলিস কতৃক প্রচারিত। পৃ. ৯-১০।

২৫. সাপ্তাহিক *'সৈনিক'*, ৭ নভেম্বর, ১৯৫২।

২৬. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, পৃ. ১৫৩-৫৪।

২৭. সাইদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি- কবিতা, পৃ. ৩৮-৩৯।

২৮. দৈনিক *'আজাদ'*, ২২ এপ্রিল, ১৯৫৪।

২৯. *আজাদ*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৫৪।

৩০. *আজাদ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৫৪।

৩১. *আজাদ*, ২৭ এপ্রিল, ১৯৫৪।

৩২. *আজাদ*, ২৪ এপ্রিল, ১৯৫৪।

৩৩. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. বুলবুল ললিত কলা একাডেমী তিনযুগ পুর্তি ও সমাবর্তন স্মরণিকা, ১৯৯১।

৩৫. দৈনিক *সংবাদ*, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

৩৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৬।

৩৭. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ৫৪।

৩৮. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. Md. Ayub Khan, *Friends not Masters* (Karachi Oxford University Press, 1967), P.373।

৪১. জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৫৯, পৃ. ৩৭৩।

৪২. Bengali and Urdu: A Literary Encounter; A Seminer, (Dhaka: Bangla Academy, 1964), P.9.

৪৩. বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবন-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭০ বাংলা, পৃ. ১১৫।

৪৪. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯।

৪৫. মাসিক '*সমকাল*', চৈত্র, ১৩৬৫, পৃ. ৪৬২-৭২।

৪৬. দৈনিক *পাকিস্তান*, ১৮.৯.১৯৬৮।

৪৭. দৈনিক সংবাদ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮।

৪৮. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ৭৮।

৪৯. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩,১২০-২১।

৫০. দৈনিক *আজাদ*, ৮মে, ১৯৬১।

৫১. *আজাদ*, মার্চ ২৯, এপ্রিল ২৩-২৪, মে-৮, ১৯৬১।

৫২. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃ. ৩৯।

৫৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. দৈনিক *আজাদ*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৬১।

৫৫. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, পৃ. ১৫০,২২৭।

৫৬. সন্‌জিদা খাতুন, *ছায়ানটঃ সবারে করিব আহবান*,(স্মরণিকা, ৮ জানুয়ারী, ১৯৮৭), পৃ. ৭-৮।

৫৭. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ১৩১।

৫৮. সন্‌জিদা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৫৯. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ৮২।

৬০. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, পৃ. ৭৬।

৬১. সন্‌জিদা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৬২. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৬৩. সাঈদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

৬৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৬৫. সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ. ৮৩-৮৪।

৬৬. National Assembly Of Pakistan Debates , Official Report, 4th July, 1967, P.2663.

৬৭. The Pakistan Observer, June 23. 1967.

৬৮. দৈনিক আজাদ, ২৮ জুন, ১৯৬৭।

৬৯. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্য চর্চা ও নাটকের ধারা*,(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২১৩-১৪।

৭০. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুন, ১৯৬৭।

৭১. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৭৩।

৭২. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১ ও ২০৩।

৭৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪২।

৭৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. National Assembly of Pakistan Debates, official Report, 4th July, 1967, P. 2663.

৭৬. দৈনিক *পাকিস্তান*, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭০।

৭৭. দৈনিক *পাকিস্তান*, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী, ১৯৭০।

৭৮. ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব* ১৯৪৭-৭১, পৃ. ১৪৯।

৭৯. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ২য় খন্ড*, পৃ. ৯৩।

৮০. দৈনিক *পাকিস্তান*, ১৬ জানুয়ারী, ১৯৭০।

৮১. পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি, ২য় খন্ড, পৃ. ১-২।

৮২. দৈনিক *পাকিস্তান*,২৯ আগষ্ট, ১৯৭০।

৮৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, পৃ. ৪৪।

৮৪. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ৩৭৩-৭৫।

৮৫. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৮৬. কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, পৃ. ৫১-৫৬ ও ১৩৪।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৮৮. দৈনিক *জনকণ্ঠ*, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৮৯. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*,(ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ১২৪-২৫।

৯০. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, পৃ. ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারত উপমহাদেশ যুগে যুগে আক্রান্ত হয়েছে বিভিন্ন বিদেশী শক্তি দ্বারা। গ্রীক, শক, কুষান, হুন থেকে শুরু করে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী শাসন-শোষণ করেছে দীর্ঘ সময়। জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ রাজের কাছ থেকে অর্জিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্জিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ববাংলা ২৪ বৎসর ছিল পাকিস্তানী আভ্যন্তরীন উপনেবিশবাদের অধীনে।

বৃটিশদের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনগণকে যেমন দীর্ঘদিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তেমনি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য বাঙালীকে একের পর এক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অবতীর্ন হতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ও সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ। এসব আন্দোলনের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। এই বিজয় অর্জনে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে নারীর সেদিনের অংশগ্রহণ স্বাভাবিক মনে হলে ও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে সেটা সহজ ছিলনা। তখন কার সামাজিক অবস্থা ছিল নারীর প্রগতিশীল কর্মকান্ডের প্রতিকূলে। নারী যেখানে কঠোর পারিবারিক ও সামাজিক বিধান এর কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছিল। সেখানে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কথাতো ভাবাই যায়না। কিন্তু নারী সমাজ সকল বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।

আন্দোলনে জনগণকে সংগঠিত করা, বিভিন্ন ইস্যু বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, দাপ্তরিক কাজ, পোষ্টার লেখা, লিফলেট বিলি করা, তথ্য আদান প্রদান,অর্থ সংগ্রহ, নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেয়া, সভা, সমাবেশ শোভাযাত্রা, মিছিলে অংশ নেয়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় প্রভৃতি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। কেউ কেউ শীর্ষ নেতারা কারাগারে বন্দী কালীন দলের দায়িত্ব ভার পালন করেন দক্ষতার সাথে। কেউ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনগনকে উদ্বুদ্ব করেন কেউবা সারাদেশ ঘুরে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরনের দায়িত্ব পালন করেন। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন নারী। এমনকি কারাবরণ করতে ও দ্বিধা করেনি নারী সমাজ। সর্বোপরি আন্দোলন চলাকালীন প্রতিটি মিছিলের অগ্রভাগে স্থান ছিল নারীদের। গণপরিষদে সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকান্ডের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন পরিষদ সদস্যরা।

বাঙালীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বায়ান্ন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ও স্বৈরশাসকের ষ্টীমরুলারের ভয়ে ভীত না হয়ে অংশ গ্রহণের মাত্রা বাড়িয়েছেন নারী সমাজ।

বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নারীর ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক ও বিভিন্ন মূখী। সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলন এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ব্যতীত যে সব নারী রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, নিজের ঘরকে দূর্গ হিসেবে ব্যবহার করে, দেশ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, তাদের ভূমিকা ও কৃতিত্বের দাবী রাখে।

অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল বেশী। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তি যোদ্ধাদের কোন না কোন ভাবে সাহায্য করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। যে সব নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন শুধু তারাই নয়, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে অস্ত্র বহন করে, সেবা দিয়ে, স্পাই এর কাজ করে সাহায্য করেছেন তারা ও মুক্তিযোদ্ধো হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখে। নারীর সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতীত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত না।

মুক্তিযুদ্ধে যে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ও বিপুল অংশগ্রহণ ছিল, এ পর্যন্ত তার কোন সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের অপরিমেয় অবদানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অপরিসীম অবদানের ইতিহাস ও তাই এখন ও পর্যন্ত অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। আমাদের এই স্বাধীন দেশে আলোর পথ উন্মুক্ত করে আমাদের পথ চলার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরীরা। অধিকার আদায়, মর্যাদায় লড়াইয়ে এবং বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অসম সাহসী এই পূর্ব সূরী যাঁরা আমাদের শেকড়। যার সন্ধান করা প্রয়োজন আমাদের নিজেদের স্বার্থে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী কি ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন, কি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, কিভাবে সংগঠিত হয়েছিলেন, সর্বোপরি তাদের ভূমিকা কি ছিল? তা বর্তমান প্রজন্মের জানা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীর স্বাধীনতার ইতিহাস গৌরবের, বীরত্বের অপার বেদনার ও অসীম আনন্দের। বাঙালীর কালজয়ী এ ইতিহাস নির্মানে নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। কাজেই জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্নাঙ্গ ইতিহাস র্বতমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। আর পূর্নাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরতে হলে অবশ্যই নারীর ভূমিকা তুলে ধরতে হবে। তা নাহলে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস অপূর্নাঙ্গ থেকে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

(বর্ণানুক্রমিক)

অঞ্জু গাঙ্গুলী

১৯৪৫ সালের ৩ অক্টোবর বরিশাল শহরে কাউনিয়া ব্রাঞ্চ রোডে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা- ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গলী, মাতা-বরিশাল অঞ্চলের কিংবদন্তী নেত্রী চারুবালা গাঙ্গুলী। ১৯৬৭ সালে সরকারী মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। বর্তমানে কাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত রয়েছেন।
(সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী প্রগতিসংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, ২য়খন্ড,পৃ. ১২৩)।

আজাদী হাই

দিনাজপুর সদর থানার গোপীনাথপুরে আজাদী হাই এর জন্ম। মা- হাসিনা বানু, বাবা- আব্দুল্লাহ মিয়া। ১৯৭২ সালে তিনি আই.এ.পাশ করেন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য়খন্ড,পৃ. ১৩৮-১৩৯)।

আজিজা ইদ্রিস

১৯২৬ সালের ২১ মার্চ ঠাকুরগাঁও জেলার মির্জাপুর গ্রামে আজিজা ইদ্রিস জন্ম গ্রহণ করেন। স্বামী কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিক। (শত বছরে বাংলাদেশের নারী, ফরিদা খানম (সম্পাদিত), ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, পৃ. ৭৯)।

আমেনা বেগম

১৯২৭ সালে আমেনা বেগম কুমিল্লা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ৬ দফা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় দল গঠন করে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। আমেনা বেগম ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, ঢাকাঃ বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭)।

আয়শা খানম

১৯৪৮ সালের ১৮ অক্টোবর নেত্রকোনা জেলার গাবরা গাতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা জামাতুন্নিসা খানম, বাবা গোলাম আলী খান।১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ এম.এ. পাশ করেন।১৯৬২ সালে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির সাথে যুক্ত হবার পর প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথমখন্ড, পৃ. ২২৩,২১৫)।

আনোয়ারা খাতুন

১৯১৭ সালে আনোয়ারা খাতুন জন্ম গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী। পিতা আব্দুর রহিম ছিলেন একজন প্রকৌশলী। পৈতৃক নিবাস মিরপুর, ঢাকা। স্বামী আলী আমজাদ খান একজন রাজনীতিবিদ, আওয়ামী লীগের ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। আনোয়ারা খাতুন এম.এ এবং এল. এল. বি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইষ্টবেঙ্গল এসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। তিনি একজন সমাজ সেবী ও ছিলেন। ১৯৮৮ সালে আনোয়ারা খাতুন মৃত্যুবরণ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান,সাঈদা জামান, পৃ. ৯,১০)।

ঊষারাণী চক্রবর্তী

১৯১৩ সালে বরিশালের বানাড়ী পাড়াতে জন্ম। বাবা বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী ছোট জমিদার ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ। ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড,পৃ. ৩-৪)।

এডলিন মালাকার

১৯৩৯সালের ৩ মে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।পিতা- মিঃ ডেনিয়েল ডায়াস। মায়ের নাম-এলসি ডায়াস। চারুকলা ইনিষ্টিটিউট থেকে এম.এ. পাশ করেন। বর্তমানে মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,২য়খন্ড,পৃ. ১০০-১০৩)।

কাজী মদিনা

১৯৪২ সালের ২১ নভেম্বর জন্ম। পৈত্রিক নিবাস রংপুর। পিতা- কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মাতা- আজিজা ইদ্রিস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করেন। পেশা শিক্ষকতা। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,১ম খন্ড,পৃ. ১৭৮)।

Dhaka University Institutional Repository

কামরুন্নাহার লাইলী

১৯৩৭ সালের পিরোজপুর জেলার ডুমুরতলা গ্রামে কামরুন্নাহার লাইলী জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন। পরে 'ল' ডিগ্রী লাভ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেত্রী এবং ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম মহিলা "নোটারী পাবলিক"। ১৯৮৪ সালে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (শত বৎসরে বাংলাদেশের নারী,পৃ. ১৪১)

কাজী তামান্না

কাজী তামান্না ১৯৪৭ সালের মার্চে রংপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মা আজিজা ইদ্রিস। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বিসিআই সি-র চিকিৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১মখন্ড, পৃ. ২০২-২০৩)।

কৃষ্ণা রহমান

১৯৪০ সালের ১৪সেপ্টেম্বর তিনি খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন । পিতার নাম - তারাপদ দাস বসু। মাতার নাম রানী দাস বসু। ১৯৬২ সালে ছাত্রী থাকা অবস্থায় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেন। কৃষ্ণা রহমান ২২ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে সৈয়দ মতিউর রহমান কে বিবাহ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,২য়খন্ড,পৃ. ১৯১-১৯২)।

খাদিজা সিদ্দিকী

১৯৪৫ সালে ৩মে টাঙ্গাইল শহরে খাদিজা সিদ্দিকী জন্মগ্রহণ করেন। মাতা শামসুন্নাহার খানম, পিতা- ইয়াসিন হোসেন সিদ্দিকী। স্বামী- ডাঃ হারুন অর রশীদ। খাদিজা সিদ্দিকী ১৯৭০ সালে কুমুদিনী কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভানেত্রী এবং নিবেদিকা সঙ্গীত একাডেমীর সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য়খন্ড,পৃ. ১২৮-১৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রা বিশ্বাস

চিত্রা বিশ্বাস ১৯২৮ সালের ১২সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মা সুশীলা চৌধরী, বাবা রমনী মোহন ঘোষ চৌধুরী। চিত্রা বিশ্বাস ১৯৪৩ সাল থেকে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহিলা পরিষদের সহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৭-১১৮)।

জওশন আরা রহমান

১৯৩৬ সালের ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানার চুনতী গ্রামে জওশন আরা রহমান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাইভেট স্নাতক পাশ করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ১৯৬৭ সালে সমাজ কল্যানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। স্বামী সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। জওশন আরা বর্তমানে রয়েল ডেনিস ল্যামবেসির টেকনিক্যাল উপদেষ্টা হিসেবে শিশু অধিকার ফোরামের সাথে কাজ করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৮১-৮৪)।

জান্নাতুল ফেরদৌস

ফেরদৌস ১৯৩৯ সালে ১মার্চ নওগাঁ জেলার আত্রাই থানায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতা আবেজান নেসা, বাবা আলহাজ্ব শেখ নাসের উদ্দিন। ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। পাবনা সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ সদস্যা ছিলেন। এছাড়া তিনি পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও ছিলেন। (সংগ্রামী নারী যুগের যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭১)।

জোবেদা খাতুন

১৯০১ সালে জোবেদা খাতুন চৌধুরী আসামের জোড়হাট এ জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবী। স্বামী:- আব্দুর রহিম চৌধুরী। জোবেদা খাতুন ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে সিলেটে 'আপওয়া'র জেলা কমিটি গঠিত হলে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনে এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। তিনি একজন সাহিত্যপ্রেমী ও ছিলেন। ১৯৮৬ সালে ২৬ জানুয়ারীতে তার মৃত্যু হয়। (বাংলাদেশের নারী চরিতা বিধান, সাঈদা জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোৎস্না নিয়োগী

বৃটিশ যুগের একজন সাধারণ গৃহবধু। জন্মঃ১৯২৩ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নয়না গ্রামে। পিতা- যোগেন চন্দ্র মজুমদার একজন চিকিৎসক ছিলেন। স্বামী-ময়মনসিংহের প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা রবি নিয়োগী । ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ময়মনসিংহ জেলা আত্মরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। টংক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৪৮ সালে পুলিশ টংক আন্দোলনের কারণে জোৎস্না নিয়োগীকে গ্রেফতার করেন এবং তিনি ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কারা বরণ করেন। ১৯৯০ সালের ২৭ জানুয়ারী জ্যোৎস্না নিয়োগী মৃত্যুবরণ করেন। (মুক্তি মঞ্চে নারী, নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, ঢাকাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯, পৃঃ ১৯৫-১৯৮)।

দীপাদত্ত

১৯৪৬ সালে ২৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম সাত কানিয়ায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মা আরতি দত্ত, বাবা শুধাংসু বিমল দত্ত। ১৯৬৪ সালে ইডেন কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেন। এসময় থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন।১৯৬০ দশকে ঢাকায় ছাত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী সময়ে তিনি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,১ম খন্ড,পৃ. ১৯৯-২০০)।

দৌলতুন্নেসা খাতুন

১৯২২ সালের ১৬ জুন (আনুমানিক) বগুড়া জেলার সোনাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মোহাম্মদ ইয়াসিন মাতা নুরুন্নেসা খাতুন। স্বামী ডাঃ হাফিজুর রহমান। দৌলতুন্নেসা ১৪ বৎসর বয়সে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৭০সালে সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ সালে ৪ আগষ্ট দৌলতুন্নেসা মৃত্যু বরণ করেন। (শত বছরে বাংলাদেশের নারী,পৃ. ৬১-৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

নিলুফার আহম্মেদ ডলি

১৯৩২ সালের ৯ এপ্রিল রংপুর জেলার সদরে নিলুফার আহম্মেদ ডলি জন্মগ্রহণ করেন। মা-বেগম আফতাবুন নাহার, বাবা মরহুম ক্যাপ্টেন ডাঃ নঈম উদ্দীন আহম্মেদ। স্বামী খন্দকার তানজিমউদ্দিন। ১৯৫০ সালে রংপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং লিচু বাগান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮)।

নুরজাহান মুরশীদ

১৯২৫ সালের ২২ মে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার অন্তগর্ত তারানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা বেগম খতিমুন্নেসা ও বাবা মোঃ আইয়ুব হোসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে যোগ দেন।১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন বিভিন্ন দেশ ঘুরে। বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ-এর সহ সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। নূরজাহান মুরশীদ ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ মৃত্যুবরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য়খন্ড,পৃ. ৯৩)।

নুরুন্নাহার বেলী

১৯৩৪ সালের ১৪ আগষ্ট ওয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এম.এন. রশীদ, মাতা শামসুন্নাহার। ইসলামের ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনেও অংশ নেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৪)।

নেলী সেনগুপ্তা

১৮৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর নেলী সেনগুপ্তা ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক নেত্রী। ১৯০৪ সালে তিনি সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেন। স্বামী ভারতবর্ষের খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা খতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ১৯৪০ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে বিপুল ভোটে পুনঃ নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার আসেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী হওয়ার পর তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ হন। ১৯৭৩ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৩ সালের ২৩ অক্টোবর নেলী সেনগুপ্তা কলকাতায় মৃত্যু বরণ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, ঢাকা, বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ১৯৯৮), পৃ. ৯৬)।

প্রনতি দাশ (দস্তিদার)

১৯১৮ সালের ৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের সাতকানিয়াতে প্রনতি দাশ জন্মগ্রহণ করেন। মা-কিরণময়ী দাশ, বাবা নগেন্দ্র কুমার দাশ। স্বামী শরবিন্দু দস্তিদার। প্রনতি দাশ ১৯৬৯ সালে এইচ. এস. সি. পাশ করেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৯-১২০)।

বদরুন্নেসা আহমদ

১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ আব্দুল মুক্তাদির ও মা সৈয়দা মাহমুদা খাতুন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগী লাভ করেন।১৯৫৪ সালে কুষ্টিয়া আইন পরিষদ থেকে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সভানেত্রী এবং পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে এম এন এ নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ মে আজীবন সংগ্রামী বদরুন্নেসা আহমদ মৃত্যু বরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য়খন্ড,পৃ. ১৯-২২)।

মতিয়া চৌধুরী

১৯৪২ সালের ৩০ জুন মাদারীপুর শহরে মতিয়া চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের মাহমুদকান্দা গ্রামে। মাতা- নুরজাহান বেগম, পিতা-মহিউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, পেশায় পুলিশ অফিসার। ইডেন কলেজ থেকে বি.এস.সি. পাশ করে ১৯৬৩ তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে এম.এস.সি. তে ভর্তি হন। ইডেন কলেজ অধ্যয়ন কালীন ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে রোকেয়া হলের ভিপি এবং ১৯৬৪ সালে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে ছাত্রইউনিয়ন দ্বিধা বিভক্ত হলে সোভিয়েত পন্থী প্যানেল হিসাবে পরিচিত অংশে ডাকসু

Dhaka University Institutional Repository

জিএস মতিয়া চৌধুরী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিটি গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেন। সপ্তম জাতীয় সংসদের মাননীয় খাদ্যও কৃষি মন্ত্রীর পদ ও অলংকৃত করেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত আছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১মখন্ড পৃ. ১৭৫-১৭৭)।

মমতা রায়

মমতা রায় ১৯৫৪ সালে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার সামন্ত গাতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- প্রয়াত সুধীর চন্দ্র রায়. মাতা- প্রয়াত রাধা রানী রায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন খুলনা বি.এল. কলেজ থেকে অনার্স সহ বাংলায় এম. এ. পাস করেন। স্বামী- নিবাহী প্রকৌশলী নির্মলচন্দ্র ঘোষাল। মমতা রায় দুই সন্তানের জননী। (মমতা রায়ের সাক্ষাৎকার,১৮ জুন২০০১)।

মমতাজ বেগম

১৯৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল কুমিল্লার কসবাতে জন্মগ্রহণ করেন মমতাজ বেগম। মা জাহানারা খানম, বাবা- আব্দুল গনি ভূঁইয়া বৃটিশ ভারতে মুসলিম লীগের কসবা থানার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য়খন্ড, পৃ. ১৯৪)।

মরিয়ম বেগম

মরিয়ম বেগম ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ফরিদপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- খান বাহাদুর ইসলাম প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। স্বামী- প্রয়াত পটুয়া কামরুল হাসান। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাশের পর ১৯৫৪ সালে কলকাতা টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট থেকে টেক্সটাইল ডিজাইন এ্যান্ড প্রিন্টিং এর উপর ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৯৬ এ বাংলাদেশের সপ্তম সংসদে তিনি আওয়ামী লীগ কর্তৃক মহিলা আসন ১২ থেকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে,নারী প্রগতি সংঘ,পৃ. ৫৫-৫৭)।

মাহফুজা খানম

১৯৪৬ সালের ১০ডিসেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা- মুস্তাফিজুর রহমান খান, মা- সালেহা খানম। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় অনার্সসহ এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে তিনি ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন। বর্তমানে মাহফুজা খানম সরকারী বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১মখন্ড, পৃ. ১৭৮-১৯০)।

মুকুল মজুমদার দীপা

১৯৫০ সালের ১৯ ডিসেম্বর চাঁদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। মা-শ্রীমতি উষা মজুমদার। পিতা- প্রয়াত সলিল বরণ মজুমদার। মতলবগঞ্জ কলেজ থেকে বি.এ.পাশ করেন। বর্তমানে মুকুল মজুমদার দীপা মৎস ও পশু পালন অধিদপ্তরে এসিষ্ট্যান্ট চিপ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯৩-৯৪)।

মেহেরুন্নেসা খাতুন

১৯২৪ সালে নোয়াখালীতে জন্ম গ্রহণ করেন। আইনজীবী। পৈত্রিক নিবাস ফেনী সদর উপজেলার শরিষাদী গ্রামে। পিতা খান বাহাদুর আব্দুল গোফরান ছিলেন যুক্তবাংলার সাবেক মন্ত্রী। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.এবং ১৯৬১ সালে এল.এল.বি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। মেহেরুন্নেসা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা আইনজীবী। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাইদা জামান, প. ১৫৮)।

রওশন আরা বেগম

১৯৪৪ সালের ১০ নভেম্বর রওশন আরা বেগম মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আব্দুস সামাদ সরকারী চাকুরীজীবী, মা জোবেদা খাতুন। রওশন আরা বর্তমান বি.এ.ডিসির ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন বিভাগে কর্মরত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৫-১২৭)।

রাবেয়া খাতুন

রাবেয়া খাতুন ১৯২১ সালের ১ আগষ্ট বালাগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস হাওয়া পাড়া। পিতা- মৌলভী আব্বাস আলী ছিলেন সাব-রেজিষ্ট্রার। স্বামী- মরহুম সৈয়দ আমীরুল ইসলাম। সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। (ভাষা আন্দোলনে সিলেট, তাজুল মোহাম্মদ, ঢাকা সহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া মাহবুব

১৯৩৫ সালের ২২ ডিসেম্বর খুলনায় জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা- মেহেরুন্নেসা, বাবা- শেখ আকরাম উদ্দিন আহমেদ স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। তিনি খুলনা থেকে বি.এ. পাশ করেন। স্বামী- ডাঃ মাহবুবুর রহমান। রোকেয়া মাহবুব বর্তমানে অনেকটা অসুস্থ, এরপরও নারীমুক্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি অবদান রেখে চলেছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৭১-৭২)।

লায়লা সামাদ

১৯৮২ সালের ৩ এপ্রিল লায়লা সামাদ কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা খান বাহাদুর আমিনুল হক তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন। মা তাহমিনা হক শেরশাহের প্রধান সেনাপতি ড্যানিয়েল খানের বংশধর। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় দুই বছর মেয়াদী পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের কাজে ও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা সহ গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের সাথে লায়লা সামাদ জড়িত ছিলেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন। স্বামী- মির্জা সামাদ। ১৯৮৯ সালের ৯ আগষ্ট লায়লা সামাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৩-৪৫)।

লিলি খান

১৯২৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী। লিলি খান বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বৈরুতে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ''ইনার লন্ডন এডুকেশন অথরিটি''র পরিচালক এবং যুক্তরাজ্যের কমিশন ফর এথনিক মাইনরিটির চেয়ার পার্সনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "অর্ডার অফ দি বৃটিশ এমপায়ার" খেতাবে ভূষিত করা হয়। লিলি খান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বামী মেজর শওকত আলী খান। ১৯৯৭ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান, সাঈদা জামান, পৃ. ১৯৩-৯৪)।

নাদেরা বেগম

নাদেরা বেগম ১৯২৯ সালের ২ আগষ্ট বগুড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। মা আফিয়া বেগম। ১৯৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সালে ঢাকা বিশ্ববদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। এবং ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। কবীর চৌধুরী এবং মুনীর চৌধুরী তার বড় দুই ভাই। স্বামী গোলাম কিবরিয়া। বর্তমানে তিনি অবসর সময় কাটান বই পড়ে এবং বাগান করে। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, সেলিনা হোসন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ; ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫২-৫৪)।

লীলা রায়

লীলা রায়ের জন্ম ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর। পৈত্রিক নিবাস সিলেট জেলার মৌলভী বাজারের পাঁচগাঁও গ্রামে। পিতা- গিরীশ চন্দ্র নাগ, মাতা- কুঞ্জলতা নাগ। ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতায় বেথুন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষিকার ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু লীলার অনমনীয় দৃঢ়তা, স্বচ্ছ একাগ্রতার জন্য উপাচার্য ডঃ হার্টস বাধ্য হন লীলাকে মাষ্টার্সে ভর্তি করতে। তখন থেকেই সহ-শিক্ষিকা চালু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৩ সালে লীলা রায় ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। নারী সমাজে জ্ঞানের আলো বিতরণের জন্য গড়ে তোলেন 'দিপালী সংঘ'। ১৯২৭ সালে গঠন করেন 'দিপালী ছাত্রী সংঘ'। একই বছর গঠন করেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং কারাবরণও করেন। ১৯৩১ সালে 'জয়শ্রী' পত্রিকা সম্পাদনা করে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করেন। নারী আন্দোলনে আজীবন যুক্ত থেকেছেন। স্বামী- অনিল রায়। ১৯৬৬ সাল থেকে তার স্বাস্থ্য হানি ঘটতে থাকে। আড়াই বছর সজ্ঞাহীন থাকার পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন লীলা রায় মৃত্যু বরণ করেন। (মুক্তি মঞ্চে নারী, নিবেদিতা দাশপুর কায়স্থ, প্যাপিরাস, ঢাকা১৯৯৪-৯৭, পৃ. ৭৯-৯০)।

শিশির কনা ভদ্র

১৯৪৬ সালের ২ নভেম্বর বরিশালে জন্ম। মা-সরজুবালা ভদ্র, বাবা সুরেন্দ্র নাথ ভদ্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। বর্তমানে সানফ্রান্সিস স্কুলে চাকুরিরত এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪২-১৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

শেফালী দাস

১৯৪৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল সদরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা- কুমুদ বিহারী দাস, মা- হিরন কুমারী দেবী। তিনি বাংলা ও ভাষা সাহিত্যে প্রাইভেটে এম.এ. পাশ করেন। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল বিন্দু বাসিনী সরকারী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫০)।

সন্‌জিদা খাতুন

১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল সেগুন বাগিচার পৈত্রিক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। মা সাজেদা খাতুন, বাবা- ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে বি. এ. অনার্স পাশ করেন এবং ১৯৫৫ সালে কলকাতার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ, ১৯৭৮ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ এবং ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করণের প্রতিবাদ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৩ সালে 'ছায়ানট' নামের গানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭১ সালে 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। বর্তমানে ছায়ানটের অবৈতনিক প্রিন্সিপাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১-৫২)।

সাজেদা চৌধুরী

১৯৩৫ সালের ৮ মে ফরিদপুর জেলার নগর কান্দা থানার চন্দ্রপাড়া গ্রামে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা- সৈয়দ শাহ হামিদুল্লাহ, মা- সৈয়দা আছিয়া খাতুন। পেশা- রাজনীতি। সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫)।

সালেহা খাতুন

১৯২৫ সালে হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামে সালেহা খাতুন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- শেখ কাওসার আলী পেশায় ডাক্তার, মা- গোলাপ জান বিবি। ১৯৫০ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন। স্বামী- প্রয়াত সাহিত্যিক শওকত ওসমান। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩-২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া কামাল

১৯১৯ সালের ২০ জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ পরগনার রাহাত মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ বরেন। পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লা জেলার শিলাউরে। পিতা- সৈয়দ আবদুল বারি ছিলেন বহুভাষাবিদ এবং পেশায় আইনজীবী। মাতা- সৈয়দা সাবেরা খাতুন।সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তিনি ১৯২১ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করেন। লেখালেখির পাশাপাশি রাজনীতিসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪০ সালে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ বাংলাদেশের সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রদূত সুফিয়া কামাল। (মুক্তি মঞ্চে নারী, পৃ. ৩৯)।

সুফিয়া খাতুন

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারী যশোর জেলার পোষ্ট অফিস পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা- আজিজুন্নেসা পিতা- তোফায়েল উদ্দিন গাজী, সিভিল কোর্টের পেশকার হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে অফিস সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এক সময় বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির (ঝিকর গাছা শাখা) সদস্য ছিলেন। ১৯৯২ সালে ৫৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ২য় খন্ড, পৃ ৬০-৬২)।

সুফিয়া আহমেদ

১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা বিচারপতি মোঃ ইব্রাহীম। মায়ের নাম- বেগম লুৎফননেছা। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৫-৫৬)।

সেলিনা বানু

১৯২৬ সালের ১৩ অক্টোবর পাবনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের নাম হাজেরা খাতুন। বাবা খান বাহাদুর ওয়াসীম উদ্দিন আহমেদ পাবনার প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ও দীর্ঘ দিন পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৯ সালে বি. এস. সি. এবং ১৯৬১ সালে বি. এড পাশ করেন। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালীন তিনি প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ও ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। মুক্তিযুদ্ধ সহ গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ১৯৮৩ সালের ২৬ জানুয়ারী সেলিনা বানু মৃত্যু বরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৫-৬)।

সৈয়দা মনিরা আক্তার

১৯৪৮ সালের ১০ জানুয়ারী নেত্রকোনা পৌরসভার কাটলি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ মোহাম্মদ খান, মা- সৈয়দা বদরুন্নেসা, ১৯৬৯ সালে সমাজবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্বদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। বর্তমানে রাজউকের পরিকল্পনা কাজে কর্মরত নগর পরিকল্পনাবীদ হিসেবে। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ২২০-২২১)।

সোফিয়া করিম

১৯৩০ সালের ৩০ নভেম্বর সোফিয়া করিম পাবনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা বিচারপতি বদিউজ্জামান ও মা হামিদা বানু। ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের ১৯৫১-৫২ সালে সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক ও পরে কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। ১৯৯৮ সালের ১০ এপ্রিল সোফিয়া করিম মৃত্যু বরণ করেন। (সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৯-৩০)।

হালিমা খাতুনঃ

১৯৩২ সালের ২৫ আগষ্ট বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার বাদেক পাড়া গ্রামে হালিমা খাতুন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী আব্দুর রহিম শিক্ষকতা করতেন। মাতা দৌলতুন্নেসা। হালিমা খাতুন ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো থেকে ডক্টরেট ইন এডুকেশন লাভ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আই.ই.আর.এ কর্মরত ছিলেন। তিনি ভাষা কন্যা ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। (শত বছরে বাংলাদেশর নারী, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃ. ১১০)।

হামিদা রহমান

হামিদা রহমান ১৯২৭ সালের ১৯ জুলাই যশোর জেলার কসবা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সাহিত্যিক। পিতার নাম শেখ বজলুর রহমান ও মা লুৎফুন্নেসা। স্বামী সিদ্দিকুর রহমান। ১৯৪৭ সালে যশোর মাইকেল মধুসূদণ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বাংলা সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। কিছুদিন জগন্নাথ কলেজ এবং পরে পুরানা পল্টন মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ড যান। সেখানে বিবিসিতে কাজ করেন। দৈনিক ইত্তেফাকে 'বিলেতের চিঠি' নামে একটি কলাম লিখতেন। ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে এসে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। (বাংলাদেশের নারী চরিতা বিধান, সাঈদা জামান, বাংলাদেশ লেখক সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৮)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী
(BIBLIOGRAPHY)

মৌলিক উৎস

Constituent Assembly of pakistan Debates, Vol. 2, No. 1, February, 24, 1948, P.7.

Election Commission of Pakistan, Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly 1954, (May 1977), p. 2.

National Education commission Report (Government of Pakistan) 1959, P. 373.

National Assembly of Pakistan Debates, Official Report, 4th July 1967, P. 2663.

ইংরেজী গ্রন্থ

Choudhury, A.K, *Independence of East Bangal,* Bangladesh: Jatiya Grantha Kendra, 1984.

Hannan, Mohammed, *The Liberation Struggle of Bangladesh : a brief juvenile history of the Bangali Nation,* Dhaka: Hakkani Publishers, 1999.

Haq Obaidul, *Bangabandhu Sheikh Mujib a Leader with a Difference,* London: Radical Asia publications, 1973.

Jaleel, M. A, *Bangladesh Nationalist Movement for Unity: A historical necessity,* Dhaka: M. A. Jaleel, 1983.

Khan, Ataur R., *India, Pakistan and Bangladesh: Conflict or co-operation?* Dacca: Amade Bangla press, 1976.

Khan, Mohammad Ayub, *Friends Not Masters: A Political Autobiography,* Karachi: Oxford University press, 1967.

Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (Eds), *Women of Pakistan,* zed Books Ltd. London & New Jersey, U.S.A. 1987.

Talukder, Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dacca: 1975.

Rounaq Jahan, *Pakistan: Failur in National Integration,* Dacca: 1977.

Sengupta, Jyoti, *Eclipse of East Pakistan,* Calcutta: 1963.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গ্রন্থ

অজয় রায়, *আমাদের জাতীয়তার বিকাশের ধারাঃ জাতীয়তাবাদ এবং জাতিসত্তা বিকাশের সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমি*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)*, ঢাকাঃ বর্ণরূপা মুদ্রায়ন, তাং নাই।

অমিতাভ গুপ্ত, *গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিবঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক জীবনালেখ্য*, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী; ১৯৯৭।

আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতা বিস্তান,১৯৭৪।

আতিউর রহমান, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকাঃ ঋদ্ধি প্রকাশ, ১৯৯৮।

আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলিঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮।

আতিকুস সামাদ, *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (বি বি সি থেকে প্রচারিত), ঢাকাঃ জাগৃতি, ১৯৯৫।

আতোয়ার রহমান, *একাত্তরঃ নির্যাতনের কড়চা*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২।

আনিসুজ্জামান, *আমার চোখে*, ঢাকাঃ অন্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *চোখের দেখা প্রাণের কথা*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি এলামনাই কনভেনশন, ঢাকা, ১৯৯৮।

আনোয়ার পাশা, *রাইফেল রোটি আওরাত*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০।

আবুল কাসেম, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ*, ঢাকাঃ পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ, ১৯৬৯।

আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৬।

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতা বিস্তান, ১৯৬৮।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তি সংগ্রাম*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১,ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*,

ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

আবুল ফজল, *দুর্দিনের দিনলিপি*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৮২।

আব্দুল মতিন, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালীঃ* বাংলাদেশ১৯৭১, লন্ডনঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯১।

আমীরুল ইসলাম,*একাত্তরের মিছিল*, ঢাকা ঃ কৃষ্টি, ১৯৯৭।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তির সংগ্রামে বাংলা*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, ঢাকাঃ ইউনিয়ন পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণ হত্যা ও নারী নির্যাতন*, ঢাকা ঃ সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্র বাহিনী*, ঢাকা ঃ কৃষ্টি প্রকাশ, ১৯৯৬।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

আয়শা খানম, (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০১।

আহমাদ মাযহার, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বিউটি বুক হাউস, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন বকুল (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটঃ রক্তঝরা একুশ*, ঢাকাঃ এশিয়া, ২০০০।

এম, আর, আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১ বাংলা।

এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা ঃ শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

এম, আর, আখতার মুকুল, *চরম পত্র*, ঢাকাঃ সাগর পাবলিশার্স, ২০০০।

এম, এম, আকাশ, *ভাষা আন্দোলনঃ শ্রেনী ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রবনতা সমূহ*, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

এস, এম, খাবীরুজ্জামান, *উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান*, ঢাকাঃ পালক পাবলিশার্স, ১৯৯২।

এস, এস বারানভ, *পূর্ব বাংলাঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য* (১৯৪৭-৭১), ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

এস, এম, লুৎফর রহমান, *জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা ঃ ধারনী সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৯।

কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনী*, ঢাকাঃ কৃষ্টি প্রকাশ, ১৯৯৬।

কামরুদ্দিন আহমেদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬।

কে বি এম মফিজুর রহমান খান, *ছাত্র রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি*, ঢাকাঃ ঢাকা প্রকাশন, ১৯৯৯।

খালেদা সালাউদ্দিন (সম্পাদিত), *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন ১৯৮৭।

খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬।

খোন্দকার মোশারফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮।

গাজীউল হক, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

জাকির হোসেন রাজু, *গণ মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, ঢাকাঃ সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯০।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১।

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনী*, ঢাকাঃ কাশবন, ১৯৯৮।

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, ঢাকাঃ জাগৃতি, ১৯৯৬।

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, ঢাকা ঃ নিউএজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

তাজুল মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

তুষার আব্দুল্লাহ (সম্পাদিত), *বায়ান্নর ভাষাকন্যা*, ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭।

তোফায়েল আহমদ, *ঊনসত্তরের গণ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

দীপঙ্কর মোহান্ত, *লীলা নাগ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

দীপঙ্কর মোহান্ত, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা শ্রমিক*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

নাজিমুদ্দিন মানিক, *একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি*, ঢাকাঃ ওয়ারী বুক সেন্টার, ১৯৯২।

নাজিম বুলবুল সেলিম, *আমাদের মুক্তিসংগ্রামে গণসঙ্গীতের ভূমিকা*, ঢাকাঃ বুক সোসাইটি, ১৯৭৯।

নিতাই দাস, *মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

নিবেদিতা দাশ পুরাকায়স্থ, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, ঢাকাঃ প্যাপিরাস, ১৯৯৯।

নিগার চৌধুরী, *ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলি*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা (সম্পাদিত), *একাত্তরে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৮৭।

পান্না কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধঃ আগে ও পরে*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

পান্না কায়সার, *হৃদয়ে একাত্তর*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

প্রনব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

ফজলুর রহমান, *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব*, ঢাকাঃ ১৯৪৭-৭১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১।

ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, ঢাকাঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৯।

ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা'; শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪।

ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭।

ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকাঃ সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১৯৯৮।

বদরুদ্দিন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।

বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯০।

বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রামঃ বইঘর, ১৯৮০।

বদরুদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গঃ কতিপয় দলিল*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

বদরুদ্দিন উমর, *যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ আফসার ব্রাদার্স, ১৯৭৬।

বদরুদ্দিন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

বদরুদ্দিন উমর, *আমাদের ভাষার লড়াই*, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

বদিউজ্জামান, *সংস্কৃতির রাজনীতি*, ঢাকাঃ বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৭।
বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১।

বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন*, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৯।

বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৩।

মতিউর রহমান, *ভাষা আন্দোলনঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯০।

মনসুর আহমদ খান (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

মনসুর আহমদ খান (সম্পাদিত), *উনসত্তরের শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহা*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

মতিয়া চৌধুরী, *দেয়াল দিয়ে ঘেরা*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, ঢাকাঃ মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনষ্টিটিউট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মাহফুজুর রহমান, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামঃ মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রামঃ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩।

মাহবুব-উল-আলম, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রামঃ নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৭৬।

মাহমুদ উল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র*, ঢাকাঃ গতি ধারা, ১৯৯৯।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা ভাষা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন*, ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯২।

মুহম্মদ একরামুল হক, *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), *একাত্তরের বিজয় গাঁথা*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

মেসবাহ কামাল, *আসাদ ও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান*, ঢাকাঃ বিবর্তন, ১৯৮৬।

মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকাঃ ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ২০০০।

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতির পুনরুদ্ধার*, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বুলেটিন ১৯৯৬।

মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

মোস্তফা কামাল, *সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৮৭।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০০।

রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৮১।

রফিকুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*, ঢাকাঃ আনন্দ প্রকাশ, ১৯৮২।

রফিকুল ইসলাম, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩।

রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার*, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।

রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালী*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধঃ* প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *ছয়দফা থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ হাক্কানি পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয়মাস*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী ১৯৯১।

রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

লুৎফর রহমান রিটন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকাঃ সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭।

শামসুল আলম সাইদ, *বাঙালী জীবনে একুশ*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

শামসুজ্জামান খান এবং কল্যানী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

শাহীন আক্তার (সম্পাদিত), *নারীর একাত্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী কথ্য কাহিনী*, ঢাকাঃ আইন ও শালিস কেন্দ্র, ২০০১।

শ্যামল চন্দ্র সরকার, *মুক্তিযুদ্ধে ঝালকাঠি*, ঢাকাঃ গতিধারা, ১৯৯৭।

শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, ঢাকাঃ জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালীর অবদান*, ঢাকাঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

সালাউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

সাইদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩।

সাইদ-উর-রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাইদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাবিধান*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ লোক সংসদ, ১৯৯৮।

সাইদুজ্জামান রওশন, *একাত্তরের অগ্নিকন্যা*, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জেরা ও জবানবন্দী*, ঢাকাঃ গতিধারা, ১৯৯৮।

সাহিদা বেগম, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬।

সালাউদ্দিন আহমদ, *বাঙালীর সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২।

সালাউদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ*, ঢাকাঃ ১৯৯৮।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও কলকাতার সংবাদ পত্র*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দোলন' ৭১ ও বঙ্গবন্ধু*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ আফসার ব্রাদার্স, ২০০১।

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকাঃ জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯১।

সেলিনা হোসেন, *উনসত্তরের গণ আন্দোলন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯।

হাবীব হারুন, *মুক্তিযুদ্ধঃ ডেটলাইন আগরতলা*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান হাফিজুর রহমান, *একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন*, ঢাকাঃ পুঁথিপত্র, ১৯৫৩।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ঢাকাঃ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রনালয়, ১৯৮২।

হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ঢাকারঃ গেরিলা অপারেশন*, ঢাকাঃ নগর যাদুঘর, ১৯৭২।

হেনা দাশ, *স্মৃতিময় একাত্তর*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১।

বাংলা প্রবন্ধ

আলম তাজ বেগম ছবি, '*মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ*', মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর স্মরনিকা, মুক্তিযোদ্ধা বিজয় মিলন ২০০০, ঢাকা, পৃ. ২৩-২৪।

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, '*মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস বিভাগ*', স্মরনীকা, ১৯৯২, বিজয় দিবস সংখ্যা, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯-১১।

গাজীউল হক, *একুশের সংকলন ১৯৮০ঃ স্মৃতিচারণ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

ডি. এ. রশীদ ও মহিউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *একুশের সংকলন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৫৬।

ফজিলা আক্তার জোছনা, '*স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা*', বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ছাত্রী টিম, ১৯৯৩।

রফিকুল ইসলাম, '*স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা*', রোববার, ১৪ মার্চ ২৭ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা

আজাদ
দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক জনকণ্ঠ
বেগম
সওগাত
সমকাল
সংবাদ
The Morning News
The New Nation
The Pakistan Observer.